বঙ্কিমচন্দ্রের
শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ

শ্যামলী চক্রবর্তী

অরুণা প্রকাশনী : কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৭
জুলাই ১৯৬০
প্রকাশিকা
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
জয়ন্ত চক্রবর্তী
মুদ্রাকর
শান্তিরাম দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০ ডবলু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

সূচী

সূচনা পৃষ্ঠা

প্রথম শাখা : শিল্পসন্ধানী বঙ্কিমচন্দ্র

যদি চিত্রকর হইতাম ২

এই প্রস্তরমূর্তি সকল যাহারা গড়িয়াছে

তাহারা কি হিন্দু ? ২৯

কীর্তি কই ? কীর্তিস্তম্ভ কই ? ৩৬

দ্বিতীয় শাখা : বঙ্কিমের গানের জগৎ

কে গায় ঐ ? ৫৮

একটি 'বাঙ্‌লা' গাও ৬৪

সই, মনের কথা সই ৮১

কি গায়িব ? ১০৯

প্রাচীন গীত ও মল বাজানর গান ১৩৩

শিখো হো ছল ভালা ১৪১

গান করেন কেন ? ১৬০

তারের মেও মেও তবলার খ্যান্ খ্যান্ ... ১৬৩

বিহারত রাহ তুমারি ১৬৯

আমার নতুন তরী ভাসল সুখে ১৭৪

বীণে কত কি বাজিতেছিল ১৯১

সর্বজনমনোমুগ্ধকারী সেই জয়গীতি ১৯৯

তৃতীয় শাখা :

'সর্বসৌন্দর্যের রসগ্রাহী'—বঙ্কিম ২১৭

সূচনা

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে বলেছেন, 'যেমন···শাস্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জন করিবে, সেইরূপ চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য, নৃত্যগীত, বাদ্য ও কাব্যের অনুশীলন করিবে··· নহিলে মনুষ্যের ধর্মহানি হইবে।'

শাস্ত্রাধ্যয়ন, জ্ঞানোপার্জন ও কাব্য অনুশীলন বঙ্কিম যথেষ্ট করেছেন, এ কথা সকলের জানা। কিন্তু অবশিষ্ট বিদ্যার অনুশীলন তিনি কিভাবে করেছেন? তার ফলই বা কি? এই কৌতূহলই বঙ্কিম অন্বেষার প্রধান কারণ।

রূপশিল্প অর্থাৎ চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য এবং সঙ্গীতশিল্প অর্থাৎ নৃত্য-গীত ও বাদ্যকে এক কথায় বলা হয় 'ফাইন আর্টস' বা সুকুমার শিল্প : বঙ্কিম বলেছেন 'সূক্ষ্মশিল্প'। এই সূক্ষ্মশিল্প সম্পর্কে বঙ্কিমের আগ্রহ, অনুরাগ, সংবেদন ও মননের স্বরূপ সন্ধান করে তাঁর অবগুণ্ঠিত একটি সত্তার উন্মোচন করাই বর্তমান গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

সাহিত্যশিল্পী, দার্শনিক, সমাজভাবুক ও ধর্মচিন্তক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে নানামুখী আলোচনা হয়েছে। কিন্তু শিল্প ও সঙ্গীতের জগতে বঙ্কিমের অবাধ বিচরণের কথা এতকাল কেউই বিশেষ ভেবে দেখেননি। অথচ শিল্প ও সঙ্গীত-মনস্ক বঙ্কিমকে অনুধাবন না করে বঙ্কিম-সাহিত্যের সম্যক আলোচনা এবং সম্পূর্ণ বঙ্কিমকে জানা প্রায় অসম্ভব।

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-বিচারশক্তি ও সঙ্গীতভাবনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন। কিন্তু তা খুবই সামান্য এবং বিক্ষিপ্ত। উপরন্তু, বাঙালীর শিল্পরুচি সম্পর্কে বঙ্কিমের মনোভাব প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করে লিখেছেন—'বঙ্গদর্শন বা বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টি যত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এখন মনে হয় বিষয়ের গুরুত্ব হিসাবে তাহা সমীচীন হয় নাই।'

'এই বিষয়' বলতে তিনি বাঙালীর শিল্পরুচির বিষয় বুঝিয়েছেন। অনু-সন্ধানী মন নিয়ে বঙ্কিমের সমগ্র সাহিত্যের গভীরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় বস্তুত বিষয়টিকে বঙ্কিম মোটেই উপেক্ষা করেননি। জীবন ও সাহিত্য সাধনায় শিল্প এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীতের গুরুত্ব বঙ্কিমের কাছে অনেকখানি। এ বিষয়ে তাঁর ভাবনা তাঁর সাহিত্যে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে সুশৃঙ্খল পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে এবং পরিশেষে সুচিন্তিত বক্তব্যের রূপ নিয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গীতপ্রীতি ও তাঁর উপন্যাসের সঙ্গীতপ্রসঙ্গ যে বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে সে সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সঙ্গীত-ইতিহাসের গবেষক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি তাঁর 'সঙ্গীতের আসরে' গ্রন্থে বঙ্কিমের সঙ্গীত অনুরাগের একটি উদাহরণ দিয়ে বঙ্কিম রচনাবলীতে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা সঙ্গীতপ্রসঙ্গগুলি আমাদের দৃষ্টি-পথে এনেছেন। তবে সেগুলির সাহিত্য, শিল্প, সমাজ ও ইতিহাসগত কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি করেননি। কারণ তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল আলাদা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ জীবনী নেই। খুঁটিনাটিভরা কোনো জীবন-দলিল নিজে রাখেননি, বেঁচে থাকতে কাউকে রাখতেও দেননি। তাই তাঁর শিল্প ও সঙ্গীতমনস্কতা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যচয়নের জন্যে তাঁর রচনাই খুঁটিয়ে পড়তে হয়েছে। দেখতে হয়েছে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও পরিচিতজনের সামান্য যা কিছু প্রাসঙ্গিক স্মৃতির টুকরো। তাঁর জীবৎকালের সময় ও ইতিহাস থেকে প্রয়োজনীয় নানা ঘটনা ও আন্দোলনের বিষয় বেছে নিয়ে সাজাতে হয়েছে প্রামাণ্য নথি। অনুমান ও ধারণাকে অনেক সময় ফাঁক ভরাবার কাজে লাগাতে হয়েছে। তবে উপযুক্ত তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে সেই অনুমান ধারণা ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার যথাসাধ্য চেষ্টাও করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কালানুক্রম অনুসরণ করে প্রধান দুটি বিভক্ত শাখায় স্বয়ংসম্পূর্ণ দুটি দীর্ঘ নিবন্ধের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমের শিল্পচেতনা ও সঙ্গীত-ভাবনার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টি বিশ্লেষণ করে সমগ্র আলোচনার উপসংহার টানা হয়েছে।

উনিশ শতকীয় বৃটিশ-ভারতে উপনিবেশী শিল্পের প্রভাবে দেশী শিল্পের সংকট বঙ্কিমচন্দ্রকে আলোড়িত করেছিল। তাই তিনি স্বদেশী শিল্পের সন্ধানে ব্রতী হয়ে তাঁর পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন। 'শিল্পসন্ধানী বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামের প্রথম শাখায় এই বিষয়টিই প্রতিপাদন করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমেই দেশী শিল্পের প্রাচীন ও সমকালীন নানা নিদর্শন সম্পর্কে বঙ্কিমের আগ্রহ পর্যবেক্ষণ পক্ষ-পাত ও তাঁর নিজস্ব মনোভাবের বিষয়ও এইসঙ্গে স্পষ্ট করা হয়েছে।

উনিশ শতকের বাংলার গানের ক্ষেত্রে সংকট ছিল ভিন্ন। সেই সময় ছিল গানের বৈচিত্র ও বিপুল সম্ভারে পরিপূর্ণ। কিন্তু হিন্দুস্থানী কালোয়াতী গানের প্রবল প্রতাপ প্রতিপত্তি ও প্রসারে বাংলার ঐতিহ্যগত নিজস্ব দেশী গান মানমর্যাদা হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। উঁচুদরের নতুন বাংলা গানও আর তৈরি হচ্ছিল না। বাংলা গানের সৃষ্টির জগতে এবং রুচির ক্ষেত্রে দৈন্য ও

অবনতি দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে বাংলার গানের জগতের একটি সমীক্ষা রচনা করে ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য বাংলার দেশী গানের অতীত গৌরব ও তাঁর সমকালের গানের ভ্রষ্টদশা, অবনতির কারণ এবং তার উত্তরণের উপায় কিভাবে সন্ধান করেছেন 'বঙ্কিমের গানের জগতে' সে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ শাখায় রূপ ও ধ্বনি সৌন্দর্যের রসগ্রাহী বঙ্কিমের নান্দনিক দৃষ্টির ও সৌন্দর্য উপভোগের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই শাখার শিরোনাম 'সর্বসৌন্দর্যের রসগ্রাহী বঙ্কিম'।

'বঙ্কিমের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ' অনুসন্ধানের চেষ্টায় বঙ্কিমের উপন্যাসের অনেক ঘটনা ও চরিত্রের পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে অবশ্যম্ভাবী। উপন্যাসে ব্যবহৃত শিল্পবিষয় শিল্পপ্রসঙ্গ গান ও গানের প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা বিচার বিশ্লেষণের আলোয় বঙ্কিম ও তাঁর সৃষ্টির জগৎ নতুন রূপে ও তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। শিল্প ও সঙ্গীত এই দুই উপাদান কি কৌশলে এবং কি অভিপ্রায়ে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাস-শিল্পে ব্যবহার করেছেন সে বিষয় এতদিন অনালোচিতই ছিল। বর্তমান আলোচনায় সেটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'বারোমাস' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি পৃথক প্রবন্ধে বিষয়টির আলোচনার সূত্রপাত করি। এখানে ঐ প্রবন্ধ দুটিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিতরূপে বিন্যস্ত করা হল।

আমার মনে বঙ্কিম-আগ্রহ জাগিয়ে তোলা ও বজায় রাখার সমস্ত কৃতিত্ব আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই অধ্যাপক ডঃ ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের। তাঁরই নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমার এই বঙ্কিমচর্চা। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

'শিল্পসন্ধানী বঙ্কিমচন্দ্র' রচনার সময়ে দৃশ্য-ছবির সঙ্গে বঙ্কিমের সাহিত্য-ছবির মিল খুঁজতে গিয়ে যে সব টেকনিক্যাল প্রশ্নের জট সৃষ্টি হয়েছে ডঃ জয়ন্ত চক্রবর্তী তার সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর আগ্রহ ও সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ দুরূহ ছিল। তাঁরই উৎসাহে 'বঙ্কিমের গানের জগৎ' রচনার কাজেও এগিয়েছি।

আমার অগ্রজপ্রতিম শুভানুধ্যায়ী সুধীর চক্রবর্তীর সহযোগিতায় এবং 'বারোমাস'-এর সম্পাদক অধ্যাপক অশোক সেন মহাশয়ের আগ্রহে 'শিল্প-সন্ধানী বঙ্কিমচন্দ্র' ও 'বঙ্কিমের গানের জগৎ' দুটি প্রবন্ধই 'বারোমাস' পত্রিকায় যথাক্রমে শারদীয়—'৮৫ ও 'নববর্ষ—'৮৭ সংখ্যায় প্রকাশ পায়। এঁদের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

প্রবন্ধ দুটি পড়ে যাঁরা আমার বঙ্কিম-অন্বেষা অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন আমার অধ্যাপক ডঃ ভূদেব চৌধুরী, অধ্যাপিকা গৌরী ধর্মপাল এবং শুভানুধ্যায়ী ডঃ সত্যজিৎ চৌধুরী, ডঃ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দিরা ভট্টাচার্য, সমীর ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা হাজরা, সরোজ হাজরা, মঞ্জুশ্রী বসু ও অনাথ দাস। এঁদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

'বঙ্কিমের গানের জগৎ' রচনার কাজে আমি সবচেয়ে ঋণী বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনের গ্রন্থাগারিক কালীপদ চৌধুরী—আমাদের শ্রদ্ধেয় 'কালীদা'র কাছে। বিদ্যোৎসাহী স্বভাববশে তিনি অমূল্য সময় নষ্ট করে আমার হাতের কাছে বই ও প্রয়োজনীয় পেপার কাটিং যুগিয়েছেন।

সঙ্গীত ভবনের গবেষক ছাত্র নিখিলেশ চৌধুরীও নানাভাবে আমায় সাহায্য করেছেন। এঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

এই গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলি প্রস্তুত করেছেন কলাভবনের গবেষক-ছাত্র শামসুল আলম। তাঁকেও আমার শুভকামনা জানাই।

সবশেষে বলি, অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী, অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার, অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী এবং অরুণা প্রকাশনীর নিরন্তর উৎসাহ, উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও সাহায্য ছাড়া এ বই প্রকাশ সম্ভব হত না। এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

এণ্ড্রুজপল্লী
শান্তিনিকেতন

শ্যামলী চক্রবর্তী

১

শিল্পসন্ধানী বঙ্কিমচন্দ্র

'যদি চিত্রকর হইতাম'...

রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী কাব্যকে বলেছিলেন 'চিত্রশালা'। এই বিশেষণে ভূষিত হওয়ার অনায়াস অধিকার সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের অবশ্যই রয়েছে। ইমারতী গড়নে গাঁথা সেই কল্পসৌধের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে পাঠকচিত্ত সত্যিই আবিষ্ট হয় কথাশিল্পে সুবিন্যস্ত বর্ণময় চিত্রমালায়। সুপ্রসর চিত্রপটে সরল বলিষ্ঠ রেখায় ও উজ্জ্বল রঙে প্রতিটি চরিত্র সেখানে রূপে স্বভাবে পরিচ্ছদ ও পরিপার্শ্বসহ নিখুঁত নিটোল হয়ে প্রাণচ্ছন্দে যেমন উদ্ভাসিত, তেমনিই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে রেখায়িত ও রঞ্জিত সেই চরিত্রাবলীর পৃষ্ঠপট বা চালচিত্র। নিবিষ্ট চিত্রকরের মতোই ভাষাশিল্পী বঙ্কিমের শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন ধৈর্য, সপ্রেম অভিনিবেশ আর খুঁটিনাটি কারিকুরির নৈপুণ্য। সব মিলিয়ে তাঁর শিল্প যেন সুবিশাল বর্ণময় তৈলচিত্র এবং অনুপুঙ্খে ভরা মিনিয়েচর ছবির এক অপরূপ অভিনব শিল্প-সমন্বয়।

তবে বঙ্কিম কেবলই কবিত্ব ও ভাবের রঙের বাক্‌চিত্রী নন. সত্যিকারের পটে লেখা ছবির প্রতিও তাঁর সুনিবিড় অনুরাগ। সর্বার্থেই তিনি চিত্রপ্রিয়। রঙে তুলি ডুবিয়ে নিজে হয়তো কখনো ছবি আঁকেননি রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথের মতো কিন্তু শিল্পীর আঁকা ছবি দেখতে, ছবির কথা বলতে যে তিনি ভালোবাসেন ছবি যে তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, তার পরিচয় ছড়ানো রয়েছে তাঁর নিজেরই সৃষ্টিতে। শুধু ছবিই নয়, ভাস্কর্যও তাঁর মনোযোগ দাবি করেছে 'সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা রূপে'। যদিও চিত্রই তাঁর অধিকতর প্রিয়। তাঁর উপন্যাসমালার প্রথম থেকে শেষাবধি নানাভাবে এই শিল্প প্রসঙ্গ এসেছে। কলাবতী নায়িকার চিত্রসিদ্ধির উপলক্ষ থেকে এর শুরু। পরে দেওয়ালে সাজানো চিত্রশোভার নিরীহ বর্ণনায় এবং ক্রমশ তাৎপর্যময় শিল্পবস্তু সমাবেশে বঙ্কিম-রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত আছে। সেইসঙ্গে শিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রে আমরা পাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ শিল্পসন্ধানী সৌন্দর্যপিপাসু সত্তার পরিচয়। সব মিলিয়ে এই বৈশিষ্ট্য বঙ্কিম-রচনার গতিপথে ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতা লাভ করেছে এবং সেই বিবর্তন অবশেষে যেন এক সুসঙ্গত সংজ্ঞায় চিহ্নিত হয়ে গেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। তখন এদেশে কলালক্ষ্মী ছিলেন জীবনেই অনাদৃতা আর কাব্যে উপেক্ষিতা তো

বটেই। উনিশ শতকীয় মনীষীদের চিন্তায় একটা জাগরণের নিদর্শন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক তখনই শিল্পকলায় নবশক্তি ও প্রাণময়তার আলোড়ন ঘটেনি। শিল্পকলার ক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রতীক্ষায় পুরো একটি শতক কেটে যায়। ধর্ম দর্শন সমাজ সাহিত্য নিয়ে মাতোয়ারা হয়েছিলেন উচ্চ-কোটির সুধীসম্প্রদায়। দেশী শিল্পকলা নিয়ে নতুন ভাবনার অবকাশ বা প্রয়োজন ছিল না কারও। ঐতিহ্যবাহী শিল্প সম্পর্কে দেশের জ্ঞান শিক্ষা চেতনা ছিল খুবই ক্ষীণ। তখন এদেশের শিল্পানুরাগী রাজাবাদশাহদের মহিমা অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে শিল্প অনেকদিনঃ বঞ্চিত। শিল্পশ্রী কেবল কোনোমতে অস্তিত্ব ধারণ করেছিল মেয়েদের ব্রতকথার আলপনায়, পটুয়ার পটে আর লোকশিল্পে। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত, পেশাগত বা সৌখিন শিল্পচর্চার উল্লেখযোগ্য সুযোগ উনিশ শতকের গোড়ায় ছিলই না। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি এদেশে আসর জাঁকিয়েছিলেন বিদেশী চিত্রকরেরা। ড্যানিয়েল, হজেস, হিকির ছবিই তখন ভারতের ছবি। এদেশী স্বাধীন শিল্পীর বদলে জায়গা নিয়েছিল মুদ্রণ শিল্পের সহচর কারিগরের দল—রঙতুলির বদলে কাঠ আর পাত খোদাইয়ের নরুন যাদের হাতিয়ার। মূলত স্বর্ণকার ও কর্মকার পরিবারভুক্ত এইসব খোদাই শিল্পীদের চিত্রিত গ্রন্থচিত্রণই বলতে গেলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে দেশী শিল্পীর শিল্প-নমুনা।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শাসক সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এবং প্রাচ্যবিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নব্যবঙ্গ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কিশোরীচাঁদ মিত্র, মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়ের উৎসাহে ও সহযোগে কলকাতায় স্কুল অব ইনডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্থাপিত হলো, যেমন হয়েছিল মাদ্রাজ, বম্বে ও পরে লক্ষ্ণৌতেও। এই প্রথম এদেশী শিল্পশিক্ষার্থী তরুণেরা একালে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে শিল্প শিক্ষার সুযোগ পেলেন। কিন্তু সে শিক্ষা বিদেশী শিল্পশিক্ষকদ্বারা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য রীতি ও প্রথায় অনুষ্ঠিত হতো। কাঠ খোদাই এচিং লিথোগ্রাফী প্রক্রিয়ার উন্নত করণকৌশল শিক্ষার মাধ্যমে উন্নতমানের খোদাইকর আর ছাপা-শিল্পী তৈরি করা বা অনুকরণবাদী অবক্ষয়িত ব্রিটিশ শিল্পের নকলনবিশ গড়া—এই যেন ছিল সেই শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। আধুনিক শিল্প-সমালোচক অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'ইংরেজ শাসক এদেশের মানুষকে একান্ত রূপবুদ্ধিহীন সৌন্দর্যজ্ঞান-বর্জিত ও অমার্জিত মনে করে বিলিতী কলাশিল্পের ঐতিহ্য আমদানি করে আমাদের কৃষ্টিবান করে তুলতে চাইলেন—এবং তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী এক

স্বতন্ত্র কলাকার তৈরি করতে এগিয়ে গেলেন।'[১] ফলে দেশজশিল্পের ক্ষেত্রে নবযুগ সূচনার কোনো পথ, কোনো উপায় রইল না। বিদেশী ধাঁচের এই আর্ট স্কুলের শিক্ষা শিল্পের জগতে ক্রমশ এক আবর্ত সৃষ্টি করল। অনেক শিল্প প্রতিভা বা সম্ভাবনা এই আবর্তেই ঘুরে মরল। পথ কেটে বেরিয়ে আসার মতো উপযুক্ত দিশারীর সন্ধান তারা পেল না। শতাব্দীর শেষ দশকে ১৮৯৬-তে ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের দিক-নির্ণায়ক শিল্পশিক্ষক হ্যাভেল সাহেব আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন। বঙ্কিমের আবির্ভাব তার প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে।

বিলিতী কলাশিল্পের পায়ে স্বদেশী ঐতিহ্য যখন বিকিয়ে গেছে ঠিক সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা শুরু হলো। তাঁর বহুমুখী উৎসাহের অন্ত ছিল না। 'এলিটিস্ট' তিনি যেমন সাহিত্য সমাজ ধর্ম দর্শন নিয়ে ভাবিত ও উৎকণ্ঠিত হলেন, তেমনই সুগভীর আগ্রহে উৎসুক হলেন শিল্প-বিষয়ে। তাঁর নিজের লেখাতে তো বটেই, মানস-সন্তান 'বঙ্গদর্শন'-এর পরকীয় প্রবন্ধেও শিল্প-প্রসঙ্গ উৎসাহ পেল। লালমোহন শর্মা স্বাক্ষরিত 'ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা'-য় (কার্তিক-চৈত্র ১২৮১) আর্যজাতির চিত্রনৈপুণ্য যথোচিত প্রামাণ্য দৃষ্টান্তসহ বঙ্গভাষায় এই প্রথম বিজ্ঞাপিত হলো। শিল্পমনস্ক বঙ্কিম শুধুই শিল্প-প্রেমী নন, আমাদের ঐতিহ্যমূলক দেশজ শিল্পসন্ধানে তৎপর আর আমাদের নিজস্ব শিল্পসৌন্দর্যকলায় তিনি অভিভূত, শ্রদ্ধান্বিত। তাই বঙ্কিমের নিবিষ্ট পাঠক লক্ষ্য করবেন—যুগ-সচেতন এই সাহিত্যশিল্পী পাশ্চাত্য রীতি-বদ্ধ আর্ট স্কুলের শিক্ষাধারা, সেখানকার শিল্পশিক্ষক ও কৃতী ছাত্রদের শিল্প-নৈপুণ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন, তাঁর রচনার মধ্যে সেই শিল্প-কৃতিত্ব স্বীকৃতিও পেয়েছিল, কিন্তু তাঁর শিল্পবোদ্ধা মনটির আনন্দের আশ্রয় হয়ে থাকে প্রায় লুপ্ত বিস্মৃত উপেক্ষিত দেশজ ও ঐতিহ্যগত শিল্প উপাদানসমূহ। অবশ্যই স্বীকার্য এ ব্যাপারে তাকে বিশেষ সাহায্য করেছে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা এবং এদেশের লুপ্ত রত্নোদ্ধারের উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের নিরলস প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা আর আবিষ্কার।

বঙ্কিম উপলব্ধি করলেন, 'কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য স্থাপত্য এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা। সৌন্দর্যপ্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্য-জীবন ভূষিত ও সুখময় করে। ভাগ্যহীন বাঙালীর কপালে এ সুখ নাই। সূক্ষ্ম শিল্পের সঙ্গে তাহার বড় বিরোধ। তাহাতে বাঙালীর বড় অনাদর, বড় ঘৃণা। বাঙালী সুখী হইতে জানে না।' 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' প্রবন্ধটিতে[২]

বাঙালীর এই শিল্প ঔদাসীন্য বা সৌন্দর্য সম্বন্ধে চৈতন্যের অভাব কেন তা বঙ্কিম বিশ্লেষণ করেন।

মানুষ মূলতই সৌন্দর্যপিয়াসী—এ সত্যে তাঁর দৃঢ় আস্থা। "প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্যে সুখী নহে। সকলেই অহরহ সৌন্দর্যতৃষায় পীড়িত, কিন্তু কেহ কখনো এ কথা মনে করে না।' তাই বুঝি বঙ্কিম আজীবন সৃষ্টি সাধনায় তাঁর সেই উক্তিকে সত্যি করে তুলতে চান যে, 'A man is by instinct a poet and an artist.'

'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) নায়ক জগৎসিংহ যেমন পরিপূর্ণ চেতনায় 'চক্ষুরুন্মীলন' করে তাঁর চারপাশের দৃশ্য-জগতের সমস্ত খুঁটিনাটির আকার রঙ ও শোভা নিরীক্ষণ করেছিলেন (বঙ্কিম রচনাবলী, সংসদ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২), নয়নভরে দেখেছিলেন রমণীশ্রেষ্ঠ আয়েষার সৌন্দর্যসুধা, বঙ্কিম তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য চরাচরে প্রবেশ করলেন ঠিক তেমনি মুগ্ধতা নিয়ে। এই বৃক্ষলতা পুষ্প-বিহঙ্গমশোভিত সমুদ্র-নদী-তড়াগখচিত বহুবর্ণ বিচিত্রিত প্রকৃতি 'বিশাল বিমল আকাশপটে চিত্রিতবৎ' তাঁর চোখে উদ্ভাসিত হলো। আর হ্লাদিনী প্রকৃতির সেই সৌন্দর্যসার নিয়ে গড়া রমণীর মোহিনীরূপে 'মহামহিম দেবী-প্রতিমা স্বরূপ' 'প্রকৃতি নির্মিত রাজ্ঞীস্বরূপ' 'চিত্রপটের চিত্রের ন্যায়' তাঁর আঁখিতটে ধরা দিল। প্রকৃতি ও নারীর শোভা তিনি শুধু নিজে দেখলেন না, পাঠকের দৃষ্টিও সেদিকে আকর্ষণ করতে চাইলেন : 'দেখ কি মূর্তি ! মহামহিম দেবী-প্রতিমা স্বরূপ ! ঐ পাদবিক্ষেপ দেখ তোমার চক্ষুর পলক পড়ে না কেন ?· দেখিয়াছ কি সুন্দর গ্রীবাভঙ্গী ?' (ব. র ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭)। 'কপালকুণ্ডলা'য় (১৮৬৬) সাগরবসনা সুন্দরী পৃথিবীর চিত্রপটে আঁকা সুন্দরী রমণীর রূপে আবিষ্ট নবকুমারের 'হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল', 'হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল'।

এই রূপপূজা বঙ্কিমের দৃষ্টিকে মহান প্রকৃতির শিল্প-উপচার থেকে নিয়ে গেছে মানুষের শিল্পবাসনার আয়োজনে। বিধাতার গড়া শাশ্বত কারুকাজ বর্ণিত হয়েছে মানুষের শিল্পে, চিত্রপটে, রঙ তুলি মর্মর প্রস্তর প্রভৃতির সাহায্যে। দৃশ্য-চিত্রের তুলনায় কতবারই না এসেছে চিত্রপটে খচিত ছবি, রমণীরূপ কতবার পটে চিত্রিত দেবীমূর্তিতে কি দক্ষ ভাস্করের গড়া মর্মর প্রতিমায় উপমা পেয়েছে, মনস্ক পাঠক মাত্রেরই তা নজরে আসে।

বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র নায়িকা কিশোরী তিলোত্তমার রূপ-বর্ণনায় ও মানসকন্যা আয়েষার সৌন্দর্য পরিস্ফুটনে অঙ্কনে দক্ষ এক

কথাশিল্পী আমাদের মনোযোগ প্রথমেই কেড়ে নিল। তিলোত্তমার রূপ 'বালেন্দুজ্যোতির ন্যায়', সুবিমল সুমধুর সুশীতল তার প্রকৃতি। 'স্থিরা ধীরা কোমল প্রকৃতি' সরলা বালিকার লাবণ্যময় মাধুর্যে ভরা। এই ভাবময়মূর্তিটির যোগ্য রূপসাদৃশ্যে অঙ্কিত হলো তার প্রতিকৃতি।

'সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতিপ্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্তভাব-প্রকাশক; তৎপার্শ্বে অতি নিবিড় বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশ সকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড়-বর্ণ, চিত্রকরলিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার; চক্ষু দুটি অতি শান্তজ্যোতিঃ। আর চক্ষুর বর্ণ, ঊষাকালে সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে, চন্দ্রাস্তের সময়ে আকাশের যে কোমল নীলবর্ণ প্রকাশ পায়, সেইরূপ; দৃষ্টিতে কেবল স্পষ্টতা আর সরলতা; দৃষ্টির সরলতাও বটে, মনের সরলতাও বটে' (ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩)।

বঙ্কিমের মন কবির, দৃষ্টি চিত্রশিল্পীর। বিশেষণাত্মক শব্দে গড়া হয়েছে আকারমাত্রিক রেখাভঙ্গি। উপমা ও চিত্র-কল্প প্রয়োগে ব্যঞ্জনা পেয়েছে অভীষ্ট বর্ণলেপ। আর সমগ্র রূপসৃষ্টি ভেদ করে বিচ্ছুরিত হয়েছে চরিত্রের ভাবসত্তার আলো। বঙ্কিমের এই প্রতিকৃতিচিত্রণের রীতিটি যেন ভারতীয় শিল্প উপদেশের সঙ্গে মিলে যায়।

এবং স্বস্বোচিতং স্থানং মনসা নিশ্চিত্য বুদ্ধিমান

লিখেচ্চিত্রগতং ভাবং তথা ব্যাপারমেব চ ॥

'শিল্পরত্ন'-এর[৩] এই সূত্র [১।৪৬-১১০খ, ১১১ক] অনুসারে বুদ্ধিমান শিল্পী বঙ্কিমও যেন কল্পনায় তাঁর চরিত্রের সম্পূর্ণ ভাবরূপটি গড়ে নিলেন আর শারীররূপে সেই ভাবলাবণ্যকে ফুটিয়ে তুললেন।

আয়েষার প্রদীপ্ত প্রভাময় সূর্যরশ্মির মতো দিক্-উদ্ভাসী সৌন্দর্যের যে ধ্যানলব্ধ অবয়ব শিল্পী বঙ্কিমের চিত্রপটে ধরা পড়েছে, তার স্বরূপটি পাঠকের বোধের গভীরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার আবেগে লেখক চিত্রের ভাষা খুঁজলেন। 'যদি চিত্রকর হইতাম, যদি সে কপাল তেমনই নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম, নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ, মন্মথের রঙ্গভূমি-স্বরূপ করিয়া লিখিতে পারিতাম…' (ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৩) ইত্যাদি দীর্ঘ উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পী ও কবিসত্তার এক আশ্চর্য লুকোচুরি খেলা আমাদের সম্মোহিত করে। চিত্রীর মতো করে চম্পক, রক্ত, শ্বেতপদ্মকোরক, এই তিন রঙের মিশ্রিত

বর্ণচ্ছায়ে দেহবিভা রচনার ইচ্ছায় কিংবা কব্জির নিপুণ মোচড়ে সূক্ষ্ম তুলির আঁচড় টেনে দেহরূপের বিভিন্ন রেখা, বঙ্কিমভঙ্গি, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষম সাযুজ্য, তার সুষ্ঠু মাপজোক মিলিয়ে সমগ্র শারীরছন্দ ফুটিয়ে তোলার বাসনায় লেখকের এই বিস্তৃত সৌন্দর্য-বিবরণ তাঁর চিত্রীসত্তা ও শিল্প-সৌন্দর্য বিশ্লেষক মনের মিলিত রূপের পরিচয় উন্মোচিত করে। একই সঙ্গে ধ্বনিত হয় শিল্পী-সুলভ সততায় স্বীকৃত তাঁর সীমিত আত্ম-ক্ষমতার বেদনা। রূপের প্রতিরূপ রচনা সম্ভব হলেও অধরা মাধুরীকে নিঃশেষে বর্ণিকাভঙ্গিতে বাঁধা তো যায় না। তাই রূপবিহ্বল শিল্পীর আবেগ স্বগতোক্তির খাদে নেমে এসে শেষে সংকোচ-মুক্ত হয়।

'সে ঈষদ্দীর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী, যদি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তুলি স্পর্শ করিতাম না। আয়েষার সৌন্দর্যসার, সে সমুদ্রের কৌস্তুভরত্ন, তাহার ধীর কটাক্ষ! সন্ধ্যাসমীরণকম্পিত নীলোৎপলতুল্য ধীর মধুর কটাক্ষ! কি প্রকারে লিখিব?'

পরিপূর্ণ রূপসৌন্দর্য শুধু অনুভবেই পুরোপুরি ধরা পড়ে, কবি বা শিল্পী কোনোভাবেই তার সমগ্র ভাবসমন্বিত অবয়বটির সার্থক মূর্তি রচনা করতে পারে না। তাই সব সৃষ্টির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে স্রষ্টার অতৃপ্ত অন্তরাত্মার আর্তি—বঙ্কিমের এই উক্তিই তার প্রমাণ। শব্দের জাল পেতে ধরা যায় না রূপের সম্পূর্ণ আকার, বাঁধা যায় না গতিভঙ্গির ছন্দ, তেমনই রঙ-তুলি দিয়েও ভাবময় ধারণার সম্পূর্ণ উন্মোচন সর্বাংশে সম্ভব হয় না। 'সাদৃশ্য ভাব ইতি'—যে সাদৃশ্য তাই সৃষ্টি হয় মাত্র। সৌন্দর্য রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে চিত্রভাষা ও কবিভাষার এই আশ্চর্য টানাপোড়েনের গুরুত্ব বঙ্কিম তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বার বার উপলব্ধি করেছেন। তাই দেখি তাঁর রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে চিত্রকল্প অথবা চিত্র; কাব্যময় চিত্রসম বর্ণনা অথবা সোজাসুজি বর্ণনাময় চিত্র এসেছে অবাধে অনায়াসে। ঊনবিংশ শতকের কথাসাহিত্যের ইতিহাসে ছবি আর কথার এমন শিল্পময় যোগাযোগ আর চোখেই পড়ে না।

'দুর্গেশনন্দিনী' থেকেই বঙ্কিম আক্ষরিক অর্থে চিত্রমনস্ক। সেখানে নব অনুরাগিণী তিলোত্তমা আনমনে গাছ ফুল সেঁজুতির শিব আঁকে, আঁকিবুকি কেটে নায়কের নামাক্ষর লেখে। সেই তার পূর্বরাগের আভাস। বঙ্কিমের প্রথম পর্যায়ের রোমান্স জাতীয় উপন্যাসের অভিজাত নায়িকারা সকলেই কামশাস্ত্র-বিহিত সুকুমার কলায় নিপুণা। বিমলাও নৃত্যগীত শিল্প কার্যাদিতে কুশলী।

'কপালকুণ্ডলা'র মেহেরউন্নিসা নৃত্যগীতে অদ্বিতীয়া শুধু নন, লেখকের

ভাষায় 'কবিতা রচনায় বা চিত্রলিখনেও তিনি সকলের মন মুগ্ধ করিতেন'। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই রূপবতী, গুণবতী মুঘল সম্রাজ্ঞীকে বঙ্কিম তসবীর লিখনরতারূপেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। মেহেরউন্নিসা আপনমনে শুধু ছবি আঁকছেন না, পার্শ্ববর্তিনী প্রিয়সখী মতিবিবির কাছে সে ছবির গুণাগুণ যাচাই করছেন। শিল্পীর জিজ্ঞাসা—'চিত্র কেমন হইতেছে?' সখীর উত্তর—'তোমার চিত্র যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে। অন্য কেহ যে তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নহে, ইহাই দুঃখের বিষয়।··· অন্যের তোমার মতো চিত্র-নৈপুণ্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত' (ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬)।

প্রতিকৃতি রচনা যে দক্ষ শিল্পীর প্রতিভাসাপেক্ষ বঙ্কিম তা ভালোভাবেই জানেন। এইসঙ্গে ইতিহাস সচেতন কথাকার মুঘল শিল্প-সংস্কৃতিগত প্রতিকৃতি রচনার ঐতিহ্যটুকুও তুলে ধরতে চান।

'মৃণালিনী'তে (১৮৬৯) বঙ্কিম পাঠককে নিয়ে গেছেন মধ্যবিত্ত শ্রীসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের বাসগৃহে। যেখানে 'বিলক্ষণ সৌষ্ঠব ছিল'। 'সেইখানে অন্তঃপুর মধ্যে দুইটি তরুণী কক্ষপ্রাচীরে আলেখ্য লিখিতেছিলেন।' নায়িকা মৃণালিনী ও সখী মণিমালিনী অঙ্কনরতা ও আলাপচারিণী। 'মণি—এই পদ্মটি কেমন আঁকিলাম দেখ দেখি? মৃ—ভাল হইয়াও হয় নাই। জল হইতে পদ্ম অনেক ঊর্ধ্বে আছে, কিন্তু সরোবরে সেরূপ থাকে না; পদ্মের বোঁটা জলে লাগিয়া থাকে; চিত্রেও সেইরূপ হইবে। আর কয়েকটি পদ্মপত্র আঁক; নহিলে পদ্মের শোভা স্পষ্ট হয় না। আরও, পার যদি, উহার নিকট একটি রাজহাঁস আঁকিয়া দাও' (ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২)। এখানে মৃণালিনীর বিষয়বস্তু বিন্যাসজ্ঞান লক্ষ্য করার মতো। গ্রাম্য বঙ্গবালা মণিমালিনী লোকায়ত দেওয়াল-আলপনা আঁকছে। আলপনার পদ্ম সাধারণত চিকৃকাটা জল থেকে বেশ উঁচুতে উঠে ডাঁটার ডগায় ফুটে থাকে। কিন্তু মৃণালিনী মথুরানগরবাসিনী অভিজাত-বংশীয়া মার্জিতা রমণী, তাই দরবারী মিনিয়েচরের রাগমালাচিত্রের পদ্মবন ও মৃণালোৎসুক রাজহাঁসের ছবিই যেন তার কল্পনায় ভাসে।

পদ্মসরোবরে হাঁসের ছবি ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে খুব প্রিয় ও পরিচিত মোটিফ। বিশেষত প্রতীক্ষিতা নায়িকাচিত্রের পটভূমিকায় কমলচিত্র খুবই ইঙ্গিত-পূর্ণ। প্রতীক্ষায় নায়িকার বিফল যামিনী অতিবাহিত হয়েছে; সদ্যবিকশিত কমলে প্রভাতের আভাস এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদরূপ দীর্ঘ দিবসের ব্যঞ্জনা। মৃণালিনীও নায়ক হেমচন্দ্রের সঙ্গে মিলনের আশায় সঙ্কেতস্থলে প্রতীক্ষা করে

গ্রহবৈগুণ্যে নিরাশ হয়েছিল। হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্যের নির্দেশে দীর্ঘ বিরহব্রত যাপনের জন্যেই ব্রাহ্মণগৃহে তার অজ্ঞাতবাস। পদ্মসরোবরের ছবি বঙ্কিমের প্রিয়। জয়দেবের কবিতা সম্পর্কে তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে দেখি অলংকৃত মন্তব্য—'জয়দেবের কবিতা উৎফুল্ল কমল জাল শোভিত বিহঙ্গমাকুল স্বচ্ছবারিবিশিষ্ট সরোবর।'

'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। এখানেই প্রথম তিনি সুদূর ধূপদী লোকের মায়াপুরী থেকে নেমে এসে তাঁর সমসামায়িক যুগ, জীবন আর সমাজের পরিচিত মাটিতে তাঁর কল্পবিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। তাই এ উপন্যাসে বিধবাবিবাহ আন্দোলন প্রসঙ্গ, ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের ছবি, ইয়ংবেঙ্গলের নব্যযুবকদের কথা যেমন তিনি এড়িয়ে যাননি, তেমনই ধরে রেখেছেন তাঁর সমকালীন শিল্পচর্চার পরিচয়টিকেও। 'বিষবৃক্ষ'-এর 'স্তিমিত প্রদীপে' শীর্ষক অধ্যায়ে বঙ্কিম নগেন্দ্রর শয়নকক্ষে সজ্জিত চিত্রাবলীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। শুধু চিত্রের নয় চিত্রকরেরও পরিচয় আছে। 'চিত্রগুলি বিলাতী নহে। সূর্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর এক জন ইংরেজের শিষ্য; লিখিয়াছিল ভাল।'

অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অনুমেয় সম্ভবত এই দেশী চিত্রকর আর কেউ নন, কলকাতার আর্ট স্কুলের সেকালের শ্রেষ্ঠ ছাত্র অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। আর তাঁর ইংরেজ গুরু হলেন হেনরি হোভার লক। তাঁর সমকালীন এই খ্যাতিমান শিল্পগুরু ও শিষ্যের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা হেতু নিজের রচনার কোনো অবকাশে স্বীকৃতি দেওয়ার অভিপ্রায় হয়তো বঙ্কিমের ছিল। ১৮৬৪-তে লক সরকারি চারুকলা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন এবং দুই দশক কাল অত্যন্ত দক্ষতায় শিল্পশিক্ষায়তনের কর্মোদ্যোগ বিস্তৃত করেন। তাঁর বিচিত্র কর্মধারায় অনুপ্রাণিত ও নিত্য বিজড়িত শিষ্য ছিলেন অন্নদা বাগচী।[৪] সে যুগে স্বাধীন ভাবে দেবদেবীর ও পৌরাণিক ঘটনার রঙিন লিথোগ্রাফ করে অন্নদা বাগচী জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।[৫]

লক-এর আর এক প্রিয় খ্যাতিমান শিষ্য শ্যামাচরণ শ্রীমানিও বঙ্কিমের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন। শ্যামাচরণের লেখা বাংলায় প্রথম শিল্পপুস্তক 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরী' (১৮৭৪) পাঠে অভিভূত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ লেখেন দীর্ঘ পর্যালোচনা 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' (ভাদ্র ১২৮১)। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য চিত্রকলা ও স্থাপত্যের ঐতিহ্য

সন্ধান প্রয়াসী ঐই শিল্পী-লেখকের প্রথম উদ্যমকে সাধুবাদ জানিয়ে বঙ্কিম লিখলেন 'শ্রীমানিবাবুর এই গ্রন্থপাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই, এই প্রথমোদ্যম।' এই পুস্তক পর্যালোচনার সূত্র ধরেই বঙ্কিম সূক্ষ্মশিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় করলেন—শিল্প-চেতনার ব্যাখ্যা করলেন এবং সর্বশেষে সে যুগের বাঙালির শিল্পরুচির অভাবের কারণ বিশ্লেষণ করলেন।

'যেমন মনুষ্যের অন্যান্য অভাব পূরণার্থ এক একটি শিল্পবিদ্যা আছে, সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য সৃজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায়ভেদে সেই বিদ্যা পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়াছে।··

যে সৌন্দর্যজননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে।

যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য।··

সৌন্দর্যপ্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে।'

'কলানাং প্রবরং চিত্রং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্' ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের এই সূক্তির প্রতিধ্বনি করে যেন বঙ্কিমও লিখলেন—'মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।'

কিন্তু তাঁর গভীর আক্ষেপ 'বাঙ্গালি সুখী হইতে জানে না।' কারণ অনু-সন্ধানে তীক্ষ্ন তাঁর দৃষ্টি সমসাময়িক বাঙালি সমাজের জীবনযাপন পদ্ধতি ও রীতিনীতির ওপরেই জোরালো আলো ফেলেছে।

'স্বীকার করি, সকল দোষটুকু বাঙ্গালীর নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালীর সামাজিক রীতির দোষ ;—পূর্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, তাতেই অসংখ্য সন্তান-সন্ততি লইয়া গর্ত মধ্যে পিপীলিকার ন্যায় পিল্ পিল্ করিতে হইবে—সুতরাং স্থানাভাববশতঃ পরিস্কৃতি এবং সৌন্দর্য-সাধন সম্ভবে না। কতকটা বাঙ্গালীর দারিদ্র্যজন্য। সৌন্দর্য অর্থসাধ্য।'

সেকালের ধনাঢ্য-লোকের ধারকরা শিল্পরুচিতেও আবার বঙ্কিম যথার্থ সৌন্দর্যবোধের অভাব লক্ষ্য করেছেন।

'দুই চারি জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজদের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাস্কর্য ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী নকলনবিশ ভাল. নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য এবং চিত্র-সংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে,

অনুকরণ-স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল মন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ্য হইলেই হইল; সন্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল। সৌন্দর্যরসাস্বাদন-সুখ বুঝি বিধাতা বাঙ্গালীর কপালে লিখেন নাই।'

সৌন্দর্যবিচারশক্তি ও সৌন্দর্যরসাস্বাদনসুখ যে কী তার প্রমাণ ব্যাখ্যা যেন নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর শয়নকক্ষের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য-সজ্জায়। সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন নগেন্দ্রের অভিজাত-রুচিতে বঙ্কিম যেন স্বীয় শিল্পরুচির অভিক্ষেপ ঘটিয়েছেন। নগেন্দ্র বিলিতীচিত্র অথবা সাহেব ওস্তাদের আঁকা প্রতিকৃতিচিত্র বাছাই করেননি। পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণে এদেশী শিল্পীর আঁকা স্টিল লাইফ মডেল স্টাডি বা তেলরঙা দৃশ্যচিত্রও নয়। তিনি বেছেছেন দেশী চিত্রকরের আঁকা বিশেষ ভাবব্যঞ্জনামূলক thematic painting, কারণ এই চিত্র-রাজির মধ্য দিয়ে বঙ্কিম তাঁর বিশেষ ভাবাদর্শ প্রকাশ করতে চান। এ চিত্র জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ সৌন্দর্যসুখে সুখী ও দাম্পত্যসুখে সুখী নগেন্দ্রর চিত্র। বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হবার আগে নগেন্দ্র তো সর্বসুখে সুখী বাঙালিই ছিল। তাই দেখি—'সূর্যমুখীর শয্যাগৃহ অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের সকল সুখের মন্দির, এই জন্য তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঘরটি প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্ম্যতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্মর-প্রস্তরে রচিত। কক্ষপ্রাচীরে নীল পিঙ্গল লোহিত লতা-পল্লব-ফল-পুষ্পাদি চিত্রিত; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গমসকল ফল ভক্ষণ করিতেছে।'

ঘরটি বিশালায়তন ও সু-উচ্চ: কারণ এখানে পারিপাট্য-সচেতন বঙ্কিম তাঁর অনেক প্রিয় চিত্র সযতনে সুবিন্যস্ত করবেন। সুপরিসর ক্ষেত্র না হলে অতগুলো ছবির শোভা খুলবে না। কক্ষপ্রাচীরও নিরাভরণ নয়। অলংকরণ-মণ্ডিত। পার্শিয়ান বা মুঘলচিত্রের অতিপরিচিত পাড়ের নকশায় ঘেরা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য অন্নদাপ্রসাদ প্রমুখ লকের কৃতী ছাত্ররা সে সময়ে ফোর্ট উইলয়মের অন্তর্বর্তী সেন্ট পিটার্স চার্চের ও গবর্নমেন্টস হাউসের স্টেটরুমের আভ্যন্তরীণ অলংকরণে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখান। এদেশের শিল্পীছাত্রদের যাবতীয় শিল্প-দ্যোগ বিষয়ে সদা-আগ্রহী বঙ্কিমমনে যে তা রেখাপাত করেনি কে বলতে পারে!

নগেন্দ্রের শয়নমন্দিরে প্রবেশাধিকার দিয়ে বঙ্কিম পাঠককে যেন ক্রমে এক চিত্রশালায় প্রদর্শিত ছবির রাজ্যে নিয়ে গেছেন ও একের পর এক ছবির পুঙ্খানু-পুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন প্রদর্শকের মতোই। তাঁর একান্ত প্রিয় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ প্রিয় দৃশ্যাবলী লেখনীর রেখায় কল্পনায় রঙে ফুটে উঠেছে ছবির সমস্ত

খুঁটিনাটি সমেত। কুমারসম্ভবের হরধ্যান ভঙ্গ, রঘুবংশম কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে বর্ণিত লঙ্কা-প্রত্যাগত বিমানচারী রামসীতার সমুদ্রশোভা দর্শন, মহাভারতের সুভদ্রা হরণ, চক্রব্যূহে গমনোন্মুখ অভিমন্যুর শঙ্কাতুরা উত্তরার কাছে বিদায় গ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণের তুলাদৃশ্য, অভিজ্ঞান শকুন্তলমের দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রথম সাক্ষাৎকার—পূর্বরাগ ও দাম্পত্য প্রেমবিষয়ক এই সব ছবিই সেখানে সাজানো। কারণ প্রেম-সুখী নগেন্দ্র সূর্যমুখীর মিলনমন্দিরের এই চিত্রাবলী সেই সুখী দম্পতির প্রেম পরিবর্ধনে ও বৈচিত্র্য সাধনে একদা সহায়ক হয়েছে—আবার অভিমানিনী সাধ্বী পত্নীর অনুপস্থিতিতে এ ছবিই নগেন্দ্রের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করে সুখের স্মৃতি জ্বালিয়ে দুঃখের আগুন উস্‌কিয়ে দিয়েছে।

বঙ্কিমের বিশেষত্বই এই যে তাঁর রচনাব প্রায় সর্বত্র শিল্প-প্রসঙ্গ বা চিত্র-সজ্জাকে কাহিনীর বিষয়ের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে বা পরিপার্শ্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিলিয়ে দিয়েছেন। অপ্রাসঙ্গিকভাবে নয়, বিশেষ অভিপ্রায়েই যুক্ত হয়েছে ছবি বা ছবির প্রসঙ্গ আর সেই সঙ্গেই ফুটে উঠেছে তাঁর নিজস্ব শিল্প-রুচি ও শিল্প ভাবনা।

ঊনবিংশ শতকে দেশী ছবি বলতে সাধারণত দেবদেবীর পট ও লিথো ছবিরই চলন ছিল। আর্ট স্কুলের ছেলেরা আঁকতেন বিলিতী রীতির পোর্ট্রেট, স্টিল-লাইফ। ১৮৭২ অথবা ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের কলকাতার শিল্প প্রদর্শনীতে কোথাও ভারতীয় ঐতিহ্যমূলক শিল্পের স্থান ছিল না। ছিল না শিল্পীর স্বাধীন চিন্তামূলক ভাবধর্মী বা কাহিনীধর্মী কোনো ছবি। দক্ষ অনুকৃতিমূলক কাজই হয়েছিল পুরস্কারধন্য। আর্ট স্কুলের ছাত্র শিল্পী শ্যামাচরণ শ্রীমানিই প্রথম পাশ্চাত্য রীতিগত অনুকরণ-চিত্রবিদ্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন; তাঁর 'শিল্প-চাতুরী' গ্রন্থে শিল্পীর স্বাধীন ভাবনার পথটি পাঠককে চিনিয়ে দিতে চাইলেন তিনি।

'অনুকরণ মাত্রকে প্রাধান্য দিলে (সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি-চিত্র ভিন্ন) আর সকল চিত্রেরই প্রকৃত গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়। কাল্পনিক চিত্রেতেই চিত্রকরের বিশেষ গুণপনা প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহাতে কল্পনাশক্তির যত স্ফূর্তি দেওয়া যায় ততই তাহা হইতে অভীষ্ট ফল প্রসূত হয়। অতএব যাঁহারা চিত্র বিষয়ে নিপুণতা উপার্জন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কর্তব্য এই যে, কোনো স্বভাবসুন্দর ভাব বিশেষের প্রতি অনুরাগী হইয়া কিসে সেই ভাব প্রকাশ করিতে পারেন কেবল তাহারই চিন্তায় লাগিয়া থাকেন এবং তাহারই জন্য উপকরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে স্বভাবের অবারিত দ্বারে গমনপূর্বক তাহার আয়োজন করেন'।[৬]

শিল্পী শ্যামাচরণের এই স্বাধীন উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়ে অভিব্যক্তিমূলক বা ভাবধর্মী চিত্রাবলী রচনার সাধ তখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের থাকলেও, সাধ্য ছিল না। কারণ উপযুক্ত শিক্ষাপদ্ধতি, যোগ্য আদর্শ ও অনুপ্রেরণার অভাব। তাই পৌরাণিক আখ্যায়িকা-চিত্রণের মধ্য দিয়েই স্বাধীন কল্পনা প্রকাশ পেল। বলা বাহুল্য আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্কুলের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে তবেই সে স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়া থেকে স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা সাহিত্যের মধ্যে সক্রিয় হতে থাকে। প্রাচীন কাব্য পুরাণের নব সমাদর নব মূল্যায়নের রেওয়াজ শুরু হয়। নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা (১২ এপ্রিল ১৮৬৭) স্বদেশী ভাবের উদ্দীপনা বৃদ্ধিতে খুবই তৎপর হয়েছিল। সেই হিন্দুমেলার পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে (১৮৭১ সালের ১১, ১২, ১৩ ফেব্রুয়ারি) তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় নামে একজন শৌখিন শিল্পী কুমারসম্ভবের দুটি শ্লোক—'ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি' ও 'স দক্ষিণাপাঙ্গ নিবিষ্ট মুষ্টিং' অর্থাৎ মদনভস্ম ও হরধ্যানভঙ্গ মুহূর্তে অবলম্বনে দুটি ছবি এঁকে প্রদর্শিত করেন। ঐ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি 'সমাচার চন্দ্রিকা'র ভাষায়—'এই দুইখানি চিত্র সামাজিক মাত্রেরই মনোহরণ করিয়াছে । তাহা চরম প্রীতিকর হইয়াছিল'।[৭] দেশীমতে দেশী ছবি আঁকার এই ধরন দৃষ্টান্ত হিসাবে বঙ্কিম তুলে নিয়েছিলেন তাঁর লেখা 'বিষবৃক্ষ'-এ। দেশী ছবির সার্থক ব্যবহার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম দেখালেন। বিশেষ ভাবব্যঞ্জনার সৌন্দর্য আহরণ করে ফুটে উঠেছে তাঁর মনোমতো সেই সব ছবি। হরধ্যানভঙ্গ দৃশ্যের বজ্রগর্ভ নৈঃশব্দ্যের বাতাবরণ অথবা শ্রীকৃষ্ণের তুলাদৃশ্যে সপত্নীর ঈর্ষামিশ্রিত প্রেম কিংবা অভিমন্যুর বীরত্ব ও উত্তরার বিচ্ছেদকাতরতা, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার নবোন্মেষিত প্রেম-লাবণ্য ইত্যাদি ভাব বা idea-র দৃশ্যরূপ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রাবলী সার্থক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ক্লাসিক কাব্য চরিত্রের এই ধরনের চিত্র-সমাবেশের পরিকল্পনায় বঙ্কিম তাঁর 'রজনী' উপন্যাসে উল্লেখিত 'সেক্ষপিয়ার গেলেরি'র অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকবেন। উনিশ শতকের উত্তরার্ধে লণ্ডনে কোনো চিত্রপ্রেমী ব্যক্তি একটি বৃহৎ বাড়ির নানা কক্ষে শেক্‌স্‌পীয়র-নাটকের অসংখ্য দৃশ্যাবলী খুব বড় বড় ক্যানভাসে তেল রঙে শিল্পীদের দিয়ে আঁকিয়ে ও সাজিয়ে একটি প্রদর্শনী-গৃহ তৈরি করেন। জনসাধারণ প্রবেশমূল্য দিয়ে এই চিত্রশালা দেখত। এরই নাম ছিল Shakespeare Gallery। এই গ্যালারির নির্বাচিত কিছু ছবি দুই ভল্যুমে '*Portraits from Shakespeare Gallery*' (চিত্র নং—১ দ্রষ্টব্য) নামে ছাপা হয়।[৮] সংক্ষেপে এই অ্যালবামকে বঙ্কিম

তাঁর 'রজনী'তে শেকস্‌পীয়র গেলেরি নামে উল্লেখ করেছেন, সেখানে তাঁর পোর্ট্রেট-এর আলোচনা করেছেন। আর নগেন্দ্রের কক্ষে বঙ্কিম সেই গ্যালারিরই সদৃশ যেন এক 'কালিদাস গ্যালারি' রচনা করতে চেয়েছেন।

পুরাণ কাব্যজাত কাহিনীমূলক বা ভাবমূলক ছবির পথেই ভারতের নব শিল্প পথিক অবনীন্দ্রনাথ যোগ্য শিষ্য নন্দলালসহ শিল্প-পুনরুজ্জীবনের নতুন যুগে যাত্রা করেছিলেন। 'ছবি দেশীমতে ভাবতে হবে, দেশীমতে দেখতে হবে'— এই অনুপ্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথের কৃষ্ণলীলার ছবি, মেঘদূতে চিত্রমালার ছবি, বন্দিনী সীতা, রুক্মিণীর পত্রলিখন চিত্ররাজির জন্ম। এক একটা 'ক্যারেকটার' চিত্ররূপে মূর্ত হয়ে লোকের চোখের সামনে থাকবে বলেই নন্দলালকে দিয়ে আঁকিয়েছেন 'যমরাজ', 'অগ্নিদেবতা'র ছবি। এই 'ক্যারেকটার'-এর প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যটুকু সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র ছবির ক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছেন অনেক আগেই। 'বিষবৃক্ষ'-এর চিত্রসজ্জা শিল্পী অবনীন্দ্রের মনেও বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল। তাঁর 'আপনকথা'র[১] বাল্যস্মৃতিচারণে দেখি ছোট পিসি কুমুদিনীর ঘরের গৃহসজ্জায় নগেন্দ্রের শয়নকক্ষের বর্ণনার হুবহু প্রতিফলনে তিনি অভিভূত। তেমনি সাজান শকুন্তলা, মদনভস্ম, উমার তপস্যার ছবি। সব দেশী পেণ্টারের হাতে আঁকা। মনে প্রশ্ন জাগে, বঙ্কিমের শিল্পদৃষ্টান্ত তাঁর শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় উপন্যাসের মাধ্যমে ধনী বাঙালির গৃহসজ্জার ক্ষেত্রে সত্যিই কি ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল?

নগেন্দ্রের গৃহসজ্জার মাধ্যমে বঙ্কিম যেমন ধনাঢ্য ভূস্বামীর বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত রুচিসম্পন্ন শিল্প সংগ্রহের পরিচয় দিলেন, তেমনিই 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেই মনে করিয়ে দিলেন যে এদেশের দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষেরও একটি নিজস্ব শিল্পবোধ আছে। সৌন্দর্য বা শিল্পশখ প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র অর্থসঙ্গতির ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং 'সকলেই অহরহ সৌন্দর্যতৃষায় পীড়িত'। তাই তাঁর বিষকন্যা পাপিষ্ঠা হীরার বাড়ির তকতকে নিকোনো মেটে আঙিনায় 'আলেপনা—পদ্ম আঁকা, পাখী আঁকা, ঠাকুর আঁকা।' বাংলা দেশের নিজস্ব লোকশিল্পের ধারাটির প্রতিও বঙ্কিমের সমান মমতা। তাঁর সাহিত্যকর্মে এর নানা উদাহরণ ছড়ানো। গ্রামবাংলার লোকায়ত স্নিগ্ধ শিল্প-চেতনাটুকু তিনি 'আনন্দমঠ'-এর দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামের মধ্যেও আবিষ্কার করেছেন দেখতে পাই। দেখিয়েছেন—সেখানে প্রবল মন্বন্তরে ঘরে ঘরে উদরান্নের টান পড়লেও দেওয়ালের আলপনাটি ম্লান হয়নি। আজও নিরন্ন সাঁওতালপল্লির অথবা দরিদ্র মধুবনী গ্রামের দেওয়াল-আলপনা এই সত্যই তো প্রমাণ করে আসছে।

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) ও 'রাধারাণী' (১৮৭৭)-তে বঙ্কিম গৃহসজ্জার প্রয়োজনে শিল্পবস্তু ও ছবির প্রসঙ্গ এনেছেন। 'চন্দ্রশেখর'-এ আমিয়েট ও জনসনের বজরার ভিতরে কক্ষসজ্জার বর্ণনা—'নানাবিধ আসন, শয্যা চিত্র পুত্তল প্রভৃতি শোভা পাইতেছে'—(ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৩) ইংরেজের শৌখিনতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য। আর 'রাধারাণী'র ঘরে বসানো প্রস্তরনির্মিত Niobe প্রতিকৃতিতে (ব র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৭) বোধ হয় একদা দরিদ্র নায়িকার অর্থস্বাচ্ছন্দ্য সূচিত হয়েছে (চিত্র নং—২ দ্র.)।

'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসে বঙ্কিম আবার সুদক্ষ প্রতিকৃতি-আঁকিয়ে রূপে দেখা দিলেন। শচীন্দ্রনাথের দৃষ্টি তুলি দিয়ে আঁকা রজনী ও অমরনাথের ছবি দুখানি যেন অপূর্ব দুটি পোর্ট্রেট। 'রজনী জন্মান্ধ· চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমরকৃষ্ণতারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষু—কিন্তু কটাক্ষ নাই। রজনী সর্বাঙ্গ-সুন্দরী ; বর্ণ উদ্ভেদ-প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর, গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিনীর ন্যায়সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত ; মুখকান্তি গম্ভীর ;·· অন্ধতাবশতঃ সর্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক ; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত' (ব. র. ১ম খণ্ড. পৃ. ৫১৩)।

রূপময়ী অন্ধনারীর বিষণ্ণ-সৌন্দর্য শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি ছাড়া আর কোন চোখেই বা ধরা পড়া সম্ভব ! নয়নের আলোয় বঞ্চিত হয়ে চির অন্ধকারের জগতে নির্বাসিত হবার বেদনা, ভাগ্যহীনতা-জনিত সংকোচ ও গ্লানি এই নারীর মুখ-সৌন্দর্যকে করেছে গম্ভীর, হাসিকে করেছে বিষাদমাখা। সব মিলিয়ে নিমেষহীন স্থিরলোচনা সেই মূর্তি বঙ্কিমের চোখে যেন দক্ষ ভাস্করের গড়া পাষাণী প্রতিমা।

লক্ষণীয় যে, বঙ্কিম রমণীর রূপলাবণ্যময়ী মূর্তিকে অনুপম ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এদেশী মূর্তি প্রতিমা নয়, শ্বেতপ্রস্তরে গড়া গ্রীক ভাস্কর্য যেন তাঁর উপমান। প্রাচ্য মূর্তিশিল্পের অতিশয়িত রূপ অপেক্ষা নিখুঁত শারীর সংস্থানের সৌন্দর্যে ভরপুর হেলেনিক সুন্দরী-প্রতিমা নায়িকার গঠনসৌকর্যের আদর্শ হতে পারে সহজে। চিত্রের ভাবব্যঞ্জনা ও ভাস্কর্যের প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যের পার্থক্য সম্পর্কেও বঙ্কিম যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। 'শকুন্তলা মিরন্দা ও দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য—'শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র, দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন।' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নায়িকার মনের গড়নের ভিন্ন আদল বোঝাতে গিয়েও বঙ্কিম তাঁর শিল্পমনস্কতার পরিচয়

দিয়েছেন—'শকুন্তলা ইঙ্গিতে ব্যক্ত, দেস্‌দিমোনা আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ বিস্তারিত।' প্রসঙ্গত বলা যায়, বঙ্কিম চরিত্রের ভাবলাবণ্য প্রকাশে প্রাচ্যচিত্রীর সমগোত্রীয় কিন্তু দেহগঠন-বর্ণনায় পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের সজীবপ্রায় আকার-সন্ধানী।

অমরনাথের পোর্ট্রেটটিও বঙ্কিম কম দক্ষ আঁচড়ে আঁকেননি। 'অমরনাথ দেখিতে সুপুরুষ; গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ খর্ব, স্থূলও নহে, শীর্ণও নহে; বড় বড় চক্ষু, কেশগুলি সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, যত্নরঞ্জিত। বেশভূষার পারিপাট্যের বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী অতি মনোহর, কণ্ঠ অতি সুমধুর!' কিন্তু শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অতি সহজেই ধরা পড়ে ব্যক্তির আসল চরিত্রটুকু। মডেল সম্পর্কে শিল্পীর ধারণা বা ইম্‌প্রেশন—'দেখিয়া বুঝিলাম লোক সুচতুর।' তাই অমরনাথ শচীন্দ্রনাথের কাছে নিজস্ব বক্তব্যের সোজাসুজি অবতারণা না করে, 'সেক্ষপিয়র গেলেরি' অ্যালবামখানি টেনে নিয়ে প্রথমে 'ঐ পুস্তকস্থিত চিত্রসকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন'।

ক্লাসিক নাট্য-সাহিত্যের অমর চরিত্রাবলী চিত্রায়িত করা যে কত কঠিন, চিত্রপটের সীমিত উপকরণে চরিত্রের আসল সৌন্দর্য যে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলা যায় না, বঙ্কিমের এই নিজস্ব ধারণার সমর্থন অমরনাথের উক্তিতে। 'যাহা বাক্য এবং কার্যদ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না; এবং এ সকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে। ডেস্‌দিমনার চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, আপনি এই চিত্রে ধৈর্য, মাধুর্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্যের সহিত সাহস কৈ? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কই? জুলিয়েটের নবযৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই?' (ব. র ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১৫)

বঙ্কিমের এই মন্তব্যের সঙ্গে যদি আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের উপলব্ধিকে মিলিয়ে নেওয়া যায় তবে ঊনবিংশ শতকের নিঃসঙ্গ শিল্পসন্ধানী পথিকের অগ্রজাত চিন্তায় আমরা চমকিত হই। শিল্পী বিনোদবিহারীর উক্তি, 'রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দুর্যোধন, জরাসন্ধ, শাল্ব এবং ত্রিপুরা নগর নির্মাতা ময়—এই সব চরিত্র রজোতমোগুণের উপাদানে নির্মিত হয়েছে। কোনো শিল্পীর সাধ্য নেই যে এই অপূর্ব শক্তিশালী চরিত্র চিত্রে বা মূর্তিতে রূপায়িত করতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত করা চলে যে মানসিক বা দৈহিক শক্তির সমন্বয় ও সংঘাত শব্দাশ্রিত বাক্যের দ্বারাই সম্ভব।'[১০]

শিল্পবোদ্ধা সাহিত্যিক বঙ্কিম ও সাহিত্যরসিক চিত্রকর বিনোদবিহারীর

সাহিত্যকৃতির শিল্পায়ন-সম্পর্কিত চিন্তা একই ধারায় মিশে গেছে। শূদ্রপদী কাব্য-সাহিত্য চরিত্রের ভাববিস্তার ও বৈচিত্র্য রঙ-তুলির সীমিত সামর্থ্যে যে সম্পূর্ণ ফোটানো যায় না, এ যেমন প্রতিভাবান সক্রিয় শিল্পীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা তেমনি শিল্পমর্মজ্ঞ সাহিত্য-স্রষ্টারও উপলব্ধি।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর (১৮৭৮) বারুণী দীঘি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় পুষ্করিণী অর্জুনার প্রতিচ্ছবি। তাই পরিপার্শ্বের সমস্ত দৃশ্যশোভা-সমেত এঁকেছেন তার ছবিখানি। যেন তুলির টানে আঁকা। একখানি স্থির দৃশ্যচিত্র। মুঘল মিনিয়েচর রীতিতে ডবল পাড়ে বাঁধানো। 'পুষ্করিণীটি অতি বৃহৎ—নীল কাচের আয়না মতো ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। সেই ঘাসের ফ্রেমের পরে আর একখানা ফ্রেম·· সেই ফ্রেমখানা বড় জাঁকাল—লাল, কালা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানাবর্ণ ফুলে মিনে করা—নানা ফলের পাতর বসান' (ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯)।

মুঘল মিনিয়েচরে মূল ছবির গা ঘেঁষে থাকে একরঙা বা ফুলকারি নকশার সরু পাড় বা 'বেল'। তার পরেই থাকে নানা রঙের জমকালো কারুকাজে ভরা চওড়া বর্ডার বা 'হাসিয়া'।[১১] সবুজ ঘাসের জমির বেড় দেওয়া ও ফুল ফলের বাগান ঘেরা বারুণী দীঘি চিত্রপ্রাণ লেখকের কলমের ডগায় মিনিয়েচর ছবির রূপ-শৈলী নিয়ে ভেসে উঠেছে (দ্র: চিত্র নং—৩)।

এই বারুণীর কূলে যে উদ্যান সেখানে রয়েছে ভাস্কর্য। গৃহস্থের ধনাঢ্যতা ও শিল্পশখের সাক্ষ্য। 'বারুণীর কূলে, উদ্যানমধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিকা ছিল, বেদিকামধ্যে একটি শ্বেতপ্রস্তরখোদিত স্ত্রীপ্রতিমূর্তি—স্ত্রী মূর্তি অর্ধাবৃতা, বিনতলোচনা—একটি ঘট হইতে আপন চরণদ্বয়ে যেন জল ঢালিতেছে।' কিন্তু সাহেবী রুচির নকলে গড়া এই বিলিতী পুতুলে বঙ্কিমের নিজস্ব অভিরুচি নেই। ভ্রমর তাই মূর্তির অশোভন রূপ দেখে 'কালামুখী বলিয়া গালি দিত'।

এই উপন্যাসে গোবিন্দলাল-রোহিণীর প্রমোদভবনেও বঙ্কিম ছবি সাজিয়েছেন। কিন্তু সে ছবি নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর শয়নমন্দির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ এখানে সমাজ বিগর্হিত অবৈধ কামনা বাসনার চরিতার্থতা হয় মাত্র। লোকালয় থেকে বহুদূরে এক জনশূন্য প্রান্তরে রম্য অট্টালিকার সেই সুসজ্জিত কক্ষ বিলাসব্যসনের উপকরণ প্রাচুর্যে ভরপুর। 'পুষ্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল।· কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র—কিন্তু কতকগুলি সুরুচিবিগর্হিত—অবর্ণনীয়' (ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৮)।

সুরুচিবিগর্হিত বলতে বঙ্কিম কী বোঝাচ্ছেন তা সহজেই অনুমেয়। গ্রীক ভাস্কর্য মডেলের অনুকরণে আঁকা বিবসনা নারীমূর্তি সেকালের হঠাৎ নবাব বা নববাবু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করে। বিত্তবানের বাগানবাড়িতে এমন-কি বসতবাটীতে ও উদ্যানে নগ্নিকা, অর্ধনগ্নিকা ভেনাস বা স্খলিত-বসনা নিওবির প্রস্তরমূর্তি সহজদৃশ্য ছিল। কিন্তু বঙ্কিমের শিল্পরুচি জীবন্ত মডেলের অনুকরণে গড়া এই দেহবাদী নগ্নিকামূর্তি বা চিত্রে আনন্দস্বাদ পায়নি। চিত্তমালিন্যকর সৌন্দর্যে বঙ্কিমের বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। তাই তাঁর দুর্গেশ-নন্দিনীর রূপে কখনোই 'চিত্তমালিন্যজনক লালসা' জাগে না, মনোরমার মূর্তি আনন্দময়ী—'হৃদয় শীতল করে', রজনীর সৌন্দর্য 'অনিন্দনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে—তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখনও পাগল হইবে না।' বঙ্কিমের মতে 'যে সৌন্দর্যের উপভোগে ইন্দিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সৌন্দর্যই সৌন্দর্য' (রজনী, ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৪)।

'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' প্রবন্ধেও স্মরণ করিয়েছেন—'সৌন্দর্যতৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়া এবং পরিপোষণীয়া। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে, তন্মধ্যে এই সুখ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কেননা, প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নির্মল, পাপসংস্পর্শশূন্য; সৌন্দর্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট: কিন্তু সৌন্দর্যজনিত সুখ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন।' তাই ইন্দ্রিয় সম্ভোগদোষে দুষ্ট অপবিত্র অদর্শনীয় রূপে তাঁর তীব্র অনীহা। 'যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব' (ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৮)।

শিল্প সাহিত্য উভয়েরই শোভন সীমায় বঙ্কিম সচেতন। শিল্পমাত্রেই তাই তাঁর কাছে সৌন্দর্যদায়িনী বিদ্যা নয়। তাঁর বিশ্বাস শিল্পেরও রুচিবিকার হয়; পরিস্থিতিভেদে ব্যক্তি-রুচিভেদে শিল্পরুচিরও তারতম্য ঘটে। 'রাজসিংহ'-এ বর্ণিত রূপনগরের বাজারের পানের দোকানের ছবি এই সত্যই প্রমাণ করে। 'পানের দোকানে বড় জাঁক·· দেওয়ালে নানা বর্ণের কাগজ মোড়া—নানা প্রকার বাহারের ছবি লটকান—তবে চিত্রগুলি একটু বেশী মাত্রায় রঙ্গদার, আধুনিক ভাষায় "obscene"—প্রাচীন ভাষায় "আদিরসাশ্রিত" ' (ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৩)।

সমগ্র 'রাজসিংহ' (১৮৮২ ৯৩) উপন্যাসখানিই যেন ছবি, শুধু ছবি! মুঘল, রাজস্থানী ও পাহাড়ী পেন্টিং অ্যালবাম[১২] থেকে সরাসরি উঠে এসেছে।

টড-এর রাজস্থান বঙ্কিমের কল্পনার উপকরণ জুগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির অবয়ব পরিপোষণে এবং প্রসাধন পারিপাট্যে নিশ্চয় সাহায্য করেছে মুঘল ও রাজপুত চিত্রমালা। ভারতীয় মিনিয়েচরের বর্ণিল স্বপ্নময় রূপলোক, তার ঐশ্বর্য বৈভব, নায়ক-নায়িকার কল্পসম্ভব চূড়ান্ত সৌন্দর্য, রাজকীয় শৌর্য ও মহিমা, ব্রীড়াবনত প্রেম ও লাবণ্যের এমন নয়ন-বিমোহন ললিত মুঞ্জরণ কবি-শিল্পী-ভাবুক ও রূপাতুর বঙ্কিমের রোম্যাণ্টিক সত্তাকে অভিভূত করেছিল। তাই 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাল থেকেই মিনিয়েচর ছবির বর্ণাঢ্য বিভিন্ন দৃশ্যপট, ফুলকারি নকশা, পাড়, এমন-কি প্রতিকৃতির রূপচ্ছবি বেশবিন্যাস নানা ভাবে যেন তাঁর অবচেতনে অথচ অনায়াসে লেখকের সৃষ্টিকল্পনায় বাণীরূপ নিয়েছে। তিলোত্তমা ও চঞ্চলকুমারীর রূপবর্ণনার পাশে মিলিয়ে নেওয়া যায় মুঘল মিনিয়েচরের 'গুজরাতী রমণী'[১৩] বা 'কিষণগড়ের রাধা'র প্রতিকৃতি[১৪]। প্রসাধনরতা বিমলা,[১৫] চিত্রণরতা মেহেরউন্নিসা, মিনিয়েচরের অতি পরিচিত নায়িকা-ছবি। রাজস্থানী বা পাহাড়ী মিনিয়েচরের একান্ত সুলভ দৃশ্য দিয়েই তো 'রাজসিংহ'-এর কাহিনী উন্মোচন। রূপনগরীর রাজপুরীর জেনানামহলের সেই ছবিতে রয়েছে মিনিয়েচর অনুপুঙ্খের কারুকাজ। 'একটি বড় ঘর সুশোভিত। গালিচার অনুকরণে শ্বেতকৃষ্ণ-প্রস্তররঞ্জিত হর্ম্যতল; শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত নানা বর্ণের রত্নরাজিতে রঞ্জিত কক্ষপ্রাচীর; ঘরের দেওয়ালে সাদা পাথরের অসম্ভব পক্ষী সকল, অসম্ভব রকমে অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতির ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফল ভোজন করিতেছে। বড় পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল স্ত্রীলোক নানা রঙের বস্ত্রের বাহার: নানাবিধ উজ্জ্বল কোমল বর্ণের কমনীয় দেহরাজি,—কেহ মল্লিকাবর্ণ, কেহ পদ্মরক্ত, কেহ চম্পকাঙ্গী, কেহ নবদূর্বাদলশ্যামা,—খনিজ রত্নরাশিকে উপহসিত করিতেছে। কেহ তাম্বুল চর্বণ করিতেছে, কেহ আলবোলাতে তামাকু টানিতেছে···নাকের বড় বড় মতিদার নথ·· কানের হীরকজড়িত কর্ণভূষা··' (ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০৭)।

কে বলবে যে বঙ্কিম কোনো মিনিয়েচর ছবির খুঁটিনাটি ও রঙ মিলিয়ে মিলিয়ে হুবহু শিল্পবিবরণ দিচ্ছেন না।

এই মজলিশেই এসেছে এক তসবিরওয়ালী ছবি বেচতে। 'হস্তিদন্তনির্মিত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব চিত্রগুলি।' মুঘল যুগে এই ধরনের প্রতিকৃতি সম্বলিত ক্ষুদ্র ও ডিম্বাকৃতি ivory painting বিশেষ প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল। ইতিহাসসচেতন বঙ্কিম বিশেষ যুগের বিশেষ শিল্পরীতিটির প্রয়োজনীয় উল্লেখের

সাহায্যে স্থান ও কালমাত্রা রক্ষা করেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় ঊনবিংশ শতকের ধনী অভিজাত মহলেও ivory painting সংগ্রহ শখের ব্যাপার ছিল। অবনীন্দ্রনাথের এক পিসতুতো ভাই বাড়িতে বসেই হাতির দাঁতের ছবি আঁকা শিখতেন দিল্লীওয়ালা কোনো শিল্পীর কাছে। বহরমপুর বাসকালে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদী কারিগরদের খ্যাতি ও কাজ বঙ্কিম নিজের চোখে নিশ্চয়ই দেখেছেন। এদেশী সেই বিশেষ শিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যটুকু সুযোগমতো মেলে ধরতেও ভোলেননি।

বাদশাহকন্যা জেবউন্নিসা ও তাঁর শিশমহলের বর্ণনায় মুঘল ঐশ্বর্য ও বিলাসের বর্ণবৈভব বৈচিত্র্যে প্রকাশিত। সর্বত্র দর্পণমণ্ডিত কক্ষে সুকোমল গালিচায় জরির কামদার মখমলের বালিশে এলায়িত দেহভঙ্গিতে রাশি রাশি পুষ্প, আতর-গোলাপ পাত্র, যত্ন-প্রস্তুত তাম্বূলরাশি ও সুপেয় মদ্যপূর্ণ সুরাভৃঙ্গাররাজির মধ্যে উপবিষ্টা জেবউন্নিসার এক হাতে ধরা পানপাত্র অন্য হাতে আলবোলার ফরশী। এই প্রণয়বিলাসিনী মদিরাপিয়াসী ও তামাকু সেবনরতা নায়িকা মিনিয়েচরের বড় পরিচিত ছবি 'Lady with hukkah'-র[১৬] (দ্রঃ চিত্র নং—৪) সাদৃশ্য মনে আনে। Mirror work বা আয়না-বসানো কাজের বিশেষ সমাদর মুঘল যুগের স্থাপত্যে সহজেই লক্ষণীয়। বঙ্কিমও তাই মুঘল হারেমে বিলাসিনীর কক্ষসজ্জায় দর্পণমণ্ডিত অলংকরণের উল্লেখ করেছেন।

রূপনগরকন্যা চঞ্চলকুমারীর রূপ যেন সত্যিই কিষণগড়ের রাধার আদলে আঁকা। তার 'অতিদীর্ঘ কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃহচ্চক্ষুর্দ্বয়'—তার সর্বশোভাময়ী শান্ত দেবী প্রতিমাসম রূপ রাজস্থানী পাহাড়ী কলমের স্নিগ্ধশ্রী নায়িকার মুখচ্ছবিরই তুলনীয়। রাজপুত ছবির নায়িকার বৈশিষ্ট্যই তো দেখি তার বিশালায়ত চোখে।

মুঘল বাদশাহের শিবির-নগরীর বিশদ বর্ণনা বঙ্কিম ছবির মতো তুলে ধরেছেন 'রাজসিংহ'-এর সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। অধুনা ভিক্টোরিয়া-অ্যালবার্ট মিউজিয়ম লণ্ডন-এ সংরক্ষিত সপ্তদশ শতকে আঁকা মুঘল ছবি 'আকবরের চিতোর অবরোধ'[১৭]-এর দীর্ঘ পরিসরব্যাপী বর্ণাঢ্য শিবিরসজ্জার সঙ্গে অনায়াসে মিলিয়ে নেওয়া যায় রাজসিংহের সেই পটমণ্ডপরাজির বর্ণনা। সেই বাদশাহী তাঁবুতেও বঙ্কিম ছবি টাঙাতে ভোলেননি। 'বাহিরে উজ্জ্বল রক্তিম পটের শোভা, ভিতরে সমস্ত দেয়াল "ছবি" মোড়া। ছবি, আমরা এখন যাহাকে বলি তাই, অর্থাৎ কাচের পরকলার ভিতর চিত্র।' সপ্তম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে

আলমগীর বাদশার সমরসজ্জা, রণযাত্রা ও গিরিসংকটে রাজসিংহের সঙ্গে অতর্কিত সমরসাক্ষাৎ নাটকীয় ও বিশদভাবে চিত্রিত হয়েছে। শকটবাহিত কামানসহ বিশাল মুঘল সেনাবাহিনীর গিরিসংকটে প্রবেশের ও অতর্কিত আক্রান্ত হওয়ার এই ছবির মিল খুঁজে পাওয়া যায় ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়মে রাখা ষোড়শ শতকীয় মুঘলচিত্র 'আকবরের রণথম্ভোর অবরোধ'[১৮] (দ্রঃ চিত্র নং—৫) ও কলকাতা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সংগ্রহ 'অতর্কিত সমর-সাক্ষাৎ' বা 'Ambush' নামক মুঘল ছবিটির সঙ্গে।

এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে, ভারতীয় মিনিয়েচর ছবির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় হয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহ ও আর্ট স্কুল সংলগ্ন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মাধ্যমে। এশিয়াটিক সোসাইটির ও আর্ট স্কুলের চিত্রসংগ্রহ একত্র করে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের চিত্রবিভাগ খোলা হয়। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্কিম এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তাঁর স্বদেশের অতীত-গৌরব-সন্ধানী মন যে নানাবিধ অধ্যয়ন ও তথ্য সংকলনের জন্য সোসাইটির প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণা ও সংগ্রহ বিষয়ে সদা-উৎসুক থেকেছে, এর প্রমাণ তাঁর রচনায় সর্বত্র ছড়ানো। রাজপুত ও মুঘল যুগের জীবন-পরিবেশ পটভূমি বেশভূষা আচার-আচরণ শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে নিখুঁত তথ্য সংগ্রহার্থে তাঁর মন তৎকালীন ইতিহাস পঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই মিনিয়েচর ছবির সাহায্যও গ্রহণ করেছে। উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনা-সংস্থান, দৃশ্যকল্পনা চরিত্রের বেশবাস ও পটভূমির অঙ্গসজ্জার সঙ্গে মিনিয়েচরের প্রত্যক্ষ সাদৃশ্য এই ধারণার উৎস।

ভারতীয় রাগমালা চিত্রের সঙ্গেও যে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ বঙ্কিমের টোড়ি রাগিণীর রূপবর্ণনা (দ্রঃ চিত্র নং ৬)। ১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত "সঙ্গীত" প্রবন্ধের যে অংশটুকু বঙ্কিমের নিজস্ব রচনা সেখানে এই প্রাচীন ভারতীয় রাগিণীর ধ্যানরূপের বিবরণ রয়েছে, রাগপুত্র-পুত্রীর চিত্ররূপের নিহিত তাৎপর্যের বিশ্লেষণও রয়েছে। এ প্রবন্ধে বঙ্কিমের কবি ও শিল্পিসত্তা সুর ও ছবির মেলবন্ধনে, ভাবের রূপসাধনে বিস্মিত, বিমোহিত। 'প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমাসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তিহেতুই তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিণী সুন্দরী বনবিহারিণী, বনমধ্যে নির্জনে একাকিনী বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসন ভূষণ সকল স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিণীসকল আসিয়া তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে' (ব. র. ২য় খণ্ড,

পৃ. ২৮৬)। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিম দীপক ও তার পার্শ্ববর্তিনী রক্তাম্বরা গৌরাঙ্গী মুলতানী ও শুক্লাম্বরা ভৈরবী রাগিণীর উল্লেখ করেছেন।

সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজপুত মিনিয়েচরের অন্তর্গত রাজস্থানী ও পাহাড়ী চিত্রশৈলীতে রাগরাগিণীর ধ্যানরূপায়ণ ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হয়। টোড়ি রাগিণীর ছবি তার মধ্যে বিশেষ সমাদৃত ও বহুল প্রচারিত ছিল। একই রাগরাগিণীর একাধিক সংস্করণ ও রূপ প্রচলিত ছিল। বঙ্কিম-বর্ণিত টোড়ি, দীপক, মুলতানী এবং ভৈরবীর ছবির সংস্করণ জনসনের আর্ট অ্যালবামের সংগ্রহে খুঁজে পাওয়া যায়।

জনসনের আর্ট অ্যালবামের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা[২০] শ্রীমতী মিলড্রেড আর্চার ও টোবি ফক কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই সংগ্রহ থেকে সেই সময়ে প্রচলিত ও প্রাপ্তিযোগ্য মিনিয়েচর ছবির একটি বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের খাজাঞ্চি রিচার্ড জনসন উনিশ শতকের গোড়ায় উত্তর ভারত অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক মিনিয়েচর সংগ্রহ করেন, পাটনা মুর্শিদাবাদ কলমও বাদ যায়নি। মিনিয়েচরের প্রথম ব্যাপক সংগ্রাহক তিনি। সেই সংগ্রহ ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে লন্ডনে নিয়ে গিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তিনি বিক্রয় করেন। এই বিপুল সংগ্রহ নিয়েই লন্ডনে চার্লস উইলকিনসন্-এর উদ্যোগে India Office Library-র ভারতীয় চিত্র বিভাগ গড়ে ওঠে। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ঐ সংগ্রহশালার ছবি ও বুলেটিনের আদানপ্রদানে যোগাযোগ সংরক্ষিত হতো। জনসন-এর এই সংগ্রহের অনুপ্রেরণায় ভারতের বিভিন্ন মিউজিয়মে মিনিয়েচর শিল্প সংগ্রহ ক্রমেই গড়ে উঠতে থাকে। বঙ্কিম জনসনের অ্যালবামের প্রতিচিত্র অথবা অনুরূপ মূলচিত্র সোসাইটির সংগ্রহে দেখে থাকবেন। টোড়ি রাগিণী ও দীপক রাগের নানা সংস্করণ প্রচলিত ছিল। দন্ডায়মানা টোড়িই সর্বত্র দেখা যায়। তবে বঙ্কিম যে লিখেছেন টোড়ি বসিয়া মধুপানে উন্মাদনী—সেই উপবিষ্টা টোড়ির একটি দুর্লভ নিদর্শন জনসন অ্যালবামের মুর্শিদাবাদ রাগমালা চিত্র তালিকাভুক্ত 3৪৪ সংখ্যক ছবিখানি। জনসন-এর অ্যালবামের সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয়ের এটি একটি বড় প্রমাণ।

কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পাহাড়ী মিনিয়েচরের প্রভাব 'মৃণালিনী'তেও খুঁজে পাওয়া যায়। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর মিলনদৃশ্যের নৈসর্গিক বর্ণনায় সেই মিনিয়চরের প্রকৃতি শোভা। 'নীলনীরদখণ্ডবৎ দীর্ঘিকা শৈবাল কুমুদ-কহ্লার সহিত বিস্তৃত রহিয়াছিল। মাথার উপরে চন্দ্রনক্ষত্র-জলদ সহিত আকাশ আলোকে

হাসিতেছিল। ধৈর্যময়ী প্রকৃতির প্রাসাদমধ্যে, মৃণালিনী হেমচন্দ্র মুখে মুখে দাঁড়াইলেন।' ছবিখানি অবিকল পাহাড়ী কলমের রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন।[২১] মিনিয়েচরের বর্ণাঢ্য স্বপ্নমেদুর প্রাকৃতিক শোভা রূপতৃষ্ণায় আকুল বঙ্কিমের শিল্পীস্বভাবকে আচ্ছন্ন করেছিল আর কাহিনীমূলক রূপলোকে রচিত হয়েছিল তাঁর রোম্যাণ্টিক কল্পনা-বিস্তারের অবাধ অবকাশ। বিস্ময়ের কথা যে, সেকালের কলকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র ও খ্যাতিমান শিল্পীমনে যখন দেশজ শিল্প সম্পদ কোনোই আলোড়ন সৃষ্টি করেনি, শিল্পচর্চায় যখন তার কোনো প্রভাব নজরে আসে না, তখন বঙ্কিম তাঁর সাহিত্যে পরোক্ষভাবে সেই শিল্পকে ঠাঁই দিলেন। সেই ছবির আলোচনায় প্রকারান্তরে সেই শিল্পসৌন্দর্যকেই পুনরাবিষ্কার করলেন। রাগমালা চিত্রের শিল্পসুষমার আবিষ্কারক আনন্দ কুমারস্বামীর টোড়ি রাগিণীর রসাস্বাদনের

বহু পূর্বেই বঙ্কিম এই চিত্রের শিল্পস্বাদ গ্রহণ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই শিল্প সম্পর্কে ঔদাসীন্যের কারণ বিশ্লেষণ করে এবলিং লিখেছেন, 'Ragmala painting ceased to be a living art in the nineteenth century due to the growing influence of western civilisation, the decay of the feudal system and its culture, the declining practice of traditional arts in general, and other factors.'[২২]

ই. বি. হ্যাভেলই প্রথম আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষ থাকাকালীন (১৮৯৬—১৯০২; ১৯০৩—১৯০৮) স্কুলের সংগ্রহের ভিতর বিলিতী পেণ্টিং-এর ভিড়ের মধ্যে কয়েকটি মুঘল রাজপুত মিনিয়েচর আবিষ্কার করে বিস্মিত হন এবং ক্রমে বিদ্যালর সংগ্রহ থেকে সমস্ত বিলিতী ছবি সরিয়ে ফেলে সযত্নে সাজিয়ে রাখেন পার্শিয়ান, মুঘল ও রাজস্থানী ছবি। মুঘল চিত্রের অ্যালবামই একদা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশৈলীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। হ্যাভেল-এর প্ররোচনায় এই স্বদেশী মিনিয়চরের শিল্পসৌন্দর্যের মধ্যে বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট-এর পুরোধা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচর্চা অভীষ্ট পথ খুঁজে পেয়েছিল। দেশীমতে ছবি আঁকার প্রেরণা কল্পনায় সৌন্দর্যে ভরা বিষয়বস্তুমূলক (thematic) সেই শিল্পজগৎ থেকেই তিনি পেয়েছিলেন। রাজপুত-মুঘল চিত্রের পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক কাহিনী এবং পরিবেশের বিস্তৃত জগতের অনুপ্রেরণায় 'কৃষ্ণলীলা'র ছবিরাজির স্রষ্টা ক্রমে 'মুঘলসিদ্ধ' শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন। যোগ্য শিষ্য নন্দলাল হয়েছিলেন ঐ পৌরাণিক ধারার পথ বেয়ে 'শিবসিদ্ধ'।

এ সবই বিশ শতকের গোড়ার কথা। ঠাকুর-ভাইদের নিয়ে হ্যাভেল সাহেবের

নব-শিল্পান্দোলন শুরু করার অনেক আগে বঙ্কিমই প্রথম ভারতীয় যিনি দেশের নিজস্ব চিত্র-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন, সেই শিল্পকে ভালোবেসেছেন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে 'বিষবৃক্ষ'-এর চিত্রসজ্জায় এই সত্যই বুঝিয়েছেন যে বিলিতী চিত্ররীতি আমাদের শিল্পরীতি নয়, কল্পনাসমৃদ্ধ ভাবব্যঞ্জনাময় শিল্প-রীতিই আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত দেশী শৈলী।

'জেবউন্নিসা' ও 'ঔরঙ্গজেব'-এর প্রতিকৃতি বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন সযতন দক্ষতায়। আর পরবর্তীকালে এই দুই চরিত্র অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা তুলিতে ভারতশিল্পে অমর হয়ে রইল। 'আলমগীর' ছবির প্রস্তুতিপর্বে বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে ফিরে এসেছিল। প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রের অভিজ্ঞতায় ধরা আছে সেই ছবি। ছবিতে ওয়াশ দিচ্ছেন, শুকোচ্ছেন আর স্বগতোক্তি করছেন—'শুকোও বাদশা, রাজসিঙ্গির হাতে যেমন করে শুকিয়েছিলে ঠিক সেই রকম।'[২৩] বঙ্কিমের উপন্যাসে চিত্র উপাদান নিয়ে শিল্প ভাবনা অবনীন্দ্রনাথের মনে কোনো একটি সময়ে উৎসাহ জুগিয়েছিল। প্রিয় শিষ্য নন্দলাল বসুকে দিতে চেয়েছিলেন তার যোগ্য উত্তরাধিকার। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল তারিখে লণ্ডনবাসী হ্যাভেলকে লেখা অবনীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে রয়েছে সেই সূত্র। সেই চিঠির বিশেষ পঙক্তি—'I will get Nandalal do Bankim's illustration and send them as soon as possible.[২৪]—আমাদের কৌতূহল উদ্দীপিত করে। কিন্তু নন্দলাল বসুকে দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের কোন সাহিত্য বিষয় চিত্রায়িত করতে চেয়েছিলেন, হ্যাভেলই বা কেন এ প্রসঙ্গে জড়িত ছিলেন সে প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর মেলে না। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত G. D. Anderson কর্তৃক অনূদিত Indira and other stories by Bankim Chattopadhyaya গ্রন্থটিতে নন্দলাল বসুর আঁকা 'ইন্দিরা'র দুটি রঙীন সচিত্রায়ণ সংযোজিত হয়েছিল। তার আগে ১৩২০ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় 'কালীদীঘির পাড়ে ইন্দিরা' ছবিটি মুদ্রিত হয়। বিশ শতকীয় শিল্পপুরোধাদের মনে বঙ্কিম-চিত্র ভাবনার যে একটি স্থান ছিল এ চিত্র তার প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বঙ্কিমের জীবদ্দশায় তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে কোথাও কোনো সংস্করণে, এমন-কি তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকাতেও, কোনো অলংকরণ বা চিত্র ব্যবহৃত হয়নি। অথচ মুদ্রিত গ্রন্থে চিত্রসজ্জা তখন প্রায় রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। 'আলালের ঘরে দুলাল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৭০) চিত্রভূষিত হয়ে বেরিয়েছে। মাইকেলের একখানি গ্রন্থও নাকি হাটখোলার

গিরীন্দ্র দত্তের আঁকা প্রচ্ছদে অলংকৃত হয়েছিল। সচিত্রিত ছিল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫৯), ব্যঙ্গ পত্রিকা 'বসন্তক' (১৮৭৪), 'বালক' (১৮৮৫)। অন্নদা বাগচী নিজে 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকার প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' নিরাভরণ। বঙ্কিমের খাস শিল্প সমঝদার চোখ হয়তো তৎকালীন অনুন্নত পাত খোদাই কাঠ খোদাই-এর আবেদনহীন নিম্নমানের ছাপ-ছবির দুর্বলতাটুকু ধরতে পেরেছিল। তাই তাঁর মন সায় দেয়নি সচিত্রীকরণে। অবনীন্দ্র নন্দলালের মতো প্রতিভাবান শিল্পীই হতে পারতেন তাঁর যোগ্য চিত্রকর।

নবজাগরণের কালে সচেতন মন নতুন দৃষ্টি নিয়ে নিজের পরিপার্শ্বকে আবিষ্কার করে। যার ফলে দেখা দেয় অতীত গৌরববোধ। এবং সেই বোধই জাগিয়ে তোলে স্বদেশের প্রতি তীব্র ভালোবাসা। আর এই ভালোবাসার আলোয় নব-নব রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশজ লোক-সংস্কৃতির ছড়ানো-ছিটোনো তুচ্ছ ক্ষুদ্র মণিকণাগুলিও। ভারত শিল্পের নবজাগরণ ও রূপায়ণের সময়ে প্রাচীন ঐতিহ্যগত শিল্পসম্ভার নবযুগ প্রবক্তা অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-ক্ষমতাকে যেমন করেছিল ক্রিয়াশীল, সেই সঙ্গে দেশজ লোকশিল্প সম্পর্কেও তাঁর মনকে করেছিল স্পর্শকাতর। তাই চিরায়ত লোকাচারমূলক পূজা-পার্বণ ও ব্রতকথার আলপনা নকশার লালনেও তিনি হয়েছিলেন সমান আগ্রহী।

অনুরূপ ভাবে স্বদেশপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় মহত্তম শিল্পভাণ্ডারের রস-আস্বাদন করার পরেও বঙ্গলোকশিল্পের শান্ত নম্ররূপটিকে সস্নেহ মর্যাদায় ঠাঁই দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে। 'বিষবৃক্ষ' এবং 'আনন্দমঠ'-এ তিনি যেমন আলপনার মতো গৃহকোণ শিল্পের দিকে নজর ফিরিয়েছেন, তেমনই এই 'আনন্দমঠ'-এই (১৮৮২) তুলে ধরেছেন বাংলার পটুয়াদের আঁকা প্রাচীন ও জনপ্রিয় পটশিল্পের ধারাটিকেও। 'দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী' কল্যাণী মহাশ্বেতার মতো বিষণ্ণ-গম্ভীর সৌন্দর্য নিয়ে যেখানে বসে আছে সেই ঘরের চারিপাশে সাজানো রয়েছে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার পট, কালিয়দমন, নবনারীকুঞ্জর, বস্ত্রহরণ, গোবর্ধনধারণ ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার পট। যেন পট-আঁকা চালচিত্রঘেরা প্রতিমার মহিমময়ী সৌন্দর্যটুকু ফুটিয়ে তোলা শিল্পীর অভিলাষ। এই চিত্রগুলির নীচে লেখা 'চিত্র না বিচিত্র ?' এ মন্তব্য নিশ্চয়ই ভাগবতপুরাণ কথায় বিবৃত কৃষ্ণের বিচিত্র দৈবীলীলায় বিস্মিত কুতূহলী বঙ্কিমের একান্ত নিজস্ব।

দেশকাল-সচেতন বঙ্কিম ১১৭৬ সালের পটভূমিতে আর্ট স্কুলের ছাত্রদের আঁকা পৌরাণিক ছবি তো আর সাজাতে পারেন না, সমকাল প্রচল দেশজ পটুয়াদের আঁকা পটেই তাঁর সাহিত্যিক অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে।

একটা সময়ে এদেশে এই পটুয়া সমাজ জেগে উঠেছিল ; এদের সৃষ্টিসম্ভারে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল ; ধর্মপ্রাণ সমাজ এই পটে আঁকা দেবদেবী চিত্রেই ধূপধুনো দিয়ে তৃপ্তি পেত।

ব্রজলীলার নানা প্রকার পটচিত্র শিল্পানুসন্ধিৎসু বঙ্কিম তাঁর গৃহদেবতা রাধামাধবের রথযাত্রা উপলক্ষে কাঁঠালপাড়ার বাড়ির বহিরাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আষাঢ় মেলায়, সমসময়ে নৈহাটি শ্যামনগরের মেলায়, বারুইপুর থাকাকালে ২৪ পরগনার গ্রামে, গড়িয়া ও কালীঘাটে, মেদিনীপুর ও বীরভূমে কর্মরত সময়ে অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকবেন। বীরভূম-মেদিনীপুর কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পটের জন্য বিখ্যাত ছিল। বিশেষত বীরভূম পটের প্রাচীন ঐতিহ্য, বিবর্তনহীন প্রাচীন রীতি ও পৌরাণিক বিষয়াবলীর জন্যে সেদিনকার মতো আজও বিশেষ মর্যাদা দাবি করে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের আস্তানা অজয় নদীর ধারের জয়দেব কেন্দুলীর কাছের এক গ্রাম কোটা—পটুয়াদের অন্যতম আবাসস্থল ছিল। প্রকৃতপক্ষে বীরভূম ও মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের পট শিল্পের কেন্দ্রীভূত দুটি জেলা। মুদ্রিত ছবির প্রচলন না থাকায় এককালে পটুয়ার হাতে আঁকা দেবদেবীর ছবি বা চৌকো পট মেলা বা তীর্থস্থানে ব্যাপকভাবে বিক্রি হতো। মেলা ও ধর্মস্থান বাহুল্য বীরভূমে পটুয়া ও পট সমৃদ্ধির কারণ।

ঐতিহাসিকদের মান বাঁচাতে 'আনন্দমঠ'-এর পটভূমি উত্তর বঙ্গে নিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত বঙ্কিম বীরভূমের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারেননি।

'আনন্দমঠ'-এ কৃষ্ণলীলার পট সাজিয়ে বঙ্কিম কেবল তাঁর মনোমত স্থান ও কালগত শিল্প ঐতিহ্যকে মর্যাদা দিয়ে তাঁর শিল্পপ্রীতির পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখলেন তা নয়, সেইসঙ্গে এই উপন্যাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় এক গূঢ় সাহিত্যিক সংকেতও সৃষ্টি করে গেলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ চিত্রসজ্জা বুঝি বা যোগিনী কল্যাণীকে ঘিরে এক দেবী-পরিমণ্ডল রচনা। কিন্তু এ চিত্র তো চিরপ্রেমিক কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার প্রকটিত রূপের। যে কৃষ্ণ ধর্মসংস্থাপনার্থে মহাভারতের বিশাল কর্মযজ্ঞের কর্ণধার, যে কৃষ্ণ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী মধুকৈটভহারী, ভবানন্দ প্রমুখ সন্তানদলের যিনি আরাধ্য দেবতা সেই শত্রু-দলন-বিষ্ণুর সঙ্গে এই রূপের কোনো মিল নেই। গোপীমনচোর কৃষ্ণের সঙ্গে বিশ্বরূপ-স্রষ্টার-কর্মধারার মিল খুঁজতে গিয়ে বঙ্কিমের মনে আশৈশব জাগ্রত সংশয়। তাই বুঝি তাঁর টিপ্পনী 'চিত্র না বিচিত্র ?' অথবা কর্মমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ সংসার-ত্যাগী বৈষ্ণবসন্তান ভবানন্দ-র অন্তরেও যে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মমতো বয়ে চলেছে অদম্য প্রেমবাসনার ফল্গুধারা মনুষ্যলোকে অতুলনীয়া সুন্দরী এই

কল্যাণীকেই ঘিরে, এ কি তারই ইঙ্গিত ! এমন করেই সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিম পটচিত্রের উপাদানকেও সাহিত্যিক অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন অপূর্ব কৌশলে।

'দেবী চৌধুরাণী'র (১৮৮৪) বজরায় দেবীরাণীর নিজস্ব কক্ষের পটসজ্জাও শুধুমাত্র অলংকরণ নয়। সেখানে 'কামরার কাষ্ঠের দেওয়াল, বিচিত্র চারুচিত্রিত। যেমন আশ্বিন মাসে ভক্ত জনে দশভূজা প্রতিমা পূজা করিবার মানসে প্রতিমার চাল চিত্রিত করায়—এ তেমনি চিত্র। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ : মহিষাসুরের যুদ্ধ ; দশ অবতার ; অষ্ট নায়িকা ; সপ্ত মাতৃকা : দশ মহাবিদ্যা : কৈলাস ; বৃন্দাবন : লঙ্কা ; ইন্দ্রালয় : নবনারী-কুঞ্জর : বস্ত্রহরণ ; সকলই চিত্রিত।'

বঙ্কিমের অভিপ্রায়ে প্রেমময়ী প্রফুল্ল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকারিণী শক্তিময়ী ঐশ্বর্যময়ী দেবী চৌধুরাণী। তাই তাঁর সিংহাসনের পৃষ্ঠপটে কৃষ্ণলীলা ও দুর্গাপট (দ্রঃ চিত্র নং—৭) আঁকা এই চালচিত্র। বৃন্দাবনলীলা চিত্রে প্রফুল্লর প্রেমময়ী সত্তার ব্যঞ্জনা আর দুর্গাপটে রয়েছে দেবী চৌধুরাণীর শক্তিমাতৃকা-রূপের ইঙ্গিত। দশভুজা দুর্গার চালচিত্র সমন্বিত বিগ্রহের ছবির উপকরণ বঙ্কিম তাঁর পৈতৃকগৃহের বার্ষিক দুর্গোৎসবের জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিমা থেকেই সরাসরি নিয়েছেন, কৃষ্ণনগর ঘূর্ণির শ্রেষ্ঠ পটুয়া শশী পাল তাঁদের বাড়ির ঠাকুর গড়তেন সর্বাঙ্গসুন্দর করে। উৎকৃষ্ট পট চিত্রকর চুঁচুড়ার মহেশ ও বীরচাঁদ সূত্রধর আঁকতেন চালচিত্রের পটগুলি অপূর্ব শিল্পকুশলতায়। বঙ্কিমের মনে সেই শিল্পকৃতির ছাপ গভীরভাবে আঁকা হয়েছিল।[২৫]

দশভুজা দুর্গা বঙ্কিমের প্রিয় প্রতিমা। জ্ঞান, ঋদ্ধি, বল, সিদ্ধি প্রদায়িনী দশভুজা দুর্গার ষড়ৈশ্বর্যময়ী মৃন্ময়ী রূপের মধ্যেই স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিম একদা তাঁর চিন্ময়ী দেশমাতৃকার ধ্যানরূপটি খুঁজে পেয়েছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে যে ধ্যানরূপের বন্দনা, 'আনন্দমঠ'-এর সত্যানন্দ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে তারই বর্ণনা। 'আনন্দমঠ' রচনার বহুকাল আগে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমার ছবি এঁকে দেশের প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত তাঁর হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। 'এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিতা দশভুজ—দশ দিক্—প্রসারিত তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত ; পদতলে শত্রু-বিমর্দিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত।' বঙ্কিমের আকাঙ্ক্ষিত দেশ-জননীর এই প্রতীকীরূপ সত্যানন্দের মন্দিরেও। সেখানে দেশ-জননীর ত্রৈকালিক রূপ রচিত হয়েছে দুর্গার ত্রিবিধ রূপের মধ্য দিয়ে। 'সর্বা-

লঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী বালার্কবর্ণাভা ঐশ্বর্যশালিনী' জগদ্ধাত্রীরূপে মা-র অতীতমূর্তি ; 'অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী হৃতসর্বস্বা নগ্নিকা'-কালীরূপে দেশ-জননীর বর্তমান রূপ ; ও 'দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী' নবারুণকিরণে জ্যোতির্ময়ী দশভুজারূপে মায়ের ভবিষ্যরূপটি বঙ্কিম যেমন পরম আবেগে রচনা করেছেন তেমনি সযতনে এঁকেছেন দেশমায়ের চিরন্তনী মূর্তিটি। বঙ্কিমের অভীষ্টা দেবী সেই দেশ-জননীর বিশ্ববিমোহিনী-রূপ পরমজ্ঞান ও ধনের চূড়ান্ত ঐশ্বর্যে অতুলনীয়া—বিষ্ণুর অঙ্কোপরি সে এক মোহিনী মূর্তি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা, গন্ধর্ব. কিন্নর দেব যক্ষরক্ষ সকলেরই বন্দিতা।

হেস্টির সঙ্গে বাদানুবাদমূলক ঐতিহাসিক পত্রে[২৬] বঙ্কিম লিখেছিলেন, 'The homage we owe to the ideal of the human realised in art is admiration.' বলেছেন, শিল্পী আপনার ধ্যানের ধনকে যখন বিগ্রহে রূপায়িত করে আপন অনুভূতি ও আবেগ সঞ্চার করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন তখনই প্রাণহীন পুতুল জাগ্রত প্রতিমায় পরিণত হয়। প্রতিমা রহস্যের ব্যাখ্যা করে আরও বলেছেন, 'The image is simply the visible and accessible medium through which I choose to send my homage to the throne of the Invisible and Inaccessible.' আর তাই অদেখা অধরা স্বদেশ আত্মার ভাবমূর্তিটিকে তিনি দেবীমাতৃকার শিল্পরূপ দিয়ে নিজের প্রেম ও ভক্তির অর্ঘ নিবেদন করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা'র প্রস্তুতিপর্ব তো প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমেরই রচনা।

বিংশ শতকের গোড়ায় উদ্বেলিত স্বদেশীয়ানার যুগে ভগিনী নিবেদিতার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ অবনীন্দ্রনাথের দেশভাবনা 'ভারতমাতা' (১৯০৬) চিত্রে রূপায়িত হয়েছিল। গৈরিকবসনা চতুর্ভুজা শান্তশ্রীমণ্ডিতা উষাময়ী মাতৃ প্রতিমার স্তুতিব্যাখ্যা করে ১৩১৩ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায় নিবেদিতা নিবেদন করলেন, 'এশিয়োদ্ভূত কল্পনাজাত মূর্তিটির চারি বাহু দৈবশক্তির বহুত্বের চিহ্নস্বরূপ, ইহাই প্রথম উৎকৃষ্ট ভারতীয় চিত্র, যাহাতে একজন ভারতীয় শিল্পী যেন মাতৃভূমির অধিষ্ঠাত্রীকে ভক্তিদায়িনী, বিদ্যাদাত্রী, বসনদায়িনী, অন্নদামায়ের আত্মাকে দেশরূপী শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহার সন্তানগণের মানসনেত্রে তিনি যেরূপ প্রতিভাত হন, সেইভাবে অঙ্কিত

করিয়াছেন। মায়ের মধ্যে শিল্পী কি দেখিয়াছেন, তাহা এই চিত্রে আমাদের সকলের কাছে বিশদ হইয়া গিয়াছে।'

'আনন্দমঠ'-এ কল্পিত দেশমাতার ত্রৈকালিক ও চিরন্তনী রূপটি দেখে আমরাও বিশদ বুঝতে পারি দেশমাতার মধ্যে শিল্পী বঙ্কিম কী দেখেছেন বা দেখাতে চেয়েছেন। রঙে তুলি ডুবিয়ে পটের বুকে ছবি যদি তিনি আঁকতেন তবে তিনিই হতেন স্বদেশমাতার প্রথম ভারতীয় শিল্পী। কবি তিনি, ক্রান্তদর্শী তিনি, জন্মভূমিকে 'জননী' সম্বোধন করেছেন প্রথম তিনিই—আবার দেশমায়ের ছবিও প্রথম তিনিই আঁকলেন ভাবের রঙে রাঙিত করে হৃদয়ের রসে সিক্ত করে কবি-কল্পনার সূক্ষ্ম তুলিটি টেনে সযতনে পরম অনুরাগ ভরে। বঙ্কিমের তাই যথার্থ উপলব্ধি: 'Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the ideal in beauty, in power and in purity must find an expression in the world of the real. Hence proceed all poetry and all art. Exactly in the same way the ideal of the Divine in man receives a form from him, and the form an image.'[২৭] এই অনুভূত সত্যজাত প্রত্যয়েই 'বঙ্গে দেবপূজা' প্রবন্ধে বললেন, 'সাকার পূজা কাব্য ও সূক্ষ্ম শিল্পের অত্যন্ত পুষ্টিকারক।'

এই প্রস্তরমূর্তি সকল······যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু?

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মীয় ও সামাজিক নবজাগৃতির কালে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী মন যখন হিন্দুধর্ম সংস্কারে উদ্যত হলো তখন হিন্দুর বিগ্রহবাদই ব্রাহ্ম, খৃস্টান ও নিরীশ্বরবাদীর তীব্র আক্রমণে জর্জরিত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। তার প্রতিক্রিয়ায় স্বদেশের ঐতিহ্য ও মহিমাসন্ধানী বঙ্কিম এই সাকার পূজার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করে শিল্পের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণে তৎপর হলেন। এরই ফলে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সংগ্রহার্থে অভীষ্ট প্রতিমাশিল্পের সন্ধানে ক্রমশ তিনি প্রবেশ করলেন এদেশী ভাস্কর্য শিল্পের অবহেলিত ক্ষেত্রে। এতদিন তিনি শুধু দেশীয় চিত্রমহিমায় আবিষ্ট ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে শুরু হলো তাঁর স্বদেশী মূর্তিকলার

জগতে পরিক্রমা। প্রাথমিক ভাবে তাঁর এই প্রতিমাশিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণের সন্ধানে ফেরা যেন দুরাকাঙ্ক্ষার বৃথা ভ্রমণেই পর্যবসিত হলো। সেই মুহূর্তে তাঁর চারপাশে ঘূর্ণির কুমোরের গড়া মাটির পুতুল বা 'Bazzar toys'[২৮] ছাড়া কোনো নিদর্শনই চোখে পড়েনি। তাই বুঝি তাঁর দ্রুত সিদ্ধান্ত : 'India has produced no sculptors.'

প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতক ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রে বন্ধ্যা যুগ। ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্যগত ধারাটি মূর্তিবিরোধী গোঁড়া মুসলিম শাসকদের আমল থেকে বিনষ্ট হতে শুরু করে। দীর্ঘকাল মুসলিম শাসন কবলিত বাংলা-দেশেও মূর্তিশিল্প বিকাশের পথটি ক্রমে রুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য বাংলার মন্দির-গাত্রের পোড়ামাটির অলংকরণে ভাস্কর্যশিল্প আর এক বিশেষ সমুন্নত মাত্রা ও মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু বঙ্কিমের দৃষ্টি যে-কোনো কারণেই হোক সে দিকে যায়নি। মেদিনীপুর বীরভূম ও হুগলীর মতো মন্দির টেরাকোটা শিল্পে সমৃদ্ধ স্থানে বসবাস কালেও যে বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তাঁর নজর পড়ে নি এ কথা ভাবলে অবাক লাগে। যাই হোক, বাংলার ভাস্কর্য বলতে সেই মুহূর্তে তিনি পরিচিত ছিলেন কেবল কুমোরের গড়া পুতুল ও প্রতিমার সঙ্গে। কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্ররাও কেবল গ্রীক মডেলের প্লাস্টার ছাঁচের অনুকরণে মাটির প্রতিমূর্তি গড়া অভ্যাস করত। প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিশিল্পের কোনো রূপ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান ও শ্রদ্ধা সে যুগের বিদেশী শিল্পশিক্ষক বা প্রাচ্যগবেষক কারোরই ছিল না। 'History of Indian and Eastern Art and Architecture'-এর লেখক ফার্গুসনের দৃষ্টি ভারতীয় মন্দিরের স্থাপত্য-শৈলীতেই বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল। ম্যাক্সমুলের সাহেবের মতো প্রাচ্যপ্রেমীও ভারতীয় শিল্পসৌন্দর্যতত্ত্বের মর্মরহস্য উপলব্ধি করতে না পেরে মন্তব্য করেন, 'The idea of the Beautiful in Nature did not exist in the Hindu mind. It is the same with their description of human beauty. ....They never excelled in sculpture, or painting.'[২৯]

Victoria and Albert Museum-এর Official handbook-এও তৎকালীন ঘোষণা, 'The monstrous shapes of the Puranic deities are unsuitable for the highest forms of artistic representation and this is possibly why sculpture and painting are unknown as fine arts in India.'[৩০]

মনিয়ের উইলিয়ামস-এর কশাঘাত আরও তীব্র, 'Not a single fine

large painting or beautiful statue is to be seen throughout India. Even the images of gods are only remarkable for their utter hideousness.'[৩১]

এই ধরনের মনোভঙ্গকারী মন্তব্যে বঙ্কিম বিরক্ত হয়েছিলেন ঠিকই, তবে বিভ্রান্তও কম হননি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় গড়া মেজাজ দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাচ্য সংস্কারগত মন আর অভিমানের তীব্র টেনশন তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। তাই তিনিও বিলিতি সাহেবদের মতো সীমিত জ্ঞানের পুঁজির ভিত্তিতে সহসা আমাদের হতচকিত করে লিখে ফেলেন, 'Our idols are hideous ; say they. True ; we wait for our sculptors. It is a question of art only. The Hindu pantheon has never been adequately represented in stone or clay ; because India had no sculptors. The few good images we had have been mutilated or destroyed by the hahds of Musalman Vandals. The images we worship in Bengal are as works of art, a disgrace to the nation. Wealthly Hindus should get their Krishnas and Radhas made in Europe.'[৩২]

এক বাক্যেই বঙ্কিমের এই মন্তব্য মনে তীব্র বিক্ষেপ সৃষ্টি করে ঠিকই কিন্তু সেই কাল এবং পরিপার্শ্বকে খুঁটিয়ে বিচার করলে বঙ্কিমকে সম্পূর্ণ দোষী করাও চলে না। ভারতীয় ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন সত্যিই তো বঙ্কিমের চারপাশে তখন কিছুই ছিল না। প্রাচীন ভাস্কর্যের অভঙ্গ পরিপূর্ণ রূপ দেখার সৌভাগ্য তখনও তাঁর হয়নি। অজন্তা ইলোরার নাম মাত্র শুনেছেন, দেখেননি তার নিদর্শন চিত্র, তখনও আবিষ্কৃত হয়নি পালদেশের বিস্ময়কর মূর্তিসম্পদ। যদি এই ঐশ্বর্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটত, তবে তিনি লিখতেন না যে ভারতে ভাস্কর জন্মায়নি, এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়। ঠিক সেই যুগ-মুহূর্তের জন্যে কথাটি সত্যমূলক। বাংলার আর্ট স্কুলে অন্নদা বাগচীর মতো চিত্রী তৈরি হলেও, কোনো দক্ষ ভাস্কর তখনও অনুপস্থিত। সাহেব শিক্ষকেরা দিশী ভাস্কর গড়ার চেষ্টাও করেননি। মল্লিকবাড়ি বা পাথুরিয়া-ঘাটার ঠাকুরবাড়ির গৃহশোভাকারী মর্মর পুত্তলিকা বিলেত থেকে আমদানি করা। বৃটিশ শাসকের অভিরুচি মতো নানান স্মারকমূর্তিও বিলেত থেকে গড়িয়ে জাহাজে বয়ে এনে এদেশে স্থাপন করা হয়েছিল। রিচার্ড ওয়েস্টম্যাকটের গড়া ওয়ারেন হেস্টিংসের মর্মর মূর্তি (১৮৩০) বা বেন্টিংকের ব্রোঞ্জ মূর্তি, জেমস্ আউটরামের ব্রোঞ্জ মূর্তি (১৮৭৪) তার নিদর্শন। ব্রোঞ্জ ঢালাই বা

পাথর খোদাই শিক্ষার সুযোগ উনিশ শতকে ভারতের শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল না। এ যুগের শেষপাদে ভাস্কর্যের পাঠ নিতে ইচ্ছুক তরুণেরা তাই পাড়ি দিয়েছিলেন বিলেতে। রোহিণীকান্ত নাগ বা ফণীন্দ্রনাথ বসুর ভাস্কর হিসেবে খ্যাতি বঙ্কিম দেখে যেতে পারেননি। প্রাচ্য ভাস্কর্যের প্রকৃত আদর্শ তাঁর সামনে ছিল না বলেই পাশ্চাত্য শিল্পরীতিকে তাঁর গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। বিলাতি রীতিবদ্ধ সুশৃঙ্খল শিক্ষাগত শিল্পনৈপুণ্যে তাঁর আস্থা ছিল—'বিষবৃক্ষ'-এ চিত্র-রচনার ক্ষেত্রে সে কুশলতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিলেত থেকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি গড়িয়ে আনতে চেয়েছিলেন কারিগরি শিল্প হিসেবে তা নিকৃষ্ট দিশি কুমোরের কাজের থেকে উৎকৃষ্ট হবে ভেবেই। যদিও এ কথাও নিশ্চিত যে সেই বিলিতি রাধাকৃষ্ণ মূর্তি তাঁর সম্পূর্ণ ধ্যানরূপের প্রতিচ্ছবি হতো না কখনোই।

তাই, শেষপর্যন্ত দেখি ভারতের উৎকৃষ্ট মূর্তির নিদর্শন বঙ্কিম গিরিগুহায় আবিষ্কৃত ভাঙাচোরা প্রাচীন ভাস্কর্যের মধ্যেই খুঁজে পেলেন। সেইসঙ্গে তাঁর পূর্ব ধারণা সম্পূর্ণ সংশোধন করে বিদেশী নকল শিল্পের নিন্দা ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকীর্তির প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন। আপন ঐতিহ্যের এই বিস্মৃত রূপটিকে খুঁজে পাবার জন্যে তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছিল অনেকদিন আগেই। কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমের আকুল আর্তি 'একটি গীত'-এ মূর্ছিত হয়েছিল, 'আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব লক্ষ্মণসেন, · এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? · সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ। কীর্তি কই? কীর্তিস্তম্ভ কই? · চাহিব কোন দিকে?' (কমলাকান্তের দপ্তর, ব. র. ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭)

অবশেষে উড়িষ্যার নির্জন প্রান্তরে উদয়গিরি ললিতগিরির শিখর সানুদেশে মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্নগৃহবিশিষ্ট প্রস্তর ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তর-গঠিত মূর্তিরাশিতে সেই মহীয়সী কীর্তি খুঁজে পেলেন। আর তখনই এতদিনের আত্মবিস্মৃতির জন্যে, অজ্ঞতার জন্যে, অনুশোচনায় ধিক্কারে তাঁর মন ভরে গেল, 'হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডাস্ট্রিয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি · আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি' (সীতারাম, ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯৩)।

এই উৎকৃষ্ট স্বদেশী শিল্পের পরিবর্তে চীনেমাটির পুতুল অথবা বিলিতি ধাঁচের বাগানবাড়ি মার্কা পুতুলে এ দেশের ধনীর গৃহ শোভিত হয় ভেবে তিনি তখন ক্ষুব্ধ, বেদনাহত। ভারত যে প্রকৃতই মূর্তিশিল্পে দীন নয় বরং মহিমময়-

সম্পন্ন, এই আবিষ্কারের আনন্দ উচ্ছ্বসিত আবেগে লিপিবদ্ধ হয়েছে 'সীতারাম'-এর (১৮৮৭) ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ললিতগিরি উদয়গিরির কাব্যিক বর্ণনায়। আত্ম-আবিষ্কারের আনন্দ জ্ঞাপনের জন্যেই যেন শ্রী ও জয়ন্তীকে নিয়ে গেলেন লেখক উড়িষ্যার সেই গিরিগুহায়। সেই অপূর্ব শিল্পরস-সম্ভোগের আনন্দের তীব্রতায় বঙ্কিমের কণ্ঠ পেয়েছে কবিভাষা : বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ঝরে পড়েছে আবেগ। সুরগ্রাম বাঁধা পড়েছে উচ্চ তারে, 'পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধ-সৌন্দর্য, সর্বাঙ্গসুন্দরগঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্য-স্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা তরলিতরত্নহারা, পীবরযৌবনভারাবনতদেহা এই সকল স্ত্রীমূর্তি (চিত্র নং ৮ দ্রষ্টব্য) যাহারা গড়িয়াছে তাহারা কি হিন্দু?' (সীতারাম, ব. র ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯৩)

শিল্পবস্তুর প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য স্বাদ উপভোগজনিত নান্দনিক ব্যাখ্যা বঙ্কিমের আগে বাংলা সাহিত্যে এমন করে আর কে করেছিলেন? আধুনিক কালের শিল্প-বিশ্লেষক শিল্পী বিনোদবিহারীর ধারণা সমর্থনে অনায়াসে বলা যায়, 'বাংলা ভাষায় art aesthetic সম্বন্ধে আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র pioneer।'[৩৩]

সমগ্র বঙ্কিম রচনা পরিক্রমাশেষে অতঃপর অনুভব করা যায় যে শিল্প সৌন্দর্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল সহজাত। পটে আঁকা ছবির প্রতি ছিল তাঁর সবিশেষ দুর্বলতা। ভাস্কর্য শিল্পের সুসমঞ্জস ছন্দোময় গঠনবিন্যাস তাঁকে মুগ্ধ করত। তাঁর আয়ত্তাধীন সমস্ত শিল্পসামগ্রী দু চোখ ভরে সপ্রেমে তিনি দেখেছেন। এই দেখা আর ভালোবাসা তাঁর সাহিত্যশিল্পে এক ধরনের রূপটান রচনা করেছে। পটে আঁকা ছবির চিত্রকল্প বার বার ব্যবহার করেছেন। যেমন 'নদীপারস্থিত উচ্চ অট্টালিকা এবং দীর্ঘ তরুবর সকল বিমলাকাশপটে চিত্রবৎ দেখাইতেছিল' (দুর্গেশনন্দিনী, ব. র ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩)।

শিল্পরত্নে কৃষ্ণোজ্জ্বল বর্ণের ক্রমবিন্যাসে বর্ণবৈপরীত্যের সাহায্যে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির কথা বলা আছে। শিল্পী বঙ্কিমও সেইভাবে বর্ণসমাবেশ ঘটিয়েছেন। যেমন 'শ্যামসলিলে শ্বেত মুক্তাহার' (ইন্দিরা, ব. র. ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪)। 'দ্বিরদশুভ্র স্কন্ধদেশে সুবর্ণপুষ্পশোভিত নীল উত্তরীয়' (যুগলাঙ্গুরীয়,

ব র ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০)।

বঙ্কিম তাঁর সময়ে তাঁর পক্ষে লভ্য দেশী বিদেশী যা কিছু শিল্প-সামগ্রী দেখেছেন, নিজের রচনায় তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ভারতীয় মিনিয়েচর, বিলিতি অয়েল পেণ্টিং, দেশী পৌরাণিক ছবি, বিদেশী আর্ট অ্যালবাম. দেশী পটুয়ার পট, মৃন্ময়ী দেবীপ্রতিমা এবং ধনীর বিলাস ভবনের বিলিতি কারিগরের মর্মরমূর্তি—হিন্দুমেলায় দেশী শিল্পোদ্যম ও ইংরেজ প্রশিক্ষকের অধীনে এদেশী ছাত্রশিল্পীর শিক্ষাগত নৈপুণ্য; সব কিছুই তাঁর মনে দাগ কেটেছে।

তাঁর উপন্যাসসৃষ্টির প্রথম পর্বে যেমন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য প্রভাবের সংঘাত সমন্বয় লক্ষণীয়, তেমনি এ সময়ের শিল্পমনস্কতার ক্ষেত্রেও ফুটে ওঠে দেশী-বিদেশী শিল্প বিষয়ের মিশ্রটানে এক ধরনের বিশেষ বুনট। এই কারণেই সেই পর্বে অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটেছে পৌরাণিক দেশী ছবির পাশাপাশি শেক্সপীয়র গ্যালারির আলোচনার, অনুপম মর্মরমূর্তির পাশাপাশি মৃন্ময়ী দেবীপ্রতিমার। একই কারণে তাঁর নায়িকার রূপবর্ণনায় প্রাচ্য শিল্পসুলভ কল্পসম্ভব চিত্রায়ণের সঙ্গে মিলেমিশে যায় বিলেতি অয়েলপেণ্টিং-এর আদল—দুর্গেশনন্দিনীর মুখশ্রী বর্ণনায় পাশাপাশি আসে দেহরূপ বর্ণনা, 'প্রস্তরশ্বেত গ্রীবা, কর্ণাভরণস্পর্শ-প্রার্থী পীবরাংস,·· কোমল করপল্লব, স্থূল কোমল রত্নালঙ্কার খচিত—অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয়।' মনে হয় যেন রুবেন্সের ছবি। প্রাচ্য উপমার ভাষায় ভাবের রঙের আলোছায়ায় নায়িকার মুখশ্রী ও ভাবলাবণ্য ফুটিয়ে তুলতে তুলতে আবার কখনো অন্য মনে গড়ে ফেলেন হেলেনিক প্রতিমা। দুর্গেশনন্দিনী ও রজনীর রূপ পরিস্ফুটনে তার প্রমাণ।

অপূর্ব আয়তশালিনী ইন্দীবরনিন্দী চক্ষুর প্রতি বঙ্কিমের ভারতীয় শিল্পীসুলভ দুর্বলতা। যেমন 'রজনী'তে দৃষ্টিহীনা নারীরূপ তাঁর মনে ক্ষোভ জাগায়, 'কারিগরে পাথরে খোদিয়া চক্ষুঃশূন্য মূর্তি গড়ে কেন?' নায়িকার মুখচ্ছবি বর্ণনায় বঙ্কিম প্রাচ্যচিত্রী কিন্তু যৌবনশ্রীময়ী রমণীর সুঠাম দেহ গঠন বার বার তাঁর মনে জাগায় দক্ষ ভাস্করের গড়া প্রস্তরমূর্তির উপমা। আবার ব্যক্তিত্বময়ী নারীর সম্ভ্রম-জাগানো সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনায় যেমন, আয়েষা, কপাল-কুণ্ডলা, মৃণালিনী কি চঞ্চলকুমারীর বর্ণনা দিতে বঙ্কিম বার বারই ভারতীয় দেবীপ্রতিমার মহিমময়ী রূপৈশ্বর্যের শরণপ্রার্থী। সাহিত্য জীবনের শেষ পর্যায়ে স্বদেশপ্রেমে যতই আপ্লুত হয়েছে তাঁর মন, বঙ্কিমের দৃষ্টি ততই গেছে দেশজ পটশিল্প ও পটুয়ার গড়া প্রতিমা শিল্পের দিকে। শেষ উপন্যাস ত্রয়ীতে ভাবগত

ও তত্ত্বগত প্রাধান্য মেনে নিয়েই ভাবময়ী নায়িকা মূর্তি গড়া হয়েছে। তাই সেই পর্যায়ে নায়িকার শারীরসৌন্দর্যের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় আর তেমন যত্ন নেই। 'ধবল-প্রস্তর নির্মিত প্রায় প্রতিমা'র উল্লেখও মেলে না। কেবলই দেখি দেবী-প্রতিমার উপমা। কল্যাণীকে তাঁর মনে হয় 'দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী', দেবী চৌধুরাণীকে দেখেন 'রূপবতী মূর্তিমতী সরস্বতী' রূপে, আর শ্রী, 'মূর্তিমতী বনদেবী', বৃক্ষারূঢ়া মহিষমর্দিনী।

সাহিত্যের মধ্যে সমকাল প্রচলিত শিল্পধারার অঙ্গীকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যেমন সুস্পষ্ট বঙ্কিমকালীন ও তৎপরবর্তী সাহিত্যে আর কিন্তু অনায়াসলক্ষ্য নয়। আধুনিক সমাজ অধিকতর শিল্পসচেতন হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক সাহিত্যে যুগশিল্পের প্রক্ষেপ বা প্রভাব এমন ভাবে আর তো চোখে পড়ে না। অথচ প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে নানাভাবে শিল্প-প্রসঙ্গ ছড়ানো। সেকালে কাব্য ও শিল্প ছিল ওতপ্রোত। জাতককাহিনী রামায়ণ মহাভারত তথা কালিদাসের কাব্যবিষয় চিত্রী ও ভাস্করের শিল্পকর্মে বাঁধা পড়েছে—আবার সমসাময়িক ভিত্তিচিত্র প্রতিকৃতিচিত্র লোকশিল্প ও ভাস্কর্য প্রসঙ্গ সাহিত্যিক অভিপ্রায়েই স্থান পেয়েছে কালিদাস ভবভূতি বাণভট্টের মতো কবিকুলের রচনায়।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্র ভাস্কর্য ছিল কাহিনীসমৃদ্ধ, অন্য পক্ষে প্রাচীন কাব্যসাহিত্য ছিল চিত্রগুণসম্পন্ন। চিত্রায়িত বর্ণনায় রূপে রসে ভরা কল্পরাজ্য গড়ে তোলায় প্রাচীন কবিপ্রতিভা ছিল সযত্ন। এদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা কথাশিল্পের জগতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পপ্রাণকবিদের যোগ্য উত্তরসূরী। বাণভট্টের 'কাদম্বরী' প্রসঙ্গে গৌরী ধর্মপাল যেমন বাণপ্রতিম শ্লিষ্ট ভাষায় বলেছেন—'বর্ণনা (description) তো নয় যেন বর্ণনা (painting)'[১৪] —সেই গুণ তো উত্তরাধিকারসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রেও বর্তেছে। ধ্রুপদীসাহিত্যের সৌন্দর্যলোক তাঁকে তাঁর সজ্ঞানে টেনেছে। নিত্যজীবনের শিল্পচর্চার বার্তা তিনি সেখান থেকেই আহরণ করেছেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সেই বার্তা ছড়িয়ে দিতে দিতে ক্রমশ তাঁর দৃষ্টি আপন শিল্প ঐতিহ্য সন্ধানে তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছে। এরই ফলে ক্রমশঃ তিনি হয়ে পড়েছেন সমকালীন শিল্পধারা সম্পর্কে সচেতন, বিশ্লেষণাত্মক, আর ঐতিহ্যগত শিল্প সম্পর্কে স্পর্শকাতর ও ভাবাতুর।

বঙ্কিমের মনোযোগী শিল্পানুসন্ধান এবং শিল্পদরদের প্রসঙ্গে এদেশে উনিশ শতকের শিল্প-প্রেমী ইংরেজদের একটি বিশেষ ভূমিকা স্বীকার করতেই হয়। এদেশে শিল্প সম্পর্কে আগ্রহের জমিটি কিন্তু নতুন করে তাঁরাই প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। বিদেশী ভারতবিদ্যা পথিকেরা একদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের

অনুবাদ, আলোচনায় প্রাচীন ভারতের মহিমা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন—অপর দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ও সংগ্রহের সাহায্যে অনাদরে অবহেলায় হারিয়ে যাওয়া শিল্পরত্ন উদ্ধার করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি, আর্ট স্কুল, ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের সংগ্রহ গড়ে উঠেছে তাঁদেরই উদ্যোগে, উৎসাহে। উড়িষ্যা অজন্তা ইলোরার সম্পদ বিদেশী অভিযানেই আবিষ্কৃত হয়। শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষাগত অভ্যাসের মাধ্যমে প্রকরণ কৌশল ও নৈপুণ্য আয়ত্তের সুযোগ এদেশী শিক্ষার্থীদের কাছে তাঁরাই করে দিয়েছিলেন। তথ্য হিসাবে এ-সবই স্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালপ্রবর্তিত শিল্পান্দোলনের সাহায্যে তাঁর শিল্পোৎসুক মনটিকে সমৃদ্ধ করে নিয়েছিলেন। সোসাইটি ও মিউজিয়ম সংগ্রহ তাঁকে প্রাচ্যশিল্প দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল: আর্ট স্কুলেব সুশৃঙ্খল পদ্ধতির শিক্ষা শিল্পীর নৈপুণ্য ও কারুকৃতি সম্পর্কে সজাগ করে তুলেছিল। ইংরেজদের শিল্প শৌখিনতাকে তিনি মনে মনে শ্রদ্ধা করতেন। মধ্যবিত্তের গৃহের পারিপাট্যসাধন ইংরেজদের নকলেই সম্ভব হয়েছে, আমাদের প্রকৃত স্বভাবে এই ধরন ছিল না—বঙ্কিম নিজেই তা স্বীকার করেছেন। ইংরেজদের সুসজ্জিত বৈঠকখানা তাঁর সাহিত্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিম পাশ্চাত্য শিক্ষায় অর্জিত বৈদগ্ধ্য ও স্বভাবগত সৌন্দর্য-বোধের সাহায্যে শিল্পের ক্ষেত্রে স্বদেশী মহিমা খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। ইংরেজের তৈরি শিল্প দৃষ্টান্তর প্রতি তুলনায় খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন দেশী শিল্প দৃষ্টান্ত। মূলত ভারতবাসী যে শিল্প-অচেতন নয়—সৌন্দর্য-প্রীতি শিল্পতৃষ্ণা যে তার নিজস্ব ঐতিহ্যগত, এই সত্যানুসন্ধানেই তিনি আজীবন শিল্পজগতে পরিক্রমা করেছেন।

কীর্তি কই? কীর্তি স্তম্ভ কই?

চিত্র ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের স্থাপত্য সম্বন্ধেও বঙ্কিমের কৌতূহল ও সচেতনতা তাঁর উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়।

'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' প্রবন্ধে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকে একই বন্ধনীভুক্ত করে বঙ্কিম লেখেন—'যে বিদ্যার অবলম্বন আকার তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতি সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের

সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য ।'

শিল্পের যে দুটি বিদ্যার অবলম্বন আকার গঠন সৌকর্যই যে সেই দুই শিল্পের মৌল গুণ বঙ্কিম সে তত্ত্বটি জানেন ও বোঝেন। ভাস্কর্যের মতো স্থাপত্যও ত্রিমাত্রিক শিল্প। তবে একে বলা যায় ইমারত শিল্প। এরও আছে উচ্চতা, বেধ, বিস্তার, সূক্ষ্ম কারিগরী ও সামগ্রিক আবেদন। কিন্তু সর্বোপরি স্থাপত্যের আছে ব্যবহারিক উপযোগিতা। একটি অখন্ড সৌধ, অথবা মূল কোনো সৌধসমেত তার নানা শাখাসৌধ, সেইসব সৌধের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি সব মিলিয়েই স্থাপত্যের রূপের সম্পূর্ণতা এবং সামগ্রিক আবেদন। স্থাপত্য ঘুরে ফিরে নানান পাশ ও কোণ থেকে ঊর্ধ্বতলে অবতলে দৃষ্টি মেলে দেখার বিষয়। স্থাপত্যের আছে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপ। প্রবেশ মুখে সদরে ধরা পড়ে পুরোদৃশ্য ক্রমে অন্দরে ঢুকলে নজরে আসে আভ্যন্তরীণ স্তর বিন্যাস ও অনুপুঙ্খ সজ্জা।

বঙ্কিম তাঁর 'আর্য জাতির সূক্ষ্ম শিল্প' প্রবন্ধে স্থাপত্য সংজ্ঞায় এ সব বিষয়ে বিশদ হননি। কিন্তু তাঁর উপন্যাসে বিন্যস্ত স্থাপত্য প্রসঙ্গে ইমারতী শিল্পের এই লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন।

স্থাপত্যকে বলা হয় বাস্তুশিল্প। বসতবাটি. কার্যালয়, গড়, স্মৃতিসৌধ, কীর্তিস্তম্ভ, দেবালয়, উপাসনা গৃহ প্রভৃতি যাবতীয় ইমারত স্থাপত্যের বিষয়।

এই সব সৌধের মধ্যে বসতবাটি কার্যালয় দুর্গ ইত্যাদি হল ধর্ম সংস্রবমুক্ত ইমারত। মঠ, মন্দির, মসজিদ, ধর্মীয় স্তম্ভ ইত্যাদি ধর্ম সম্পৃক্ত স্থাপত্য। সমস্ত সৌধেরই নির্মাণ যখন দৃষ্টিনন্দন সুষমা লাভ করে তখনই তা হয় স্থাপত্য শিল্পে উত্তীর্ণ।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে দুর্গস্থাপত্যের বর্ণনায় বঙ্কিম তেমন বিশদ হননি। শুধু জানিয়েছেন দুর্গটি 'আমূলশিরঃ পর্যন্ত কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত' আর নিরাপত্তার জন্যে গড়খাই বেষ্টিত। (ব. র. ১ম খন্ড পৃ. ৫৯—৬০)

'বিষবৃক্ষে' (১৮৭২) নগেন্দ্রের বাস্তুগৃহ বর্ণনায় বঙ্কিম প্রথম স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ মনোযোগী।

উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনী মুগ্ধ বিস্ময়ে 'মহাধনবান জমিদার' নগেন্দ্রনাথ দত্তের বিশাল ছয়মহলা বাড়ি খুঁটিয়ে দেখছে।

'কুন্দ নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক হইল। এতবড় বাড়ি সে কখনও দেখে নাই। তাহার বাহিরে তিনমহল, ভিতরে তিনমহল। এক একটি মহল, এক একটি বৃহৎ পুরী। প্রথমে যে সদর মহল, তাহাতে এক লোহার ফটক দিয়া প্রবেশ

করিতে হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, সুনির্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে গোগণের মনোরঞ্জন কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত সকুসুম পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে বড় উচ্চ দেড়তলা বৈঠকখানা। অতি প্রশস্ত সোপানারোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারেণ্ডায় বড় বড় মোটা ফ্লটেড থাম; হর্ম্যতল মর্মর প্রস্তরাবৃত। আলিশার উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃণ্ময় বিশাল সিংহ জটা লম্বিত করিয়া লোলজিহ্বা বাহির করিয়াছে। এইটি নগেন্দ্রর বৈঠকখানা। তৃণ পুষ্পময় ভূমিখণ্ড দ্বয়ের দুই পার্শ্বে অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুই সারির একতলা কোঠা। এক সারিতে দপ্তরখানা ও কাছারি। আর এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান। ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম 'কাছারিবাড়ি'।'

নগেন্দ্রের এই বাড়ি গোবিন্দপুর গ্রামে অবস্থিত। গ্রামটি ধীরে ধীরে বৃহৎ কলকাতা নগরীর রূপ নেবে। নতুন উপনিবেশী সভ্যতার পত্তন হচ্ছে এই গ্রামে। তাই নয়া আমদানী বিদেশী স্থাপত্যের আদলে গড়া হয়েছে মহাধনবান জমিদারের 'নতুন বৈঠকখানা'। নগেন্দ্রর পুরো কাছারিবাড়ি যেন লাটসাহেবের বাড়ির অনুকরণ।

ধনী জমিদার বা সামন্ত শ্রেণীর রাজাবাবুরা নবাগত বিদেশী স্থাপত্যের আদর্শে নয়া মহল গড়েছেন এমন দৃষ্টান্ত সেকালে প্রচুর।

বরাহনগরে হরকুমার ঠাকুরের বিখ্যাত 'মরকত কুঞ্জ' বা 'এমারেল্ড বাওয়ার', কিংবা কালীকিঙ্কর পালিতের ২নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়ি, যেটি পরে দুর্গাচরণ লাহা কিনে নেন; কিংবা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের মার্বেল প্যালেস, এ সবই ইউরোপীয় স্থাপত্যের এদেশী সংস্করণ। তখন চোখের সামনেই রয়েছে গভর্নর্স হাউস, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত সেনেট হল, টাঁকশাল ইত্যাদি খাঁটি বিলিতী রীতির স্থাপত্যের উদাহরণ। ডোরিক রীতির ধারীওয়ালা মোটা মোটা ফ্লুটেড্ (fluted) থাম, শ্বেতপাথরে বাঁধানো চওড়া ধাপের বিশাল সোপান শ্রেণী সমেত উঁচু ভিতের হল এই স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য (চিত্র—৯ দ্রষ্টব্য)।

নগেন্দ্রর আধুনিক ধাঁচের বৈঠকখানা ও কাছারিবাড়ির পাশে 'পুজার বাড়ি'।

সেখানে রয়েছে 'রীতিমত বড় পূজার দালান: আর তিনপার্শ্বে প্রথামত দোতলা চক বা চত্বর। মধ্যে বড় উঠান। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ি। সেখানে

বিচিত্র দেবমন্দির, সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট 'নাটমন্দির', তিন পাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারীদিগের থাকিবার ঘর এবং অতিথিশালা'। চক্‌মেলানো পূজা দালান, ঠাকুরবাড়ি, দেবমন্দির সমেত এই ছক্‌টি মধ্যযুগীয় সামন্ত-তান্ত্রিক ধনী সম্ভ্রান্ত হিন্দু বাঙালীর প্রথাগত বাস্তু নক্‌শা। এখানে 'বিচিত্র দেবমন্দির' বলতে পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত দেবদেউল হতে পারে। মনে হয় বঙ্কিম টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্পের আলাদা গুরুত্ব অনুধাবন করেননি। মন্দিরের বিচিত্র অলংকরণ মাত্র মনে করেছেন।

নগেন্দ্রর তিনমহল সদরের পেছনে তিনমহল অন্দরের পরিকল্পনাটিও সাবেকী রীতির। শুধু নগেন্দ্রর নিজস্ব অন্দরমহলটি নবনির্মিত। এবং 'তাহার নির্মাণ পরিপাটি'। তাঁর শয়নঘর আধুনিক ফ্যাশনে সুসজ্জিত ও চিত্রিত ছিল। যেন সেটি মল্লিক বাড়ির অন্দর মহলের কোনো কক্ষ। 'ঘরটি প্রশস্ত, এবং উচ্চ, হর্ম্যতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্মর-প্রস্তরে রচিত।' সেখানে রয়েছে বহুমূল্য দারুনির্মিত হস্তিদন্তখচিত কারুকার্যবিশিষ্ট পর্যঙ্ক। বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত কাষ্ঠাসন, বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি বিস্তর গৃহসজ্জার বস্তু। বেলগাছিয়া ভিলা, মার্বেল প্যালেস, ঠাকুরবাড়ি প্রভৃতি বনেদী ধনীর শুধু গৃহস্থাপত্য নয়, আসবাবপত্র, চিত্র-ভাস্কর্য ও বিচিত্র শিল্পে (কিউরিও) সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত অন্দর মহলও ছিল দর্শনযোগ্য।

নগেন্দ্রর নতুন মহলের পাশে পূজাবাড়ির পেছনে রয়েছে "সাবেক অন্দর, তাহা পুরাতন, কু-নির্মিত, ঘর সকল অনুচ্চ ক্ষুদ্র"। সেখানে বাস করেন বহু পরিজন, আশ্রিত ও পরিচারিকা দাসদাসীরা। এই মহলটিকে বলা যায় শিল্প-রুচির বালাইহীন শ্রীছাঁদমুক্ত সাধারণ বাঙালী গেরস্থর কোঠাবাড়ির নমুনা। ছোট ছোট চাপা কুঠুরির পুরনো ঢং-এর সাদামাঠা বাড়ি শৌখীন বঙ্কিমের পছন্দসই নয়, বোঝা যায়।

ছয় মহলা এই বিশাল দত্তবাড়ির পেছনে আছে এক পুষ্পোদ্যান। সেখানে আছে শ্বেতপাথরের লতামণ্ডপ, প্রাচীর বেষ্টিত দীর্ঘিকা। বাড়ির বাইরে পশুশালা চিড়িয়াখানা। এইসব নিয়েই দত্তবাড়ির সামগ্রিক চেহারা। নতুন ও সাবেকী ঢং-এর মিশ্রণে গড়া নগেন্দ্রনাথের সুবিস্তৃত সৌধসমষ্টি সেকালের যে কোনো বনেদী বর্ধিষ্ণু সম্ভ্রান্ত হিন্দু ধনী বাঙালীর পূর্ণাঙ্গ বাস্তু-নকশা। বিত্ত-বৈভব বিলাস ও স্থান প্রাচুর্যের সেই উনিশ শতকীয় যুগের বিত্তবানের বসতবাড়ির এটি একটি বিশ্বস্ত প্রমাণ চিত্র। বসতবাড়ির লাগোয়া পশুশালা ও চিড়িয়াখানার ছক্‌টি সম্ভবতঃ মোগলাই সংস্কৃতি থেকে হিন্দুধনীরা নিয়েছিলেন।

পারিবারিক বসতবাড়ি ছাড়াও সেকালের বিলাসী ধনীরা একটু নিরালায়

প্রমোদভবন বা বাগানবাড়ি তৈরি করতেন। নগেন্দ্রের জ্ঞাতি দেবেন্দ্রের দেবীপুরে 'বিচিত্র লোহার রেলিং ঘেরা' এক উপবনমধ্যে এইরকম বৈঠকখানা ছিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'-র গোবিন্দলাল, নির্জন প্রান্তরে কোনো নীলকুঠিয়াল সাহেবের পরিত্যক্ত বৃহৎ অট্টালিকা কিনে সেটি তাঁর বিলাসগৃহে পরিণত করেন। সাহেবদের তৈরি পুরনো পরিত্যক্ত প্রাসাদ বা কুঠিবাড়ি কিনে নেওয়া ছিল সেকালের বড়লোক বাঙালীর বিশেষ শখ। যেমন দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলার প্রাসাদোপম বাড়ি। এটি ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে তাঁর বিলাস-গৃহ হিসেবেই তৈরি। লর্ড অকল্যাণ্ডও এখানে কিছুকাল বাস করেছেন। ইউরোপীয় আসবাব ছবি ভাস্কর্য ও বিচিত্র শিল্প সংগ্রহ এ বাড়িরও বিশেষ আকর্ষণ।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ গোবিন্দলালের বাগানবাড়িটিও সাহেবী রুচিরই নজির। 'পুষ্পে, প্রস্তর পুত্তলে, আসনে দর্পণে, চিত্রে গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল।' (ব র ১ম, পৃ. ৫৫৮)

'বিষবৃক্ষে'র যুগে হীরা দাসীর মতো দীন দরিদ্র দুঃখী ইতর জনেরা বাস করতো 'নিকোনো ঝরঝরে, আলপনা আঁকা' মেটে বাড়িতে। দত্তবাড়ির ইলাহী বর্ণনার পাশে হীরার কুঁড়ে ঘরের ছোট্ট ছবি এঁকে বঙ্কিম সে যুগের ধনী দরিদ্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিসঙ্গতির চেহারা স্পষ্ট করেছেন বলা যায়।

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমের সমকালীন সমাজের নানাচিহ্নের ধারক। তাই তাঁর কালের চিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্য ও গৃহসজ্জার কিছু নমুনা এ উপন্যাসে তিনি পেশ করেছেন।

'রাজসিংহে' তাঁর দৃষ্টি মধ্যযুগের ঐতিহাসিক কালে প্রসারিত। তাই মুসলিম তথা মুগল স্থাপত্যের উল্লেখ সেখানে। 'চন্দ্রশেখরের' পটভূমিও ঐতিহাসিক। সেখানে মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ির বর্ণনার সুযোগ ইচ্ছে করলে বঙ্কিম নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি নেননি। এর কারণ সম্ভবতঃ 'চন্দ্রশেখরে'র বিষয় ছিল অন্য এক শর্তমুখী। শৈবলিনীর জটিল জীবন ও হৃদয় সমস্যায় বঙ্কিমের সমস্ত চিন্তা আচ্ছন্ন ছিল। তাই তিনি স্থান কালের বহির্পট সজ্জার অনুপুঙ্খে মনোযোগ দেননি।

'রাজসিংহে'-র স্থান কাল পাত্র ইতিহাস ছেনে তুলে নেওয়া। চলচ্চিত্র-ধর্মী এ উপন্যাসের দৃশ্য গুণ। ঐতিহাসিক শিল্প উপাদানের খুঁটিনাটি বর্ণনায় সেই দৃশ্য হয়েছে বিশ্বস্ত চিত্র। কখনো ক্যামেরার Wide Angle-এ ধরার মতো করে দেখিয়েছেন দূরবর্তী স্থাপত্যের সুবিস্তীর্ণ অথবা সু-উচ্চ বহিরাঙ্গিক রূপ, কখনো ক্লোজআপ শটে দেখিয়েছেন আভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার অনুপুঙ্খ বিন্যাস।

রাজপুত ও ইসলাম স্থাপত্যের নানা নিদর্শনের উল্লেখে বিশেষ স্থান এবং সময় এখানে ছবির মতো মূর্ত।

'রাজসিংহে'র সূচনা রূপনগরের রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর কক্ষের আভ্যন্তরীণ শিল্প সজ্জার বিবরণ দিয়ে। রাজপুত শিল্প সংস্কৃতিতে মুঘল শিল্প ছাপ ফেলছে, এই ধারণায়, সেই বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম লেখেন—'তখন তাজমহল ও ময়ূর তক্তের অনুকরণ-ই প্রসিদ্ধ'।

'রাজসিংহে'র মুঘল প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে মুঘল আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় স্থাপত্য ও শিল্প নিদর্শনের উল্লেখ বঙ্কিমের কাছে নিতান্ত জরুরী ছিল। তি । লক্ষ্যও করেছিলেন, সে সময়ের সৌধশিল্পে পরমাশ্চর্য স্থাপত্য কীর্তি তাজমহলের প্রভাব ছিল অনিবার্য। স্বাধীনচেতা রাজপুত রাণা মহারাণারাও এড়াতে পারেন নি বিধর্মীর শিল্প সৌন্দর্যের প্রবল প্রতাপ। তাঁদের শিল্পশৈলীতে পড়েছিল মুঘল ছাপ।

মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম শিল্পপীঠ দিল্লী। বঙ্কিমের বর্ণনায় "সহস্র সহস্র মর্মরাদি প্রস্তর নির্মিত মিনার গম্বুজ বুরুজ আকীর্ণ নগরীগণ প্রধানা মহানগরী দিল্লী"। সেখানে 'কুতুব মিনারের বৃহচ্চূড়া ধূমময় উচ্চস্তম্ভবৎ দেখা যায়। জুম্মামসজিদের চারিমিনার নীলাকাশ ভেদ করিয়া চন্দ্রলোকে উত্থিত হয়'। রাজপথ, পণ্য বীথিকা, নাগরিক গৃহ, বিপণিকেন্দ্র চাঁদনী চৌকসহ এই দিল্লী নগরী 'রাজসিংহে'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আলোকচিত্রের মতো স্পষ্ট ধরা আছে।

দিল্লীর সেরা সৌধ দিল্লীর দুর্গ লাল কিল্লা। বঙ্কিম তাঁর পাঠকমনে এই সৌধের একটি ধারণা পেঁছে দিতে চান। দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর বর্ণনা—'দিল্লী মহানগরীর সারভূত দিল্লীর দুর্গ; দুর্গের সারভূত রাজপ্রাসাদমালা।... রাজপ্রাসাদমালার সারভূত অন্তঃপুর বা রঙমহাল।' এই রঙমহালেই জেবউন্নিসার দর্পণমণ্ডিত বিলাসগৃহ শিশমহাল।

স্থাপত্য বর্ণনার কৌশল বঙ্কিমের আয়ত্তে। বাইরের সামগ্রিক রূপের একটি পরিচয় দিয়ে তিনি ধাপে ধাপে অন্দরে এগিয়ে যান ও অনুপুঙ্খ কারুকাজ বা গৃহ-অলংকরণে পাঠকের নজর টানেন।

'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম ইন্দো-ইয়োরোপীয় স্থাপত্যে ও 'রাজসিংহে' ইসলামী সৌধশৈলীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট। কিন্তু শেষ পর্যায়ে চিত্র ও ভাস্কর্যের মতো স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় আর কোনো বিদেশীমোহ তাঁর নেই। এখন স্বদেশ স্বধর্ম ও স্বজাতির ইতিহাস ও শিল্প সংস্কৃতির প্রতি তাঁর যত আগ্রহ যত

মায়া। তাঁর মন বিচরণ করেছে 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'। খুঁজেছে বাংলার পুরা-কীর্তি এবং বাঙালীর শিল্প-কীর্তি। দিল্লি, আগ্রা, ফতেহ্পুরসিক্রি, সেকেন্দরা বা শাহজাহনাবাদের স্থাপত্য কীর্তির শোভায় আর তাঁর মনে অনাবিল সুখোদয় হয় না। জাগে অন্য এক বিষণ্ণ চিন্তা।

"যখন আমরা তাজমহলের আশ্চর্য রমণীয়তা দেখিয়া আহ্লাদ সাগরে ভাসি, তখন কি বাঙালীর মনে হয় যে, যে সকল রাজ্যের রক্তশোষণ করিয়া এই রত্ন মন্দির নির্মিত হইয়াছে, বাঙ্গালা তাহার অগ্রগণ্য?" (বাঙ্গালার ইতিহাস ব. র. ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩২)

'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' বঙ্কিম বাংলার ও হিন্দুর কীর্তি চিহ্ন সন্ধানে ব্রতী। 'বিষবৃক্ষে'র ইন্দোবৃটিশ যুগের আধুনিক কাল থেকে উজানে যাত্রা শুরু করে রাজসিংহের মোগলীয় মধ্যযুগ পার হয়ে 'আনন্দ-মঠে' তিনি খাঁটি ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীন যুগে উপনীত হয়েছেন, এখন থেকে বঙ্কিম একান্তভাবেই প্রত্নমনস্ক। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি বন জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়া প্রাচীন মঠ মন্দিরে, জীর্ণ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষে, পুরনো রাজবাড়ির ভাঙা ভিটেয় অথবা দুর্গম পার্বত্য প্রদেশের শিল্পায়িত গুহা স্থাপত্যে নিবদ্ধ। যেন তিনি পুরাতাত্ত্বিকদের সমগোত্রীয় এখন।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিদেশী ভারত-তাত্ত্বিকেরা অনুসন্ধান, অভিযান ও উৎখননের সাহায্যে ভারতের অতি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও শিল্পকীর্তি উদ্ধার করে প্রাচীন ইতিহাস চর্চার একটি নব দিগন্ত এ দেশের সামনে মেলে ধরতে শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বনজঙ্গল ও পাহাড়ী অঞ্চলে দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে আবিষ্কৃত হয় অজানা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। এর ফলে প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্পসমৃদ্ধ ইতিহাস ও সেই সঙ্গে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীন রূপ দেশবাসীর কাছে নবরূপে উদ্ঘাটিত হতে থাকে।

এনসাইন জেম্স্, টি. ব্র্যান্ট, উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কার করেছেন দিল্লীর পুরাকীর্তি। আলেকজান্ডার কানিংহাম সারনাথের স্তূপ এবং জে. অ্যাবট, পি. টি. কাউট্লে উদ্ধার করেছেন সাঁচীর সতূপ। ১৮৬১-র ১লা ডিসেম্বর ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের উদ্বোধন হয়েছে। প্রথম পুরাতত্ত্ব সমীক্ষক নিযুক্ত হন কানিংহাম। পুরাতত্ত্ব বিভাগের সহায়তা নিয়ে এদেশের প্রাচীন পুরাকীর্তি আবিষ্কারে তাঁর অবিশ্রাম অভিযান শুরু হয়ে যায়। তাঁর পরিশ্রমের ফসল Ancient Geography of India ১৮৭১-এ প্রকাশ পায়।

কানিংহামের সহায়ক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রথম বাঙালী পথিক। প্রাচীন ভারতবর্ষের স্থাপত্য-ভাস্কর্য সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের নজির বহন করে ১৮৭৫-এ Antiquities of Orissa-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। শ্রেষ্ঠ পুরাণতত্ত্ববিদ হিসেবে রাজেন্দ্রলাল বঙ্কিমের কাছে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। হিন্দু-বৌদ্ধযুগ সম্পর্কে রাজেন্দ্রলালের বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। পাল সেন বংশীয় রাজবৃত্ত সম্পর্কিত প্রবন্ধে তার প্রমাণ রেখেছেন তিনি।

প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের প্রথম রচয়িতা জেমস ফার্গুসন। ১৮৭৬-এ প্রকাশ পায় তাঁর দুই খণ্ডের History of Indian and Eastern Architecture গ্রন্থ। প্রাচীন যুগের গুহাস্থাপত্য থেকে শুরু করে স্তম্ভ, তোরণ, স্তূপ, চৈত্য, বিহার, মন্দির ও পৌর সৌধ সম্পর্কে নানা বিবরণ এ গ্রন্থে লভ্য।

রাজেন্দ্রলালের পুরাচেতনা ও ভাস্কর্য-স্থাপত্য প্রীতি বঙ্কিমকে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করেছিল। ফার্গুসনের গ্রন্থটি তাঁর স্থাপত্য জ্ঞানের সহায়ক হয়েছিল। যদিও সকলের জানা, ফার্গুসনের নানা মন্তব্যে বঙ্কিম ছিলেন ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। মন্দির গাত্রে বিবসনা নারীমূর্তি সম্পর্কে ফার্গুসনের অভিমত —'these habits were really the prevailing costumes of the country at that time'[৩৭] বঙ্কিমকে কী পরিমাণে ক্রুদ্ধ করেছে তাঁর 'দ্রৌপদী' প্রবন্ধে রয়েছে প্রমাণ। সেখানে তিনি লিখেছেন 'এই সকল পণ্ডিতদিগের রচনা পাঠ করার অপেক্ষা মহাপাতক সাহিত্য সংসারে দুর্লভ'। (ব. র. ২য় পৃ. ১৯৭)

কিন্তু বঙ্কিম নিজে ফার্গুসনের বই খুঁটিয়ে পড়েছেন; এবং কৌতূহলী পাঠক আবিষ্কার করেন, যে তাঁর চিন্তা কল্পনা সেই 'পণ্ডিতে'-র দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত ও চালিতও হয়েছে। বঙ্কিমের স্থাপত্যমনস্কতায় নানাভাবে তা প্রমাণিতও হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা পুরাবস্তুর আবিষ্কার ও উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলের রাজনৈতিক ধর্মীয় ও সামাজিক পরিস্থিতির ইতিহাসও উন্মোচিত হচ্ছিল। একটি দেশের পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের গুরুত্ব ও মূল্য তাই যথার্থই অনুভব করেছিলেন বঙ্কিম। অধীর হয়েছিলেন বাঙলার নিজস্ব স্থাপত্য নিদর্শনের গৌরবময় চিহ্ন খুঁজে বের করার জন্যে।

সৌধ শিল্পের মস্ত বড় পৃষ্ঠপোষক মুঘল সম্রাট আকবর। তাঁরই আমলে বঙ্গদেশ প্রথম বাংলা সুবায় পরিণত হয়। ঢাকা হয় মুঘলের শাসনপীঠ। অথচ

আকবর বাংলাদেশে কোনো সৌধকীর্তি রচনা করেননি। ফার্গুসনই প্রথম তাঁর স্থাপত্য-ইতিহাস গ্রন্থে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন--

"The state was absorbed into Akbar's vast kingdom in A. D. 1576, under Daud Shah Bin Sulaiman. Though none of these rulers did anything that entitles them to a place in general history. They possessed one of the richest portion of India, and employed their wealth in adorning their capital with building. "[৩৬]

তথ্যটি বঙ্কিমকে আকৃষ্ট করেছিল। এরই প্রতিধ্বনি করে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৮৭) প্রবন্ধে তিনি লেখেন .

"যখন জুমা মসজিদ, সেকন্দরা ফতেপুরসিকরি বা বৈজয়ন্ততুল্য শাহজাহানাবাদের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মোগলের জন্য দুঃখ হয় তখন কি মনে হয়, বাঙ্গালার ধনও তাহারা লুঠ করিয়াছে ?

বাঙ্গালার অনেক কীর্তির চিহ্ন পাওয়া যায়, শত বৎসর মাত্রে ইংরেজ অনেক কীর্তি সংস্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্তি কেহ দেখিয়াছে ?" (ব. র ২য়, পৃ. ৩৩৩)

মন্দিরকে বলা হয় 'ভূ ভূষণ'। সমস্ত সৌধ শিল্পেই ধরণীর অলঙ্কার। মুঘল শাসনের যুগে বাংলাদেশ সেই অলঙ্করণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। বোধকরি সেজন্যে বঙ্কিমের ক্ষোভ ছিল।

আদি বাংলা বা গৌড় প্রাক্-মুসলিম পর্বে অর্থাৎ পাল সেন রাজদের আমলে হিন্দুর প্রসিদ্ধ রাজধানী শহর ছিল। সেই শহর ছিল সৌধশিল্পে ভূষিত। ফাগুসনের নিশ্চিত ধারণা-- "The Sena and Pala dynasties of Bengal seem to have resided here, and no doubt adorned it with temples and edifices worthy of their fame and wealth."[৩৭] তাঁরা ব্যবহার করেছেন ইঁট এবং কালো পাথর। ফার্গুসনের মতে বাংলার প্রাচীন সৌধের কোনো চিহ্ন সহজে পাবার উপায় নেই। কারণ সেগুলি বাংলার জলবায়ুতে সহজে নষ্ট হয়ে গেছে এবং অশ্বত্থ বটের সহজ বিস্তারে ভেঙে চুরে, জঙ্গলাবৃত হয়ে মাটির ঢিবির তলায় হারিয়েও গেছে। তা সত্ত্বেও গৌড়ে নানা ধ্বংসস্তূপ ও ভগ্নাবশেষের মধ্যে হিন্দুশিল্পের প্রাচীন নিদর্শন ফার্গুসনের চোখে পড়েছে। তাঁর অনুমান, ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত গৌড় নগরীর ইঁট পাথর খুলে নিয়ে জলপথে বয়ে এনে মুর্শিদাবাদ মালদা রঙ্গপুর রাজমহল এমন কি হুগলী

কলকাতার নগরী গড়ে ওঠে। "It thus happens that Murshidabad, Malda, Rangpur, and Rajmahal have been built almost entirely with its materials, whilst Hugly, and even Calcutta are rich in spoils of the old capital of Bengal."[৩৮]

গৌড় সম্পর্কে, গৌড়ে পাল সেন রাজাদের সৌধ সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে ফার্গুসনের তথ্য বঙ্কিমের মনে যেমন আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়েছে, তেমনি জাগিয়েছে বাংলার পুরাকীর্তি সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধিৎসা।

প্রসঙ্গতর বলা উচিত 'পাঠানের অনেক কীর্তির চিহ্নের' কোনো নমুনা বা উদাহরণ বঙ্কিম তাঁর রচনায় দেননি। ফার্গুসন দিয়েছেন।[৩৯] যেমন গৌড়ের সোনা মসজিদ, বারোদরওয়াজা, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, একলাখী মসজিদ প্রভৃতি। বাংলায় 'পাঠানের কীর্তি' হিসেবে এই সব ইসলামী স্থাপত্যের কথাই নিশ্চয় বঙ্কিমের স্মরণে ছিল।

'পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল'[৪০] হয়েছিল বলে বঙ্কিম মনে করতেন। সে জন্যে মুঘল আমলের চেয়ে পাঠান আমল বরং তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে হোসেন শাহের আমলে বাংলার বাহ্য সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়। 'স্থাপত্য বিদ্যার আশ্চর্যরূপ উন্নতি হয়', 'গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে যে সকল সম্পূর্ণ ও ভগ্ন অট্টালিকা লক্ষিত হয় তদ্দারাও তৎকালিক বাঙ্গালার ঐশ্বর্য শিল্প নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।' এই সব মন্তব্য বঙ্কিমের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রবন্ধে স্বীকৃত ও সমর্থিত।

এই প্রসঙ্গেই দেখা যায়, বঙ্কিম ফার্গুসনের সম্পূর্ণ অনুসরণে প্রবন্ধের পাদটীকায় জানান—

'গৌড়ের ইষ্টক লইয়া মালদহ, ইংরেজ বাজার, ভোলাহাট, রাইপুর, গিলাবাড়ি, কাসিমপুর প্রভৃতি অনেকগুলি নগর নির্মিত হইয়াছে।... গৌড়ের ইষ্টক মুর্শিদাবাদের ও রাজমহলের নির্মাণেও লাগিয়াছে। গৌড়ের ভগ্নাবশেষের বিস্তার দেখিয়া বোধহয় যে, কলিকাতা অপেক্ষা গৌড় অনেক বড় ছিল।' (ব. র. ২য়, পৃ ৩৩২)

বঙ্কিমের সমকালের এইসব পুরাতাত্ত্বিক কার্যকলাপ, পুরাবৃত্ত, নানা গবেষণামূলক নিবন্ধ বঙ্কিমের ইতিহাস-তৃষ্ণ মনের বুভুক্ষা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রাচীন বাংলার পূর্ণাঙ্গ ও অনুপুঙ্খ ইতিহাসের জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছিল। Antiquities of Orissa-র লেখক বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে

তাঁর ছিল গভীর প্রত্যাশা। কিন্তু সে আশা তাঁর পূর্ণ হয়নি। রাজেন্দ্রলাল কেবল পাল সেন রাজাদের কুলপঞ্জী, সাল, তারিখ নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাই বঙ্কিম শরণাপন্ন হন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের। বড়ো আশায় লেখেন—

"বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে, স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন আমরা এ মত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে তদ্দ্বারা আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে।" (ব. র. ২য়, পৃ. ৩৩১)

কিন্তু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও 'বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস' লেখেননি। তাঁর 'প্রথম শিক্ষা—বাঙ্গালার ইতিহাস' (১২৮১) আসলে 'বালক শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক।' তাই বঙ্কিমের খেদোক্তি 'তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না' (ব র. ২য়, পৃ ৩৩১)।

অবশেষে বঙ্কিম নিজেই সচেষ্ট হন অতীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' বা 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' রচনায়।

বঙ্কিমের জিজ্ঞাসা ছিল গভীর, বহুমুখী ও বিশদ। রাজ্যশাসন ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞাতব্য ছিল—প্রাক্ মুসলিম পর্বে বাঙলায় 'কি কি শিল্প কার্যে পারিপাট্য ছিল!"

(ব. র ২য়, পৃ. ৩৩৮)

এই অনুসন্ধিৎসা নিয়েই তিনি খুঁটিয়ে পড়েছিলেন চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণী, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধাবলী এবং ফার্গুসনের বিখ্যাত স্থাপত্য গ্রন্থ History of Indian and Eastern Architecture (Vol. I and II)। কিন্তু ফার্গুসনের স্থাপত্য গ্রন্থভুক্ত "Bengal" অধ্যায়টি বড়োই সংক্ষিপ্ত। নিশ্চয়ই মন ভরেনি বঙ্কিমের। পালযুগের চিত্র, মূর্তিকলা, পাহাড়পুর বা শালবন বিহারের মতো স্থাপত্য-কীর্তি তখনও যে অনাবিষ্কৃত। অধ্যাপক সরসী-কুমার সরস্বতী প্রণীত 'Architecture of Bengal (Vol—I)' গ্রন্থই হতে পারত বঙ্কিমের তৃষ্ণার বারিবাহক। ফার্গুসনের গ্রন্থের ঠিক একশো বছর পরে ১৯৭৬-এ সেটি আত্মপ্রকাশ করে।

'আনন্দমঠে' বঙ্কিম নিজেই অনুসন্ধান করে বের করেছেন প্রাক্-মুসলিম পর্বের বাংলার শিল্প-ইতিহাসের পদচিহ্ন। প্রত্নতাত্ত্বিকের উৎসাহে নিবিড় পত্রাচ্ছাদিত দুর্ভেদ্য অরণ্যের অন্তরালবর্তী ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে বৌদ্ধযুগের এক বিশেষ স্থাপত্যের উদ্ধার ও সংস্কার সাধন করে বঙ্কিম গড়ে তুলেছিলেন

তাঁর আনন্দমার্গী সন্তান দলের গোপন আস্তানা 'আনন্দমঠ'। প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে রয়েছে মঠের বর্ণনা—

'সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্ন শিলাখণ্ড সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বড় মঠ আছে। পুরাণ তত্ত্ববিদেরা দেখিলে বলিতে পারিতেন, ইহা পূর্ব কালে বৌদ্ধদিগের বিহার ছিল—তার পরে হিন্দুর মঠ হইয়াছে। অট্টালিকা শ্রেণী দ্বিতল মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির। সকলই প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত আর বহিঃস্থিত বন্য বৃক্ষ-শ্রেণী দ্বারা এরূপ আচ্ছন্ন যে দিনমানে অনতিদূরে হইতেও কেহ বুঝিতে পারে না যে এখানে কোঠা আছে। অট্টালিকা সকল অনেক স্থানেই ভগ্ন, কিন্তু দিনমানে দেখা যায় যে, সকল স্থান সম্প্রতি মেরামত হইয়াছে।' (ব. র. ১ম, পৃ. ৭২০)

বিহার হল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আশ্রম। ফার্গুসন লিখেছেন—

"A Vihara properly speaking is a residence or dwelling, whether for a monk or an image ; and a group of apartments for a community of monks is, strictly speaking a sangharama or monastery."[৪১]

এই স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল—একটি প্রশস্ত চত্বর বেড় দিয়ে ঘিরে থাকে দ্বিতল বা ত্রিতল কক্ষের সার—

'The court has galleries two or three storeys in height.'[৪২]

জেনারেল কানিংহাম নালন্দা বিহারে শ্রমণদের চারতলা গৃহও দেখেছেন।

স্থাপত্য সমীক্ষকদের মতে বিহার প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের অন্যতম বিশিষ্ট নিদর্শন।

'The Vihara or the monastery is another important form of ancient architecture.'[৪৩] সেকথা বঙ্কিমও জানতেন। তাই একটি উপযুক্ত উদাহরণ দেবার সুযোগ তিনি খুঁজছিলেন। মঠ ও বিহারের মৌল উদ্দেশ্য তো এক। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীসংঘের আশ্রয়। আর আনন্দমঠের সন্তানেরা তো দেশচৈতন্যে প্রবুদ্ধ। তাই বঙ্কিম কালজীর্ণ পরিত্যক্ত এক বৌদ্ধ বিহারকেই হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মঠে অনায়াসে পরিবর্তিত করেছেন।

পাল-সেন যুগ অর্থাৎ বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য যুগের কালচিহ্ন থেকে বাংলার ইতিহাসের নথিবদ্ধ-সূচনা। বোধ করি, তাই বঙ্কিম বৌদ্ধ আমলের একটি স্থাপত্য নিদর্শনের উল্লেখ জরুরী মনে করেছেন। লক্ষণীয়, ফার্গুসনও 'Buddhist architecture'[৪৪] অধ্যায় দিয়ে তাঁর ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস

শুরু করেন। তাঁর মতে অশোকের সময় থেকেই এদেশের প্রস্তর স্থাপত্যের প্রথম নিদর্শন মেলে। বঙ্কিমও তাঁর 'আনন্দমঠে' উল্লিখিত বৌদ্ধ স্থাপত্যে শিলাখণ্ডের ব্যবহার করেছেন। ঐতিহাসিকদের বিবরণে জানা যায়, হিউয়েন সাঙ্‌ ৭ম শতকের প্রথমার্ধে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় শ' খানেক বিহার দেখতে পান। কর্ণ সুবর্ণ (Kie-lo-nu-su-fa-la-nu) এবং রক্ত মৃত্তিকা বিহার (Lo-to-mo-chih) ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই বিহার দুটি মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি ও রাঙ্গামাটি সন্নিহিত রাজবাড়িডাঙায় সম্প্রতি আবিষ্কৃত।[৪৫]

বঙ্কিমের আনন্দমঠটি কিন্তু ছিল মুর্শিদাবাদ ও কলকাতা যাবার পথের ধারের এক বিশাল প্রান্তরের প্রান্তবর্তী নিবিড় শালবনের মধ্যে। এও যেন এক শালবন বিহার।

পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য যুগে বিশেষ দেবমূর্তি বা মন্দিরকে কেন্দ্র করে হিন্দু সন্ন্যাসীদের যে সংঘাশ্রম গড়ে ওঠে তাকেই বলা হয় মঠ। বৌদ্ধ বিহার ব্রাহ্মণ্য যুগে হিন্দুমঠে পরিবর্তিত হয়েছে তার দুটি প্রসিদ্ধ নজির এই বিশ শতকে আবিষ্কৃত। একটি হল বৌদ্ধধর্মী ধর্মপাল দেবের আমলের সোমাপুরা বিহারের (রাজশাহী) অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পাহাড়পুরের মন্দির, অপরটি ভবদেবের সমকালীন ময়নামতী টিলার (কুমিল্লা) শালবন বিহার।[৪৬]

বঙ্কিমের কাছে এই দুই বিহার সম্পর্কে পুঁথিগত কিছু সন্ধানসূত্র সম্ভবত ছিল। কারণ 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধে বঙ্কিম 'ডিমলার দক্ষিণে ধর্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ' ও তার ক্রোশেক দূরে ধর্মপালের ভ্রাতৃজায়া রানী মীনাবতীর গড়ের উল্লেখ করেছেন দেখা যায়।

সোমাপুরা ও শালবন বিহারের মধ্যভাগে অবস্থিত হিন্দু ভাস্কর্য সম্বলিত মন্দির প্রমাণ করেছে, পরবর্তীকালে এই দুই বৌদ্ধ সংঘারাম হিন্দুমঠে রূপান্তরিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে সরসীকুমার সরস্বতীর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—

"Quite a good number of monastic cells, originally intended for residential purposes, has in the upper most levels, i.e. in the later phases of the existence of the monastery, ornate pedestals in which there occassionally remain Brahmanical images in situ, there by proving that in the later periods the followers of the Brahmanical faith had already begun to congregate in the Buddhist establishment."[৪৭]

'আনন্দমঠে' হিন্দুমঠে পরিবর্তিত বৌদ্ধ বিহারের একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আসলে বঙ্কিম পাল-সেন তথা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য যুগের স্থাপত্য নিদর্শন কৌশলে একযোগে তুলে ধরেছেন।

সত্যানন্দ বিষ্ণু ও মাতৃকামন্দির ঘিরেই তাঁর সম্প্রদায়ের মঠটি গড়ে তোলেন। মঠ স্থাপত্য ছাড়াও 'আনন্দমঠে' আছে সম্পূর্ণ, সুউচ্চ অট্টালিকা শ্রেণীর ও ভগ্নজীর্ণ অট্টালিকার প্রসঙ্গ যা সেই অঞ্চলের নগর সমৃদ্ধির কথাই প্রমাণ করে। সঙ্ঘাশ্রম ত্যাগ করে ভবানন্দ মাঝে মাঝে নির্জনে আত্মচিন্তা করার জন্যে গভীর বনের একটি প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে আত্মগোপন করতেন (তৃতীয় খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—আনন্দমঠ)। সেখানে 'ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির উপর লতা-গুল্ম কণ্টকাদি অতিশয় নিবিড়ভাবে জন্মিয়াছে।'

প্রাচীন বাংলায় কালগ্রাসে পতিত সৌধশিল্পের নিদর্শন যেটুকু টিঁকে আছে সেটুকুও কেন খুঁজে পাওয়া যায় না—সে সম্পর্কে ফার্গুসনের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে—'The luxuriant growth of jungle hides the building so completely, that it is sometimes difficult to discover it always to explore it.'[৪৮]

সত্যানন্দের সর্বজ্ঞ চক্ষু এড়াবার আশায় ইন্দ্রিয় পীড়িত-অনুতপ্ত, আত্ম-বিশ্লেষণপর ভবানন্দ এই রকম দুর্ভেদ্য দুর্গম স্থান নির্বাচন করেছিলেন।

গভীর জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা ভাঙাচোরা প্রাচীন অট্টালিকার প্রতি বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকেই দুর্বলতা। (দ্রঃ ব র. ১ম. পৃ. ১৩১)।

বলাবাহুল্য রহস্যমদির আবহ ঘনিয়ে উৎকণ্ঠা সঞ্চারের পক্ষে পোড়ো বাড়ি বেশ আদর্শ পটভূমি। 'দেবী চৌধুরানী'র নায়িকা প্রফুল্ল 'ভারি জঙ্গলের' মধ্যে ডাকাত কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। সেইখানেই ইতস্ততঃ ছড়ানো প্রাচীন ইঁট অনুসরণ করে তিনি এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে গিয়ে পড়েন ও তারপর তাঁর সাধারণ নারী জন্মের মোড় ঘোরাবার সুযোগ পান।

এই বাড়িটি ছিল উত্তরবঙ্গের নীলধ্বজ বংশীয় রাজা নীলাম্বর দেবের ভিটে। পাঠানের ভয়ে পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধনরাশি নীলাম্বর দেব এই ভবনের মাটির তলায় পুঁতে রাখেন। মুমূর্ষু কৃষ্ণগোবিন্দের নির্দেশে প্রফুল্ল মাটি খুঁড়ে সেই গুপ্তধন ও লুপ্তরত্ন উদ্ধার করেন। প্রফুল্ল তারই মধ্যে পেয়েছিলেন প্রচুর পরিমাণে সেকেলে মোহর।

মনে রাখতে হবে সে সময় পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণায় প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত হচ্ছিল। ১৮৩০-এ জেনারেল ভেনটুর ও এম.

কোর্ট মানিক্যাল স্তূপ খনন করে প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কার করেন।* প্রিন্সেপ এবং কানিংহাম মুদ্রাসংক্রান্ত গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশে প্রাপ্ত মুদ্রা নিয়ে আলোচনা করেন ই. টমাস, ব্লখম্যান এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র।**

'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধে বঙ্কিম রাজা নীলধ্বজ ও নীলাম্বর-দেবের প্রসঙ্গ এবং কোচবিহারে অবস্থিত নীলধ্বজ নির্মিত দুর্গনগরী কামতা-পুরের উল্লেখ করেছিলেন।

'সীতারাম' উপন্যাসে বঙ্কিম উড়িষ্যার প্রাচীন স্থাপত্যের শিল্প সুষমায় বিমুগ্ধ। পূর্বভারতীয় স্থাপত্যের যে বিশেষরূপে ফার্গুসন আকৃষ্ট, রাজেন্দ্র-লাল আগ্রহী বঙ্কিমও এড়াতে পারেননি তার দুরন্ত হাতছানি।

সুদূর বাংলার ভূষণা পরগণা থেকে যাত্রা শুরু করে সীতারাম-পত্নী শ্রী চলেছিলেন উড়িষ্যার শ্রীক্ষেত্রে। পুরুষোত্তম দর্শন করে জীবন-দুঃখের জ্বালা জুড়ানোর বাসনা তাঁর। কিন্তু পান্ডার 'কৃপাদৃষ্টি'-র দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচানোর অছিলায় বঙ্কিম শ্রী-র যাত্রা ভঙ্গ করে তাঁকে নিয়ে এলেন বৈতরণী নদী তীরের ও উদয়গিরি-ললিতগিরির ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের অন্য এক শ্রী-ক্ষেত্রে। দারুভূত জগন্নাথ দর্শনের চেয়ে নদী পর্বত প্রান্তরের নয়নমন বিমোহন প্রাকৃতিক শোভা ও সেই প্রকৃতির মধ্যে বিকীর্ণ 'প্রাচীন মহাত্মাদের মহিয়সী কীর্তি' দর্শন বঙ্কিমের কাছে পুণ্যতীর্থ দর্শনের মতোই ফলপ্রদ। তাই শ্রী বৈতরণী নদীর তীরবর্তী 'কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত সোপনাবলী'-র উপর সপ্তমাতৃকার মন্ডপশোভা, সপ্তমাতৃকার বিচিত্ররূপে রসে গড়া মূর্তিরাজি, বিষ্ণুমন্ডপের উচ্চচূড়া এবং নীল প্রস্তরের গগনচুম্বী গরুড়স্তম্ভ এ সমস্তই দু-চোখ ভরে দেখেছেন। (দ্রঃ ব. র ১ম, পৃ. ৮৮৯-৯০)

শ্রীকে নিয়ে এই তীর্থ পরিভ্রমণকালে বঙ্কিম নিজেই সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত। তাই কাহিনীপটের আড়াল থেকে সহসা বেরিয়ে এসে, ললিতগিরির অধিত্যকায় দাঁড়িয়ে তিনি গরুড়াবলোকনে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবিশেষ দেখেছেন। শ্রী-র ভাগ্য গণনার ছলে জয়ন্তীর হাত ধরে প্রবেশ করেছেন উড়িষ্যার বিখ্যাত হস্তিগুম্ফায়। প্রাচীনতম এই শিল্পিত গুহার বর্ণনায় হয়েছেন মুখর—

> "সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপাতীরে গিরির শরীর মধ্যে হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়।
>
> গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ সকল ভাঙিয়া গিয়াছে—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্বস্ব লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্বতাঙ্গ হইতে খোদিত স্তম্ভ প্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারিদিকে অপূর্ব প্রস্তরে খোদিত নরমূর্তিসকল শোভা করিত। তাহারই দুই চারিটি আজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রঙ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙিয়াছে, কাহারও পা ভাঙিয়াছে।" (ব. র ১ম, পৃ ৮৯৩)

স্থাপত্য সমীক্ষকের মতোই বঙ্কিম বর্ণনা-নিপুণ। ফার্গুসনের History of Indian and Eastern Architecture (Vol. II. Chapter II) গ্রন্থে বিধৃত হস্তিগুম্ফা বর্ণনা এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। উড়িষ্যার গুহাস্থাপত্য প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছেন—'The Picturesqueness of their forms, the character of the sculptures and architectural details, combined with their great antiquity render them one of the most important group of caves in India.'[৪৯]

ফার্গুসনের মতে—'Hathigumpha cave probably the oldest here, looks as if it might have been a great natural cavern.'[৫০]

গুহাটির ভগ্নদশায় এই বিদেশী পর্যবেক্ষকও দুঃখিত—

'It is unfortunately in a very dilapidated condition.··There are indication, however, that it had at last been improved by art ; but the rock is of loose and friable texture, and the present state of the cave is largely due to decay ; besides, so important record would hardly be placed over an excavation of no consideration.'[৫১]

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার খণ্ডগিরি বঙ্কিমের 'সীতারামে' 'ললিতগিরি' হিসেবে উল্লেখ পেয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বে ভরা, নষ্টপ্রায়, এই অতি প্রাচীন গুহাস্থাপত্যের সন্ধান বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালী সমাজে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। ফার্গুসনের গ্রন্থ উৎসুক ও গবেষক পাঠক ছাড়া সর্বজনের পরিচিত ছিল না।

ফার্গুসন তাঁর স্থাপত্য গ্রন্থটির ভূমিকায় লিখেছিলেন—'an attempt should be made to interest the Public in Indian architectural art.'[৫২]

বঙ্কিমের আকাঙ্ক্ষা তাঁর দেশবাসী নিজস্ব শিল্পবিষয়ে অবহিত ও আকৃষ্ট হোক। কান্তা-সম্মিত উপায় তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ কথা কাব্যের মধ্যে দিয়ে ললিত, মনোহর ভঙ্গিতে জনমানসে সেই সচেতনা, সেই শিল্পবোধের

উন্মেষ ঘটাতে চাইছিলেন। স্থাপত্য তাঁর কাছে শুধুমাত্র দৃষ্টিনন্দন শিল্প নয়। চিত্র-ভাস্কর্যের মতো এই শিল্পও যে দেশ ও জাতির প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দলিল শিল্পেতিহাসের গবেষকের মতো এ তত্ত্বেও তাঁর বিশ্বাস ছিল। তিনি জানতেন —চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের গতি, প্রকৃতির মাধ্যমে নিরূপিত হয় নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ। নির্ণয় করা যায় কোনো সভ্যতার সুপ্রাচীনত্ব। যথা—

'মিসর তত্ত্বজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে মেম্ফিজ প্রভৃতি নগরী থিব্স্ হইতে প্রাচীনা। এই সকল নগরীতে যে দেবালয়াদি অদ্যাপি বর্তমান আছে, তাহাতে যুদ্ধজয়াদি উৎসবের প্রতিকৃতি আছে। সর্ জর্জ কর্ণওয়ালুইস বলেন, ঐতিহাসিক সময়ে মিসর দেশীয়দিগকে কখন যুদ্ধপরায়ণ দেখা যায় না। অথচ কোনো কালে তাহারা যুদ্ধ পরায়ণ না থাকিলে তন্নির্মিত মন্দিরাদিতে যুদ্ধ জয়োৎসবের প্রতিকৃতি থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐতিহাসিক কালের পূর্বেই মিসরদেশীয়েরা এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, প্রকান্ড মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়া জাতীয় কীর্তি সকল তাহাতে চিত্রিত করিত।" (কতকাল মনুষ্য—ব র. ২য়, পৃ. ১৪৮)

বঙ্কিম উপলব্ধি করেছিলেন—শিল্পের মাধ্যমেই অনুধাবন করা যায় এক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অন্য কোনো সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব। যেমন— "আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও য়ুনানী ও রোমক মূল বিশিষ্ট।" (অনুকরণ—ব র. ২য়, পৃ. ২০২)

খুঁজে পাওয়া যায় কোনো বিশেষ রাজ ক্ষমতার প্রতাপ ও প্রতিপত্তির পরিসর ও তার গৌরব মহিমা। যথা—

"ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল এই বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পুরীর মন্দির ও কোণার্কের আশ্চর্য প্রাসাদাবলী তাহাদিগেরই গঠিত।" (বাঙ্গালার কলঙ্ক ব. র. ২য়., পৃ. ৩৩৫)

বঙ্কিমের কাছে স্থাপত্যও 'পাথুরে প্রমাণ'—"তাম্রফলক বা প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিবে না"। (বাঙ্গালার কলঙ্ক—ব. র ২য়, পৃ. ৩৩৫)

ইতিহাসহারা ও আত্মবিস্মৃত দেশবাসীকে এই 'পাথুরে প্রমাণে'র সাহায্যেই বঙ্কিম জাগ্রত ও সচেতন করতে চেয়েছিলেন। সারস্বত সাধনার শেষ পর্যায়ে তাই তাঁর স্থাপত্য অনুসন্ধান ক্রমশঃই লাভ করে প্রত্নতাত্ত্বিকমাত্রা।

পরিশেষে বঙ্কিম সাহিত্যের নিবিষ্ঠ পাঠক অবশ্যই অনুভব করবেন, ঊনবিংশ

শতকের শিল্প সন্ধানী পথিক বঙ্কিম শিল্প পুনরুজ্জীবনের বীজ চয়ন করেছিলেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, তাঁর শিল্প সাধনার গোড়া থেকেই। তিনি তাঁর রচনায় নানা উদাহরণমালার প্রয়োগে দেখিয়েছেন, প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে শিল্প চর্চা ছিল জীবন চর্যা। রাজ দুহিতাই হোক আর দরিদ্র রমণীই হোক শিল্প ছিল রমনীরও শিক্ষণীয় আচরণীয় বিষয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতি ও রুচির অভিঘাতে এবং বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর প্ররোচনায় বাঙালি তার পরম্পরাগত শিল্প শিক্ষা এবং ঐতিহ্যমুখী জ্ঞান হারিয়েছিল। তাই, বঙ্কিম অতীতের চিত্র ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের বৈভবের কথা তাঁর সাহিত্যে নানাভাবেই স্মরণ করাতে চেয়েছেন। সাহিত্যবন্ধ দৃষ্টান্তেই তিনি বুঝিয়েছেন, ভারতীয়-মিনিয়েচর চিত্রমালার উজ্জ্বল বৈভবের মধ্যে রূপ শিল্পের যে কল্পলোক লুকিয়ে আছে কাব্যলোকের সোপান বেয়ে সেই নন্দনলোকে পেঁছে যাওয়া যায়, সেখান থেকেই আহরণ করা যায় নবসৃষ্টির আত্মক্ষমতা। রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঝড় ঝাপটায় বাংলার একান্ত নিজস্ব গ্রামীণ লোকশিল্পের সহজ ধারাটি যে গৃহকোণের শান্ত দীপশিখার মতো প্রসন্নমধুর আভা ছড়িয়েছে, এ সত্যও বঙ্কিমের নজর এড়ায়নি।

অবশেষে তিনিই আবিষ্কার করেছেন ভাস্কর্য শিল্প উজ্জীবনের সম্ভাবনা-টুকু। স্বদেশী স্থাপত্য শিল্পের অতীত ঐশ্বর্যের জন্যে অহংকারও জাগিয়ে তুলেছেন তিনি। ঊনবিংশ শতকের শিল্প ঊষরতার দিনে 'একা' তিনিই যেমন শুনিয়েছিলেন অতীত শিল্প গৌরবগাথার সুমধুর সুরমূর্ছনাটি, তেমনি বিংশ শতকের নবশিল্প পথিকদের জন্যেও বেঁধেছিলেন আশাবরীর মীড়।

'যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায় সে এখনও সুখী। তাহার সুখ এখনও লুপ্ত হয় নাই।'

(কমলাকান্তের দপ্তর, ব র ২য়. পৃ. ৮৫)

২

বঙ্কিমের গানের জগৎ

'কে গায় ঐ ?'

"বহুকাল বিস্মৃত সুখ স্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন ? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গাইতে গাইতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর, মধুর কণ্ঠে এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলি স্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন ? কেন ? কে বলিবে ?"

(একা—কমলাকান্তের দপ্তর)

বলবেন বঙ্কিম নিজেই।

সুর কেন যে মায়াজাল ছড়িয়ে দেয়, কেমন করে—গীত যদি তেমন সুন্দর না-ও হয় তবুও শুধু মধুর সুর কেন প্রাণের গোপন বীণার তারে সাড়া জাগায়—সবই বুঝিয়ে বলবেন বঙ্কিম পরে ধীরে ধীরে। শুধু এই মুহূর্তে, কমলাকান্তের কোনো জবান বন্দী ছাড়াই, যে সংবাদ নিমেষে জানা হয়ে যায়, তা হল, বঙ্কিম সুরসংবেদী এবং গীতবোদ্ধা। গীতোৎকর্ণ তিনি। গীতের উৎস সম্পর্কে উৎসুক, সুরের অনির্বচনীয় রহস্য সন্ধানে ব্যাকুল। আর, তাঁর সাম্প্রতিক সময় কাল থেকে ভেসে আসা গানই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় হারা-অতীতের কোন্ সুখস্বপ্নের স্মৃতি লোকে।

আমরা বুঝি, রমণীয়রূপে বিভোর হন যে বঙ্কিম মধুর সুরে বিহ্বল হওয়া তাঁরই স্বভাব।

অথচ জীর্ণ চীর খণ্ডে জড়ানো মসীলাঞ্ছিত 'কমলাকান্তের দপ্তর'খানি অবহেলায় খুলে মেলে ধরলে প্রথমেই যে এমন বিস্ময়ের উন্মোচন হবে পাঠকমন তার জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। কারণ, ভীষ্মদেব খোসনবীসের কমলাকান্ত পরিচিতিতে তো সেকালীন 'বসন্তক' পত্রিকা সুলভ এক দক্ষ কার্টুনিস্টের সরস খ্যাপাটে মূর্তিই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যে পে-বিলের শীটে হিসেব না কষে "একটি চিত্র আঁকিল—যে কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে। সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল—

'যথার্থ পে বিল'।"

এই ব্যঙ্গ চিত্রীর ফেলে যাওয়া ছেঁড়াপাঁথির প্রথম রচনা 'একা'। এবং শিরোনামের নীচেই জিজ্ঞাসা 'কে গায় ঐ'। কৌতূহলে প্রবেশচারী নিবিষ্ট পাঠক আবিষ্কার করেন, গায়ক কমলাকান্ত নিজেই। রহস্যপ্রিয় কমলাকান্তের গহন গোপনে রয়েছেন যে এক মগ্ন বঙ্কিম এ তাঁরই নির্জন সংলাপ। এই কমলাকান্ত আসলে গীতিকবি বঙ্কিমেরই ছদ্মবেশ।

'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম বর্ষের (১২৭৯) প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ) 'সঙ্গীত' প্রবন্ধে বঙ্কিম জানিয়েছিলেন—

"কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কেননা, সামান্য কণ্ঠ ভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষ সঙ্গীত।"

জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে গেয়ে চলা পথিকের আনন্দতান বঙ্কিমের সূক্ষ্মতন্ত্রী হৃদয়ে সাড়া জাগিয়ে এক গভীর ভাবে আলোড়িত করেছিল। সেই ভাবেরই তীব্রতায় তাঁর কণ্ঠভঙ্গীও তখন পেয়ে যায় চরমোৎকর্ষ। আর তাই তাঁর একার সংলাপ হয়ে ওঠে গান।

একালের গান-ভাবুক রবীন্দ্রনাথ গানের জন্মপ্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

'কবি বল, চিত্রী বল, আপন রচনার মধ্যে সে কী চায়? সে বিশেষকে চায়। আমাদের মনের মধ্যে নানা হৃদয়াবেগ ঘুরে বেড়ায়। ছন্দে সুরে কথায় যখন সে বিশেষ হয়ে ওঠে তখন সে হয় কাব্য সে হয় গান।'

(রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশত সং ১৪, পৃ. ৯৯৩)

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সঙ্গীত' এবং 'গীতিকাব্য' (১৮৭৬) প্রবন্ধে গানের এই সুর ও ভাবমূল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছিলেন--

'কণ্ঠভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন'। 'গীতের উদ্দেশ্য বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র।'

এই গীতসূত্র অনুসরণ করে, পাঠক অনুভব করেন, হৃদয়াবেগের তীব্রতায়, ভাবের উচ্ছ্বাসে কণ্ঠভঙ্গীর চরমোৎকর্ষে কমলাকান্তের স্বগত ভাষণ 'একা' অর্জন করেছে এক বিশের সাঙ্গীতিক গড়ন।

চারটি স্তবকে গাঁথা সুশৃঙ্খল স্তরে বিন্যস্ত গম্ভীর ভাবনায় ঋদ্ধ এই রচনা যেন ধ্রুপদ ঠাটের গান।

আমরা লক্ষ্য করি, সুপ্ত চরাচরের একান্তে আত্মমগ্ন কমলাকান্তের মনোভাবনা প্রথমে গম্ভীর আলাপের বিষণ্ন বিলম্বিতে অর্ধস্ফুট। পরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট রেখায় উন্মোচিত। ক্রমে দ্রুত লয়ে ঝলসে উঠে একটি নিশ্চিত উপলব্ধির

ভূমিতে অবসিত।

ধ্রুপদের* উন্মোচন রীতি অনুযায়ী এখানেও লক্ষ্য করা যায়, প্রথমে দিশাহারা অনুভূতির অস্পষ্টতা।

'ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?'

ধীরে ধীরে বোধের উন্মেষ ও চৈতন্যের দীপন। "আমি একা তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল।" "কেহ একা থাকিও না। পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।"

পরের দীর্ঘ স্তবকে এই উপলব্ধিরই প্রসার। আর এরপরেই সংক্ষিপ্ত কাটাকাটা বাক্যে সত্তা আলোড়িত করা, জীবনবিশ্লেষণমুখী পর্যালোচনার স্পন্দিত স্বরাঘাত—

"সে প্রফুল্লতা সে সুখ আর নাই কেন বয়সে স্ফূর্তি কমে কেন আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন?" ক্রমে বাক্য দ্রুতের তীক্ষ্ণতায় আরও সংহত। উপলব্ধিতে সুদৃঢ়।

"এখন জানিয়াছি—এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই—এখন জানিয়াছি যে কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে। মনুষ্যে কেবল আত্মাদর আছে। ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ।"

এখানে 'নাই' ও 'আছে'-র ওঠা পড়ায় তৈরি হয়েছে উচ্চাবচ কণ্ঠহিল্লোল। গীতকারের উপলব্ধিজাত স্পষ্ট প্রত্যয়ে এই মুখর স্পন্দন। তবে সবশেষে দেখা যায়, একটি স্থির জীবনাশ্বাসের মূর্ছনায় শান্ত ও মন্থর তাঁর কণ্ঠভার। সব দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে অবশেষে কমলাকান্ত পেঁছেছেন অস্তিবাদী উপলব্ধির শমে। শেষ স্তবকে শুনিয়েছেন আশার সুর—

'সেই গীতিধ্বনি! প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এখনকার সংসার সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না।'

কমলাকান্তের বিষণ্ণ ও একা-মন অতঃপর আত্মসীমা ছাড়িয়ে প্রেমে পরিব্যাপ্ত অসীম সংসারের প্রান্তবর্তী হয়েছে এবং সব বেদনা-নিরাশা আত্মগহনের কেন্দ্রে নামিয়ে নিয়ে এক আশাবাদী মহাসঙ্গীতের অনন্ত গম্ভীর স্বর শোনার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। 'বহু'-র সঙ্গে 'একা'-র প্রীতি মিলনের আশায় কমলাকান্তের সব দুঃখের অবসান।

বঙ্কিমের এই রচনা 'একা' যেন মনে হয় আশাবরী ঠাটে বাঁধা এক আশ্চর্য দরবারীকানাড়া। বিষণ্ণ গম্ভীর অথচ 'বৃহৎ' ও 'পররূপী' ঈশ্বর-বিশ্বাসে স্থির এক অপূর্ব ধ্রুবপদ গীতি।

'একা' বঙ্কিমের জীবন ভাবনার এবং সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গীত ভাবনারও অন্তঃপাতী আত্মা। বঙ্কিমের গানের জগতের চৈতন্য কেন্দ্রে প্রবেশেরও রহস্যমন্ত্র।

'একা'-ই আমাদের জানায়, মধুস্বরা গীত বঙ্কিমকে টানে। একাকীত্বের বিষণ্ণতা থেকে টেনে আনে যুক্তমনের আনন্দ মেলায়। এই আনন্দের জন্যেই তিনি গীতকাঙাল। তাই তিনি রূপ-রসে ভরা এই সংসারের বিচিত্র গানে কুতূহলী। কিন্তু এই গানই আবার তাকে গভীর ভাবনার জগতে নিয়ে যায়। তিনি খোঁজেন সেই গান যা তাৎক্ষণিক শ্রুতি সুখের জগত থেকে শ্রোতাকে বা গায়ককে নিয়ে যাবে স্থায়ী হৃদয় সুখের আনন্দ আশ্রয়ে। মানবের প্রতি স্থির প্রেমে ঈশ্বর পদে প্রার্থনা-গীতিই হয় তাঁর চির সুখের সেই গান। 'কে গায় ঐ' ?—গায়ক বঙ্কিম নিজেই। ধ্রুবপদ গায়ক তিনি।

'কমলাকান্তে'ই বঙ্কিম স্বীকার করেন, তাঁর হৃদয়গভীরে স্পর্শকাতর এক বহুতন্ত্রী বীণা টানটান্ সুরে বাঁধা। তাই তো রমণীয় রূপ অথবা সুন্দর ধ্বনি কিংবা সুখ স্পর্শ এই সব হরষিত অভিজ্ঞতা তাঁর মনে অনায়াসে অনুরণন তোলে এবং তিনি তা জানান বারে বারে।

আমরা দেখি জনহীন সমুদ্রের তীরে পথহারা সঙ্গীহারা নবকুমারের কর্ণে একটিমাত্র রমণীকণ্ঠ ধ্বনি আনন্দ সঙ্গীতের মতো বেজে উঠেছিল :

> 'নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। ধ্বনি যেন হর্ষকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল। যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল। বৃক্ষপত্র মর্মরিত হইতে লাগিল। সাগর বসনা পৃথিবী সুন্দরী, রমণী সুন্দর ধ্বনিও সুন্দর ; হৃদয়-তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল !' (ব র. ১ম পৃ. ১৪৪

স্মরণযোগ্য অন্ধ বালিকা রজনীর অভিজ্ঞতা। প্রিয়স্পর্শে তারও অন্তরবীণায় সাড়া জাগে। সেই শিহরিত ভালো লাগার স্বরূপ জানায় সে গীতিময় ভাষায়—

> 'কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল। পুষ্পগন্ধময় বীণা-ধ্বনিবৎ স্পর্শ। বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে সে বুঝিবে কি প্রকারে ? যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্বনি কর্ণে শুনিতাম।' (ব. র. ১ম. পৃ. ৪৯৪)

অনুভূতির তীক্ষ্ণতাই যে সত্তার গভীরে হৃদয়বীণার জন্ম দেয়। কণ্ঠ পায়

গানের সংগতি। বঙ্কিমের সাহিত্য ভাষা তাই বারে বাবে সঙ্গীতেই বেজে ওঠে।

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে গীতের সংজ্ঞায় বিশদ হয়ে বঙ্কিম বলেছেন—

'গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে। কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। 'আঃ'—এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে পারে।... উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বর বৈচিত্র্যের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীত প্রিয় এবং তৎ সাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল। (ব. র. ২য়, পৃ. ১৮৭)

গীত বঙ্কিমেরও 'এক প্রকার স্বভাবজাত'।' স্বভাবতই তিনি সঙ্গীতপ্রিয়। বিশুদ্ধ সঙ্গীত তাঁকে টানে। 'মনেব বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত' তাঁর কথাসাহিত্যের গীত প্রসাধনে তিনিও বিশেষ যত্নশীল।

বঙ্কিমেব সমগ্র সাহিত্য চারণে আমরা লক্ষ্য করব—বঙ্কিম জানিয়েছেন, গীত ও গীতিকাব্যের মিলন ও বিরহ সংকেত কি, ছবি ও গান ললিত ধর্মে কি ভাবে মেলে। কেন কত বিচিত্র রূপে স্বভাবে ফোটে কত গান। কোন গান নিভৃতির অন্তর ভাষা, গণমোহন কোন গান, কোন গান অন্তরনিধি, বরণীয় কোন গান।

এসব কথা বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের মতো সঙ্গীত চিন্তামূলক অজস্র প্রবন্ধ নিবন্ধ বা পত্রাবলী কিংবা তর্কালাপের প্রভূত পরিসরে ব্যক্ত করেননি। তাঁর উপন্যাসের ঘাট পেরিয়ে পেরিয়ে এ তথ্য বঙ্কিম নিজস্ব সাহিত্যিক দৃষ্টান্তে নথিবদ্ধ করেছেন। আমরা দেখি, তিনি নিজেরই সৃষ্ট সাহিত্য ভুবনের আবেষ্টনে আশ্চর্য কৌশলে ধরে রেখেছেন বাংলার সমগ্র গানের ভুবন। সেই সঙ্গে স্পষ্ট ভাবেই মেলে ধবেছেন তাঁর নিজের স্বতন্ত্র গীতমানস। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর নিজেরই গড়া গানের জগতের পরকলা দিয়ে বঙ্কিম স্বচ্ছ দৃশ্য করে তুলেছেন শুধু গান সম্পর্কে নয় এ জীবন সম্পর্কেও তাঁর মগ্ন ভাবনার অন্য এক অজানা জগৎ।

'গীতেষু যত্নঃ প্রথমং তু কার্যম্'। নাট্যশাস্ত্রের এই উপদেশ। গানের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী হওয়াই নাটকের প্রথম কাজ। কিন্তু বঙ্কিম তো নাটক লেখেননি। মঞ্চসাফল্য, জন বিনোদন এমন কোনো দায়ই তাঁর ছিল না। তবে, তাঁর উপন্যাসের সফল মঞ্চ প্রয়োগ হয়েছে অনেকবার। তাঁর উপন্যাস যে বিশেষভাবে নাট্যপ্রতিম, একথা সর্বজনবিদিত। বঙ্কিমের সামনে বাংলা

কথাসাহিত্যের কোনো আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। শেক্সপীয়র কালিদাস প্রমুখ প্রতীচ্য ও প্রাচ্য নাট্য কবিদের ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাই তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নেপথ্য বিধান সম্পাদন করেছে। তাঁর উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংহত বুনন, ঘটনার দ্রুতগতি, পরিস্থিতির চমক উৎকণ্ঠা সঞ্চারী আবহ, সুতীব্র আবেগে গড়া নিয়তি অভিমুখী চরিত্রাবলী এমন কি মাঝে মাঝে তীক্ষ্ন সংলাপ ব্যবহার এ সবই নাট্যবৈশিষ্ট্যের লক্ষণ। তাঁর গানও অনেক সময় নাটকীয় মুহূর্তেই শুরু বা শেষ হয়, ছড়িয়ে দেয় নাট্যব্যঞ্জনা। নাট্যাদর্শের উপন্যাস বলেই কি গীতি যোজনা আবিশ্যক বঙ্কিমের কাছে ?

আসলে বঙ্কিম জানতেন, সুখ-দুঃখের আলোছায়া ঘেরা মনুষ্য জীবনের রঙ্গমঞ্চে গান কৃত্রিম বা আরোপিত প্রয়োগ নয়। তা আপনি ভেসে আসে। তাই যখন উপন্যাসে তিনি মানুষের জীবনকথা বিন্যাসে মগ্ন হলেন তখন গান অপরিহার্য প্রবেশ পেল অনায়াসেই। সে সব গানের সঙ্গতিতে ত্রুটি থাকেনি কখনো। মানুষের অবিচ্ছেদ্য স্বভাব প্রেরণায় গান যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনে জড়িয়ে থাকে ঠিক সেইভাবেই বঙ্কিম উপন্যাসের গান চরিত্র ও ঘটনার সংলগ্ন হয়ে স্বতোৎসারিত।

অবশ্য গান বিশেষের সামর্থ্য অনুধাবন করে তিনি তাকে ব্যবহার করেন সাহিত্য-কৌশল হিসেবে। তাঁর উপন্যাসে গান আপন মনে অথবা অনুরোধে গাওয়া। কখনো তা সংকেতের ভাষা- -বারতা, হৃদয় অথবা কুশল বিনিময়ের। কখনো তা শুধুই বিনোদ-বিষয় মনোরঞ্জনের শিল্প। কখনো বা ভাবোন্মোচনের একমাত্র উপায়। কিন্তু সর্বত্র, স্বাভাবিক প্রেক্ষিতে যুক্ত হয়েও সব গানই বঙ্কিমের নানা অভিপ্রায় সিদ্ধ করার, নানা বক্তব্য প্রকাশ করারই একটি বিশেষ ছল।

তাৎক্ষণিক গান বাঁধবার নেশা বঙ্কিমের তরুণ বয়স থেকেই। অনুজ পূর্ণচন্দ্রের স্মৃতি জানায়, একদা নদীপথে ভ্রমণকালে সদ্য বিধবা রমণীর কান্নায় অভিভূত হয়ে তৎক্ষণাৎ গান বেঁধে মল্লার সুরে বসিয়ে পূর্ণচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন। সে গানের প্রথম কলিটুকু কেবল পাওয়া যায়—

'হারালে পর পায় ফিরে মণি—
কি ফণিনী কি রমণী।'[৮]

যাত্রা-কবিওয়ালাসুলভ যমক অনুপ্রাসের বাহার ছিল তাতে বেশ বোঝা যায়।

শুধু গানের জন্যই গান লেখার পূর্ণ দৃষ্টান্ত, 'বন্দেমাতরম্'। স্বতন্ত্রভাবে লেখা এই পূর্ণাঙ্গ গানটি পরে 'আনন্দমঠে' সন্নিবিষ্ট হয়ে অনন্য মহিমা লাভ করে। এ গানেরও রাগনির্দেশ মল্লার। 'মল্লার' বঙ্কিমের প্রিয় রাগ।

বঙ্কিমের সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতার উৎস, তাঁর কালের গানের জগৎ ও তাঁর গীতোপভোগী সত্তাকে জানতে হলে নিবিষ্ট মনোযোগে করতে হয় তাঁরই সাহিত্যচারণ। সাবধানে জুড়তে হয় নানা জনের স্মৃতির টুকরো। কোনো পূর্ণাঙ্গ অনুপুঙ্খেভরা জীবন দলিল তো বঙ্কিমের নেই, রাখতেও দেননি। এদেশী প্রাচীন কবিদের ঐতিহ্যে সৃষ্টির মধ্যেই শাশ্বত স্থিতি বাসনায় আত্মবিলোপ চেয়েছিলেন কিনা তাও জানার উপায় নেই। তবে সচেতন অভিনিবেশে অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর জীবন স্বভাব আর মননের সূচীমুখ আলোক সূত্র, যা তাঁর নিজেরই সৃষ্টির আবরণ ভেদ করে বিচ্ছুরিত।

কীর্তন, বাউল, কবিগান, যাত্রা, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা এই দেশী ও উচ্চাঙ্গ গানে আলোড়িত বাংলায় উনিশ শতকের গীতোদ্বেল মধ্যপর্বে সুরসংবেদী বঙ্কিমের পূর্ণ সৃষ্টিসামর্থ্যে অভ্যুদয়। স্বভাব ঔৎসুক্যেই পরিপার্শ্বের গীত আন্দোলনে অবহিত ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে নিজস্ব সাঙ্গীতিক বোধে ও অভিরুচিতে স্থির। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'-তেই (১৮৬৫) পাওয়া গেল প্রথম প্রমাণ। শুরু হল বঙ্কিম সাহিত্যে গীতালাপের কৌশলী ভূমিকা।

'একটি বাঙ্‌লা গাও'।

—দুর্গেশনন্দিনী।

'দুর্গেশনন্দিনীর'-র প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে গীতপ্রিয়, গীতসমঝদার ও গীতভাবুক বঙ্কিমের আকর্ষণীয় আত্মপ্রকাশ। বিমলা গভীর রাত্রে গড়মান্দারণ ত্যাগ করে শৈলেশ্বর মন্দিরে চলেছেন। জগৎ সিংহের সঙ্গে গোপন সাক্ষাৎ তাঁর উদ্দেশ্য। মূর্খ ভাঁড় গজপতি তাঁর যাত্রাসঙ্গী। এই ক্ষীণবুদ্ধির সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য এবং তাকে অন্যমনস্ক করে রাখার কারণে ভৌতিক গল্প ছাড়া আর যে উপায় বঙ্কিম অবলম্বন করলেন, তা হল গান। কারণ বঙ্কিম জানেন 'মনুষ্য সঙ্গীত প্রিয়'। সুর যার কণ্ঠায়ত্ত নয় সেও গান বিমুখ নয় কখনো। 'সঙ্গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত'। রূপসী বিমলার অযাচিত প্রণয় দাক্ষিণ্যে খুশি বিগলিত 'রসিকরতন' গজপতি গীতোন্মুখ সহজেই। বঙ্কিমের টিপ্পনী 'রসিক পুরুষ কে কোথায় সঙ্গীতে অপটু'। ওস্তাদি মুখড়া করে তাই শুরু হয় তার গান। বিমলার সামান্য অনুরোধেই গেয়ে ওঠে—

'এ হুম্‌—উ হুম্‌—
সই, কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যামে
কদম্বের ডালে।
সেই দিন পুড়িল কপাল মোর—
কালি দিলাম কুলে।
মাথায় চূড়া, হাতে বাঁশী
কথা কয় হাসি হাসি :
বলে, ও গোয়ালা মাসী—কলসী দিব ফেলে।'

(ব. র. ১ম. পৃ ৭৫)

সেকালে প্রচলিত কায়স্থ কমলাকান্তের (জন্ম ১২১৬) রূপাভিসারের পদ—[২]

'কি ক্ষণে শ্যামচাঁদের রূপ নয়নে লাগিল'

অথবা বেলডাঙার রূপচাঁদ অধিকারীর (জন্ম—১১২৯) ঢপ্‌ কীর্তন—[১]

'কি রূপ দেখিনু কদম্বমূলে
কলিন্দ নন্দিনীর কূলে'—

ইত্যাদি বাংলা গানের আদলে বাঁধা বঙ্কিমের গীতিপদ দিব্যি মানানসই হল সাধারণ মানুষ দিগগজের মুখে। তার কণ্ঠ নির্গত 'অলৌকিক উৎকট শব্দে' শান্ত শয়ান গাভী পলায়ন করল বটে, কিন্তু এই গান গাওয়ার সূত্র ধরেই স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে গেয়ে উঠলেন গীতপারঙ্গমা বিমলা।

"দিগগজের আর গান হইল না ; হঠাৎ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল ; অমৃতময়, মানসোম্মাদকর, অপ্সরাহস্তস্থিত বীণাশব্দবৎ মধুর সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। বিমলা নিজে পূর্ণস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া ছিলেন। নিস্তব্ধ প্রান্তর মধ্যে নৈশ গগন ব্যাপিযা সেই সপ্তস্বর পরিপূর্ণ ধ্বনি উঠিতে লাগিল। শীতল নৈদাঘ পবনে ধ্বনি আরোহণ করিয়া চলিল।"

(ব. র. ১ম. পৃ ৭৫)

বঙ্কিম স্পষ্ট করেছেন গীতপ্রাণ বিমলার কণ্ঠগুণ, গায়নশৈলী এবং গীতপ্রতিভা। সেই সঙ্গে তাঁর গানের শ্রেণী।

কি গান গাইছিলেন বিমলা ? 'বাঙ্‌লা' গান নয়। দিগগজই জানাবে।

বিমলা গাইছিলেন শুদ্ধ কোনো রাগ নিবদ্ধ উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী গান। বঙ্কিম স্বেচ্ছায় এ গান পদরিক্ত রেখেছেন। রাগই এ সঙ্গীতের ভাববাহন। শ্রুতিই ভাষা। বাণী এ গানে তুচ্ছ। দরবারী সংস্কৃতিতে লালিত বিমলার পক্ষে

হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীত গাওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্কিম জানিয়েছেন, মানসিংহ মহিষী তাঁকে 'সহোদরা ভগিনীর ন্যায়··· সযত্নে' 'নৃত্যগীত শিল্প কার্যাদি নানা বিদ্যা শিখাইবার পদবীতে আরূঢ়' করেছিলেন। (ব. ব. ১ম. পৃ ১০৪)

কি রাগ গাইতে পারেন বিমলা? গভীর রাত্রে উন্মুক্ত বনপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে মনের খুশীতে মালকোষ গাওয়াই তো স্বাভাবিক। কারণ এই রাগ তৃতীয় প্রহরে গেয়। এর প্রকৃতি শান্ত গম্ভীর, বীররসে লীলায়িত। এ-রাগের মেল আশাবরী। লীলাময়ী বীরাঙ্গনা সেই রাত্রে অনেক আশা নিয়েই তো জগৎসিংহের উদ্দেশ্যে চলেছিলেন।

নৃত্যগীত বিলাসী নবাব কতলু খাঁ যাঁর মোহিনী কণ্ঠস্বরে বিমুগ্ধ হয়ে ভেবেছিলেন—'একি মানুষের গান, না, সুর রমণী গায়?' (ব. র. ১ম, পৃ. ১২৫)—সেই বিমলার মধুর কণ্ঠে মূর্খ দিগগজও অভিভূত। বিমলার কণ্ঠলীলা তিনি 'নিঃশ্বাস রহিত করিয়া শুনিতে লাগিলেন।' কিন্তু শুধু এই রাগসঙ্গীতে ব্রাহ্মণের মন ভরল না। ভরা সম্ভবও নয়। বঙ্কিম বোঝাতে চান এ গান গাওয়ার মতো সমঝদারিরও বিশেষ যোগ্যতা চাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার করে বলা যায়:

'শুনিবারও প্রতিভা থাকা চাই কেবল শুনাইবার নয়।'

(সংগীতের মুক্তি। রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশত সং, ১৪, পৃ. ৮৯৪)।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রোতারও যে বিশেষ মানসিক সংস্কার ও অনুশীলন দরকার সে সম্পর্কে বঙ্কিম স্পষ্টই জানিয়েছিলেন তাঁর 'সঙ্গীত' প্রবন্ধে (বঙ্গ দর্শন, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)। তিনি লেখেন:

"লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীত সুখানুভব মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক। কতকদূর মাত্র ইহা সত্য বটে যে, সুস্বর সকলেরই ভাল লাগে—স্বাভাবিক তাল বোধ সকলেরই আছে! কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না।·· সংস্কার-বিহীন ব্যক্তি রাগরাগিণী পরিপূর্ণ কালোয়াতী গান শুনিতে চাহেন না।" (ব. র. ২য়, পৃ ২৮৭)

গজপতি বিদ্যাদিগগজের সেই সংস্কার শিক্ষা কিছুই ছিল না। তাই বিমলার মধুকণ্ঠের লোভে সে যখন আবার গাইতে অনুরোধ করে তখন তার ফরমাস—'একটি বাঙলা গাও।' (ব. র. ১ম, পৃ ৭৫)

'দুর্গেশনন্দিনী'র এই গানের দৃশ্যে, নাটকোচিত গীতস্বস্তির সঙ্গে বঙ্কিম তাঁর কালের বাংলার গানের জগৎটি ধীরে ধীরে মেলে ধরতে শুরু করলেন।

তিনি জানালেন, সেকালের জীবনযাত্রায় সঙ্গীতের সমাদর ছিল সর্বস্তরে। সঙ্গীতের ছিল দুই ধারা। 'হিন্দুস্থানী' ও 'বাঙলা'। একটি কলাবতদের গাওয়ার ও সমঝদারির উঁচুদরের শিল্প, আর একটি সরল মানুষের সহজ স্বাদ সম্ভোগের ও আত্মোন্মোচনের স্বতঃস্ফূর্ত উপায়।

প্রসঙ্গত বলা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে সঙ্গীতের দুই ধারা প্রবহমান। আচার্য মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে জানা যায়, 'মার্গদেশী বিভাগেন সংগীতং দ্বিবিধং মতম্।' 'মার্গ' ও 'দেশী'—সঙ্গীতের এই দুই বিভাগ।

"আলাপাদি সন্নিবদ্ধো যঃ স মার্গঃ
প্রকীর্তিতঃ।
আলাপাদি বিহীনস্তু স চ দেশী
প্রকীর্তিতঃ॥"[৪]

আলাপাদি বদ্ধ শাস্ত্রবিধিসম্মত গানই 'মার্গ' বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। আর যে গানে শাস্ত্রবিধির কড়া কানুন নেই, যা সাধারণ মানুষ স্বচ্ছন্দে গায় তাই 'দেশী'।

বিমলা 'মার্গ' গানের ধারক। কিন্তু তাঁর গান ভিনদেশী।

আর দিগগজের গাওয়া এবং প্রার্থিত 'বাঙলা'—'দেশী' রীতির গান।

বিমলার দরবারী সংস্কৃতিগত পরিচয়ের মাধ্যমে বঙ্কিম জানান, হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীত উত্তর ভারতীয় রাজারাজড়ার সঙ্গীত দরবার থেকেই বাংলা দেশের মাটিতে ভেসে এসেছে। সপ্তস্বরতাললয়ে সম্পূর্ণ উচ্চাঙ্গ বা মার্গ সঙ্গীত উত্তর ভারতের জয়পুর ও দিল্লীর রাজদরবারে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এ গান অভিজাত সংস্কৃতিরই অঙ্গ, অভিজাত পরিবেশে এর লালন। তাই এ গানের গায়ক ও শ্রোতা উভয়েরই প্রয়োজন যথোপযুক্ত পরিবেশ, সংস্কার, অনুশীলন ও মনন।

বিমলার নাচগানের অনুষঙ্গেই জানিয়েছেন বঙ্কিম, পাঠান নবাব ও মুঘল বাদশাহদের গীতবিলাস ও প্রমোদপরায়ণতাই ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমৃদ্ধির কারণ। সঙ্গীত সংস্কৃতি মুসলিম হারেমবাসিনীদেরও ছিল জীবনচর্যার অঙ্গ।

'কপালকুণ্ডলা'র 'ভূতপূর্বে' অধ্যায়ে, বঙ্কিম মতিবিবির নানাবিধ কলাবিদ্যা শিক্ষাপ্রসঙ্গে এই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণ কন্যা পদ্মাবতী সমাজচ্যুত ও ধর্মান্তরিত হবার পর যখন মতিবিবিরূপে ওমরাহ পিতার সঙ্গে আগ্রায় বসবাস করছেন তখনই তিনি 'নৃত্যগীত রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন।'

জয়পুর, দিল্লী, আগ্রা, গোয়ালিয়র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অতি প্রাচীন কেন্দ্র।

রাজা বাদশাহের দাক্ষিণ্যে উৎসাহে ও সঙ্গীতপ্রাণতায় এই কেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠে। আলাউদ্দীন খলজীর সভাগায়ক আমীর খসরু (১৪শ শতক), গোয়ালিয়র রাজ মানসিংহ তোমর (১৫শ শতক) ও আকবরের সভারত্ন তানসেন (১৬শ শতক)-এর কৃতিত্বে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত দরবার সংস্কৃতিগত হয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

বঙ্কিম নানান সূত্রে উচ্চাঙ্গ নৃত্যগীত প্রসঙ্গ এনে এই সব সঙ্গীত কেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হলে দিল্লীর সঙ্গীত কেন্দ্র ভেঙে যায়।

শাহ আলম দ্বিতীয়-র (১৭৫৯) সময় থেকেই দিল্লীর দরবারী ওস্তাদেরা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। বাহাদুর শাহ-র সময় সিপাহী বিদ্রোহের উপপ্লবে (১৮৫৭) দিল্লীর সঙ্গীত কেন্দ্র সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতজ্ঞদের একটি বৃহৎ অংশ বাংলাদেশের সঙ্গীতপ্রিয় রাজা, সামন্ত ও ধনী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশের নানা অঞ্চলে নিশ্চিন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকে ক্রমে কলকাতা, চুঁচুড়া, হুগলী, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বঙ্কিমের সময় বাংলার রাগসঙ্গীত চর্চার সুবর্ণ যুগ। কলকাতায় তখন হিন্দুস্থানী গানের প্রবল প্রসার প্রতিপত্তি। ১৮৫৮য় লক্ষ্ণৌর রাজ্যচ্যুত নবাব সঙ্গীত-সর্বস্ব ওয়াজিদ আলি শাহ নির্বাসিত হয়ে কলকাতার মেটিয়াবুরুজে আমৃত্যু (১৮৮৭) বসবাস করতে আসেন। তার ফলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত গুণীদের কাছে কলকাতার আকর্ষণ বিশেষভাবে বেড়ে যায়।

ওয়াজিদ আলি শার দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সঙ্গীত দরবারে এসেছিলেন কত শত দরবার নটী ও কলাবন্ত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জাবের তিলমণ্ডী ঘরানার মোরাদালি খাঁ, গোয়ালিয়রের আলি বক্স. লক্ষ্ণৌর আহম্মদ খাঁ, দিল্লীর সেনী ঘরানার বাসৎ খাঁ, তাজ খাঁ, সারঙ্গ বাদক বদল খাঁ প্রভৃতি সেকালের খলিফা গাইয়ে বাজিয়েরা। নবাবের দরবার ও হারেম ছিল গুণী বাঈজী অধ্যুষিত। সুতরাং বঙ্কিমের সমকালের কলকাতায় মার্গরীতির নৃত্যগীতের একটি সজীব পরিমণ্ডল বিরাজ করছিল। সেই পরিমণ্ডলেরই প্রভাব ছিল 'দুর্গেশনন্দিনী'র নৃত্যগীত প্রসঙ্গে। নবাব কতলু খাঁর জাঁকজমকপূর্ণ নৃত্যগীতবিলাসে মুসলমানদের সঙ্গীতপ্রিয়তারও বিশেষ ইঙ্গিত ছিল।

'বঙ্গদর্শন' (সঙ্গীত, ১২৭৯, বৈশাখ) মুসলমানদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতপ্রীতিকে

সাধুবাদ জানিয়ে স্বীকার করেছিলেন—

'মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সঙ্গীতশাস্ত্র আদ্যোপান্ত গ্রহণপূর্বক নানা উন্নতি সাধন করিয়াছে।...ধ্রুপদ ব্যতীত খেয়াল টপ্পা ঠুংরি ইত্যাদি মুসলমানদের প্রযত্নে প্রকাশ হইয়াছে। রাগরাগিণী অনেক বাড়িয়াছে এবং তালের নূতন পদ্ধতি ও তাহার চমৎকার পারিপাট্য ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।'

বাংলার সঙ্গীতপ্রিয় বিদগ্ধজনেরা তাই সেকালে গুণী মুসলিম ওস্তাদের কাছে নাড়া বাঁধতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

ধ্রুপদ ওস্তাদ মোরাদালি খাঁ ছিলেন সেকালের কলকাতার নামকরা মালকোষ গাইয়ে। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে খ্যাতিমান হন যদুনাথ রায়, কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়, অঘোর চক্রবর্তী প্রভৃতি বাঙালী সঙ্গীত গুণীরা। এমনই কোনো গুণী হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-গাইয়ের গীত স্মৃতির প্রক্ষেপ হয়তো ছিল বিমলার গায়নে।

সেকালে বাঙালী সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা কৃতবিদ্য হবার জন্যে গোয়ালিয়র, জয়পুর, আগ্রা প্রভৃতি সঙ্গীত কেন্দ্রেও যেতেন। বঙ্কিমের 'ইন্দিরা'র 'উ-বাবু' 'পশ্চিমাঞ্চলে রীতিমতো গীতবিদ্যা শিখিয়াছিলেন।'

পশ্চিমা ওস্তাদদের গতায়াত ও প্রভাব প্রতিপত্তি ছাড়া অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে, পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরে বাংলার নিজস্ব ঘরানার ধ্রুপদ গড়ে ওঠে। মল্লভূমের অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ঐতিহ্য বেশ পুরনো। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে দিল্লীর দরবারের অনুকরণে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজসভায় সঙ্গীত বৈঠক বসতো। শ্রীক্ষেত্রে যাবার পথে অনেক পশ্চিমাগুণী মল্লরাজ দরবারে বিশ্রাম নিতেন। হিন্দুস্থানী গান বাজনার একটা পরিমণ্ডল বাংলার এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহের (রাজত্বকাল ১৭০২—১৭১২) সঙ্গীত-প্রাণতার খ্যাতি ছিল। এই ঐতিহ্যপীঠে ক্রমে আচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের (১৭৬১—১৮৫৩) মাধ্যমে বাংলার নিজস্ব ধ্রুপদ অনুশীলন বিশিষ্টতা লাভ করে।

ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর প্রবন্ধ (গীতবিতান পত্রিকা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৭) জানায় বিষ্ণুপরের সন্নিহিত গড়মান্দারণেরও নিজস্ব সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য ছিল। গৌড়ের সঙ্গে গড়মান্দারণের সাংস্কৃতিক বিনিময় হত। বঙ্কিম গড় মান্দারণী মাটিতে বিমলাকে দিয়ে সপ্তস্বরা পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতের সূচনা করে বাংলার নিজস্ব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতচর্চার প্রাচীন কেন্দ্র মল্লভূমেরই সাংস্কৃতিক মর্যাদা রক্ষা করেছেন বলা যায়।

পশ্চিম বাংলার প্রাচীন তিনটি গীতসংস্কৃতি কেন্দ্র—মল্লভূম, গৌড় ও বীরভূম।

বঙ্কিম তাঁর "দুর্গেশনন্দিনী" "মৃণালিনী" ও "আনন্দমঠ" উপন্যাসে এই তিন সঙ্গীত কেন্দ্রকেই যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন।

বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যবর্গ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-১৮৯৩), রামকেশব ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, যদুনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ এবং গোপাল চক্রবর্তী, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র শীল প্রভৃতি অন্যান্য প্রখ্যাত ধ্রুপদীয়াবৃন্দ সেসময় সমগ্র বাংলায় ধ্রুপদের জগৎ সমৃদ্ধ করে রেখেছিলেন। তবে স্মরণ রাখা দরকার তখন ব্রজ-ভাষায় ধ্রুপদ রচনাই ছিল রেওয়াজ। বাঙালী ধ্রুপদীয়ারাও হিন্দুস্থানী পদ বাঁধতেন ও গাইতেন।

বঙ্কিম-আমলে কলকাতার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারক পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বাড়ি। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১—১৯০৮) এবং রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০—১৯১৪) এই দুই ভাই ছিলেন সঙ্গীতগুণী ও গুণজ্ঞ। তাঁরা তাঁদের আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীকে সহযোগী করে সে সময় নানামুখী সাঙ্গীতিক আন্দোলনের হোতা। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ি তখন কলকাতার প্রাণচঞ্চল সঙ্গীত-তীর্থ। দেশী বিদেশী নানা কণ্ঠ ও যন্ত্রগুণীর নিত্য আশ্রয় ও আপ্যায়ন সভা। মেটিয়াবুরুজের সঙ্গীত দরবারের সঙ্গে চলত তার গুণী বিনিময়।

বঙ্কিম ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ। এঁরই বরাহনগরের 'এমারেল্ড বাওয়ার' ("মরকতকুঞ্জ") গৃহে অনুষ্ঠিত 'কলেজ' রিয়ুনিয়ন সভায় 'তৎকৃত মূর্তিমান রাগাদি (tabloux)'[৫] দেখার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন বঙ্কিম। সেইখানেই বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার। সম্ভবত সেটি ১৮৭৬ সাল। কারণ সেই বছরেই শৌরীন্দ্রমোহনের Six Principal Ragas with a brief view of the Hindu Music গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

সম্ভ্রান্ত ধনীঘরে নিয়মিত উচ্চাঙ্গ গানের বৈঠক ও চর্চা ছিল সেকালে বনে-দিয়ানার অঙ্গ। রাজা রামমোহন রায়-এর আমলেই দেখা যায় বাড়িতে ওস্তাদ রেখে গান বাজনার অনুশীলন বা বৈঠক বসানো ছিল ধনী শিক্ষিতের বিশেষ সংস্কৃতি। রাজা-র নিজের বাড়িতে কলাবত রহিম খাঁ নিযুক্ত ছিলেন। মধুসূদন দত্তের পিতা রাজনারায়ণ দত্তের গৃহেও উচ্চাঙ্গ গান বাজনার নজির আছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীত সংস্কৃতির কথা ধরা আছে রবীন্দ্রনাথ ও

অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতায় লেখেন—'দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সঙ্গীত বিদ্যার অধিকার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হোত।.. তম্বুরার তারে নিজের হাতে সুর বেঁধে সেটাকে কাঁধে হেলিয়ে আলাপের ভূমিকা দিয়ে যখন বড়ো বড়ো গীত রচয়িতার ধ্রুপদ গানে গায়ক নিস্তব্ধ সভা মুখরিত করতেন, সেই ছবির সুগম্ভীর রূপ আজো আমার মনে উজ্জ্বল আছে। দূর প্রদেশ থেকে আমন্ত্রিত গুণীদের সমাদর করে উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতের আসর রচনা করা সেকালে সম্পন্ন অবস্থার লোকের আত্মসম্মান রক্ষার অঙ্গ ছিল।...যদি দেখা যেত সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনবার সময় সমে মাথা-নাড়ায় ভুল করেছে, কিম্বা ওস্তাদকে রাগরাগিণী ফরমাশের বেলায় রীত রক্ষা করেনি তাতে যেন বংশ মর্যাদায় দাগ পড়ত।' (রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশত সং, ১৪, পৃ ৯১০)

রবীন্দ্রনাথের অতীত স্মৃতি বঙ্কিমের সমকালেরই ছবি।

ঠাকুর পরিবারের যে সাঙ্গীতিক আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথের লালন সেই পরিবেশ ছিল না বঙ্কিমের পিতৃগৃহে। আগ্রা বা গোয়ালিয়র থেকে খাঁ-সাহেব ওস্তাদেরা এসে কাঁঠাল পাড়ার সম্মানী ধনী চাটুজ্জে পরিবারে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন তেমন নজির নেই। বঙ্কিম আবাল্য অভ্যস্ত বাড়ির দুর্গোৎসব, দোল, রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত কথকতা, রামায়ণ গান, যাত্রা, পদ ও পালাকীর্তন মুখরিত নিত্য সভায় এবং পিতা যাদবচন্দ্র ও ভাটপাড়ার পন্ডিতদের কণ্ঠে আবৃত্ত মন্ত্র, স্তব, স্তোত্র ইত্যাদি দেবদেবীর বন্দনা গীতিময় দৈনন্দিন জীবন-চর্যায়।

এই গীত পরিবেশেই ছোটবেলা থেকে বঙ্কিমের সুরের কান ও গীত সংস্কার তৈরী হয়েছিল।

প্রকৃত ওস্তাদের কাছে বসে তালিম নেবার সুযোগ বঙ্কিম পেয়েছিলেন পরে এবং নিতান্তই ব্যক্তিগত আগ্রহে। পিতার বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার উপযুক্ত আবহাওয়া না থাকলেও ধ্রুপদী গান বাজনা যে শিক্ষা সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ সেবিষয়ে বঙ্কিমেরও ছিল সুদৃঢ় মতামত। 'সঙ্গীত' প্রবন্ধে তাঁর স্পষ্ট ভাষণ—যে, সংস্কার ও শিক্ষাভাবে কালোয়াতী গানের 'অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে হইবে...যেমন রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমনি শারীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম এবং চিত্ত প্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীত বিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য—'

(ব. র. ২য়, পৃ ২৮৭)

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যা অর্থসাধ্য। প্রচুর পারিশ্রমিক বা দক্ষিণার বিনিময়ে ওস্তাদের সান্নিধ্যে কঠোর শ্রম ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষণীয় এবং তা বিশেষ শিক্ষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের মানসিকতা সাপেক্ষ এ কথা বিবেচনা করেই বোধ করি বঙ্কিম 'সকল ভদ্রলোকের' জন্য এই শ্রেণীগত সঙ্গীত বিদ্যা নির্দিষ্ট করেছেন। আর সেই ভদ্রলোকের বন্ধনীভুক্ত বলেই তিনি নিজেও, 'সঙ্গীত সুখানুভব' তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর পক্ষে সম্ভবপর অনুশীলনে অর্জন করেছিলেন যথার্থ বৈদগ্ধ্য এবং যথেষ্ট পরিণত বয়সেই।

'বঙ্কিম জীবনী'র লেখক বঙ্কিমের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানান— 'কাঁটাল পাড়ায় একজন বঙ্গবিশ্রুত গায়ক বাস করিতেন, তাঁহার নাম যদুভট্ট তানরাজ। বঙ্কিম তাঁহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন দিতেন। এই যদুভট্টের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতাদি শিক্ষা নিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার তানলয় বোধ অনন্য সাধারণ ছিল। হারমোনিয়ম যন্ত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

যদুভট্ট বা যদুনাথ ভট্টাচার্য (১৮৪০—১৮৮৩) বিষ্ণুপুরেরই সন্তান। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা ধ্রুপদাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে। পরে পনেরো বছর বয়সে কলকাতায় আসেন ও ধ্রুপদীয়া গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৮০৮—১৮৭৪) কাছে গমকপ্রধান খাণ্ডার-বাণী রীতির ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। এই শিক্ষা শেষে যদুভট্ট পশ্চিমাঞ্চলের বহু সঙ্গীতকেন্দ্র পরিক্রমা করে বিভিন্ন কলাবতের সান্নিধ্যে নানা ঘরানার বিপুল ও বিচিত্র সঙ্গীত অভিজ্ঞতা আত্মস্থ করেন। তাই তাঁর উপাধি ছিল 'সঙ্গীত তীর্থঙ্কর'। এছাড়া 'তানরাজ', 'রঙ্গনাথ'—ইত্যাদি খেতাবেও তিনি ভূষিত ছিলেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর ভ্রাতাদের সঙ্গীত আসরে ও মেটিয়াবুরুজের সঙ্গীত দরবারে যদুভট্টের ছিল সম্মানিত আসন। বালক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর জ্যেষ্ঠদের গানের গুরু হিসেবে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে তিনি কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নেন। যদুভট্টের ক্ষণিক স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে চিরস্থায়ী হয়ে ছিল। নানা প্রবন্ধে নিবন্ধে[৭] রবীন্দ্রনাথ বারংবার যদুভট্টের প্রশস্তি করেছেন দেখা যায়। তিনি বলেছেন, যদুভট্ট 'বিধাতার স্বহস্ত রচিত'। 'বাংলা দেশে এ রকম ওস্তাদ জন্মায়নি', 'তাঁর প্রত্যেক গানে Originality ছিল। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তে রূপ ধারণ করত'। 'যদুভট্টের মতো সঙ্গীত ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছে কিনা সন্দেহ।'

সেকালের এই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত প্রতিভার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সুযোগ বঙ্কিম পেয়েছিলেন তাঁর পরিণত বয়স ও মন নিয়ে। তাই বঙ্কিমের সাঙ্গীতিক সত্তায় এবং রচিতে সেই অসামান্য সাংগীতিক ব্যক্তিত্বের অব্যর্থ প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল।

শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম জীবনী' (পৃ ২৭৪) থেকে জানা যায়, মৃণালিনী রচনার সমসময়ে (১৮৬৮—৬৯) বঙ্কিমের যদুভট্টের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার 'ঝোঁক' চাপে। বঙ্কিমের বয়স তখন ত্রিশ আর যদুভট্টের আটাশ। অর্থাৎ দুজনেই যৌবনদীপ্তিতে ও পূর্ণ সৃষ্টিসামর্থ্যে উজ্জ্বল।

বঙ্কিমের যে বৈঠকী গান শোনার নেশা ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যদুভট্টের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের ঘটনায়[৮]। চুঁচুড়ার এক সঙ্গীত আসরে প্রাথমিক সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে নাকি এই দুই সঙ্গীত ও সাহিত্যরথীর প্রথম পরিচয়। আসরে বসে তানপুরার তার বাঁধতে যথেষ্ট সময় নেওয়া ছিল যদু-ভট্টের স্বভাব। আর এ ব্যাপারে বঙ্কিমের ছিল বিশেষ বিরক্তি। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দানেশ খাঁ-র তার বাঁধার ছবি এঁকে সেই বিরক্তি তিনি প্রকাশও করেছেন। সেদিন সেই আসরেও যদুভট্টের প্রতি বিরক্তিতে বঙ্কিম কটূক্তি করেন। মানী গায়ক ক্রোধে অপমানে সভা ত্যাগের উদ্যোগ করলে আসর পণ্ড হবার উপক্রম হয়। পরে অবশ্য অন্যের মধ্যস্থতায় পরিচয় বিনিময় হয়, উভয়েই শান্ত হন।

সেদিন সেই সঙ্গীতের আসরে যদুনাথ ভট্টাচার্য গেয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত দরবারী কানাড়া। গানটি হল—

'রাধারমণ মদনমোহন মাধব মুকুন্দ মুরারি
মধুসূদন মনোহর ময়ূরপুচ্ছধারী ॥
ব্রজরাজ গোপাল বাঁকে বিহারী।
নীল নীরদশ্যাম, নব লোকেশ্বর
জয়তি যদুনাথ।
শ্রীনাথ গোপীনাথ গোলোকনাথ শ্রীহরি ॥'

যদুভট্ট ছিলেন দরবারী কানাড়ায় সিদ্ধ। স্বরচিত এই ধ্রুপদ ঝাঁপতালে চমৎকার বন্দেশে গাইতেন তিনি। তাঁর ছিল উদাত্ত ও মধুর কণ্ঠ। নিপুণ মীড়ের কারুকাজে, গমকের তরঙ্গ বিচ্ছুরিত করে শ্রোতাদের তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। জাস্টিস রমেশচন্দ্র দত্তের তৃতীয় ভ্রাতা কেশবচন্দ্র মিত্র ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ পাখোয়াজী। তিনিই মেঘমন্দ্র ধ্বনি তুলে যদুভট্টের গানে যোগ্য সঙ্গত করতেন।

'রাধারমণ মদনমোহন' গানটি ছিল যদুভট্টের নিজেরই অত্যন্ত প্রিয়। তাঁর

সেই প্রাণঢালা ঈশ্বর বন্দনা, গীতপ্রাণ বঙ্কিমের হৃদয়ও গভীরভাবে স্পর্শ করে। স্মৃতিচারী জানান, তাঁর নয়ন ভাবাবেগে হয় অশ্রুসজল, আনন অতি কোমল।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর স্মৃতি সংগৃহীত এই সভাচিত্রের মূল্য বঙ্কিমের গানের জগৎ সন্ধানীর কাছে যথেষ্ট। কারণ এই চিত্রে রয়েছে বঙ্কিমের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রীতির ও বোধের পরিচয়, এবং সঙ্গীতের আসরে তাঁর সাগ্রহ উপস্থিতির বিবরণ। হয়তো সেদিনের সেই গীতবিমুগ্ধতাই বঙ্কিমকে এই সিদ্ধ গায়কের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। আঁচরেই পেয়েও যান যদুভট্টের ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ।

বৈদিক ব্রাহ্মণ যদুভট্টের বোনের শ্বশুরবাড়ি ছিল ভাটপাড়া। আর নিজের শ্বশুরবাড়ি কাঁচরাপাড়া। শেষ জীবনে অবসর নিয়ে বেশ কিছুদিন তিনি কাঁচরাপাড়ায় ছিলেন। তাই নৈহাটি কাঁঠালপাড়াবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সহজ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। বঙ্কিমের বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' গানের প্রথম সুর যদুভট্টই দেন একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ভাটপাড়া বিষ্ণুপুরের বৈদিক ভট্টদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। তাই ভাটপাড়ায় বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের রীতিমত মজলিশ বসত। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ পণ্ডিত চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন ভালো ধ্রুপদ গাইতেন[৯]। যদুভট্টকে কেন্দ্র করে ভাটপাড়ার ধ্রুপদ বৈঠক অবশ্যই জমে উঠেছিল। আর বঙ্কিমও ছিলেন তার বিশেষ এক সদস্য।

বঙ্কিমচন্দ্র রীতিমত দক্ষিণা দিয়ে যদুভট্টের কাছে গান শেখেন। অর্থাৎ বোঝা যায়, তাঁর সঙ্গীতচর্চা নিছক খেয়াল-খুশীর ছিল না। ছাত্রসুলভ নিয়ম-নিষ্ঠা শ্রদ্ধা মনোযোগসহ সেই শিক্ষা গ্রহণ করেন তিনি। তাঁর স্বভাবই ছিল শুশ্রূষু শিক্ষার্থীর। শচীশচন্দ্রের বিবৃতি।—

'আমি দেখিয়াছি, তাঁহার যখন কোনো একটা বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য বাসনা জন্মিত, তখন তিনি সে বিষয়টা আয়ত্ত করিবার জন্য অধীর ও অস্থির হইয়া পড়িতেন'।[১০]

এই আগ্রহী ছাত্ররূপেই গুণী সঙ্গীতাচার্যের সান্নিধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ধ্রুপদের ক্রিয়াঙ্গ ও তত্ত্বাঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান তিনি অর্জন করেছিলেন। তাই তিনি অনুধাবন করেছেন উচ্চাঙ্গ গানের মূল্য। জেনেছেন রাগরাগিণীর স্বরূপ। বুঝেছেন সুর, তাল, লয় সমন্বিত সপ্তস্বরের আরোহ অবরোহে শ্রুতিশিল্প, কিভাবে 'সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ' রাগরূপ লাভ করে। তাই 'বিষবৃক্ষে' হরিদাসী বৈষ্ণবীর গায়ন প্রতিভা সম্পর্কে স্পষ্টত জানিয়েছেন, যে কেবলই অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠ-গীতিধ্বনি নয় শ্রুতিনন্দন এই শিল্পের একমাত্র নির্ভর। গীতিপ্রাণতা মানুষের

সহজাত হলেও গীতশিল্পায়ণ নয় অনায়াসসাধ্য। সপ্তস্বরা তাললয়বদ্ধ পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত বিধিবদ্ধরূপে যথাযোগ্য অনুশীলনের বিষয় এবং যোগ্য শিক্ষা ও সংস্কার না থাকলে সম্ভবও নয় সেই শিল্পের পূর্ণ রস গ্রহণ।

শিক্ষালোকবিহীন অন্তঃপুরিকাদের মজলিশে গাওয়া কৃতবিদ্য সঙ্গীত শিল্পী ছদ্মবেশী দেবেন্দ্রর গান সম্পর্কে বঙ্কিমের তাই মন্তব্য—

'মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পারিপাট্য কি বুঝিবে? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে, এই সর্বাঙ্গীণ তাললয়স্বরপরিশুদ্ধ গান কেবল সুকণ্ঠের কার্য নহে। বৈষ্ণবী যেই হউক, সে সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিতা এবং অল্প বয়সে তাহার পারদর্শী।' (ব. র. ১ম, পৃ ২৭৩)

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সম্মানিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মানেই একচ্ছত্র 'ধ্রুপদ। ধ্রুপদ'ই হল শাস্ত্রবিধির সম্পূর্ণ অনুগত বিশুদ্ধ রূপ ও রীতির গান। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চার স্তবক বা 'তুকে' এ গান নিবদ্ধ। অচপল গাম্ভীর্যে রাগ ও রাগরূপের অধ্যাত্ম সৌন্দর্য বিস্তার ধ্রুপদের প্রধান লক্ষ্য। অতি নিষ্ঠা শ্রম ও সময়সাপেক্ষ কণ্ঠ-সাধনা এই রীতির গায়ন শিল্পে আবশ্যিক। কারণ বিশুদ্ধ তাল, মান, লয় ও স্বর সংযোগে সুরের অবিকৃত রূপ কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে না পারলে ধ্রুপদ সম্পূর্ণ মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে। ক্রমারোহী স্বরে সুরের ঋজুতা ও স্থায়িত্ব এই রাগ সঙ্গীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে এ সঙ্গীত সুকঠিন কণ্ঠসাধনা সাপেক্ষ নিঃসন্দেহে।

বঙ্কিমের হরিদাসী বৈষ্ণবী অথবা তাঁর 'মৃণালিনী'র গিরিজায়া বৈঠকী ধ্রুপদ গাননি ঠিকই। কিন্তু দুই বৈষ্ণবীর গায়কী, কণ্ঠমাধুর্য, সুর-স্ফুটন ও সুর বিস্তার শৈলীর বর্ণনায় যেন কোনো ধ্রুপদগুণীর গায়ন প্রতিভার অনিবার্য ছায়াসম্পাত।

যদুভট্টের সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতার সদ্যস্পর্শমাখা 'মৃণালিনী'র গিরিজায়া —'প্রথমে ধীরে ধীরে, মৃদু মৃদু গীত আরম্ভ করিল—যেন নব শিক্ষিতা বিহঙ্গী প্রথমোদ্যমে স্পষ্ট গান করিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহার স্বর স্পষ্টতা লাভ করিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল। শেষে সেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ তানলয়বিশিষ্ট কমনীয় কণ্ঠধ্বনি পুষ্করিণী, উপবন আকাশ বিপ্লুত করিয়া স্বর্গচ্যুত স্বরসরিত্তরঙ্গ স্বরূপ মৃণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।'

(ব. র. ১ম. পৃ ২৩৪)

হরিদাসী বৈষ্ণবীও প্রথমে—

'আপন কণ্ঠমধ্যে অতি মৃদু মৃদু নব বসন্ত প্রেরিতা এক ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ সুরের আলাপ করিতে লাগিল—যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তির জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে··· শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া, অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠগীতিধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বিমোহিতচিত্তে শুনিল যে, সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত কণ্ঠ, অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিয়া আকাশমার্গে উঠিল।' (ব. র. ১ম. পৃ: ২৭৩)

যদুভট্টের অসামান্য কণ্ঠগীতির অভিজ্ঞতাই কি সাহিত্য-কৌশলে ধরে রেখেছেন বঙ্কিম ?

প্রতিভাবান ধ্রুপদীয়া কেমন অনায়াস কণ্ঠলীলায় উদারা মুদারা তারা গ্রামে স্বর বিহার করে সুরের মায়াজাল রচনা করেন, তানরাজ যদুভট্টের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভে বঙ্কিম সে অভিজ্ঞতা 'মৃণালিনী'র সময় থেকেই সঞ্চয় করেছিলেন। অভিজ্ঞের সাক্ষ্যে বার বার জানা যায় যদুভট্ট ছিলেন সুরের জাদুকর। কণ্ঠ সৌন্দর্যে ও সুরের ঐশ্বর্যে সভাস্থ সকলকে তিনি সম্মোহিত করে রাখতেন। কণ্ঠ তাঁর তারসপ্তকে অনায়াস বিহার করত। তিনি ছিলেন খাণ্ডারবাণী ধারায় সিদ্ধ। তাই তাঁর গানে গমকের কাজ বেশি ছিল। তিনি একবার এক সভায় সেকালের প্রখ্যাত মালকোষ গাইয়ে মোরাদালি খাঁর অপূর্ব জোয়ারিদার গলা ম্লান করে 'এফ'-এ গলা চড়িয়ে গান ধরেছিলেন। মেটেবুরুজের দাপুটে দরবারী বাঈজীদের স্তম্ভিত করেছিলেন উদারা থেকে সহসা তারায় বীর বিক্রমে গলা চড়িয়ে গমক ছেড়ে। উনিশ শতকে বাংলার গানের জগতে যদুভট্ট কিংবদন্তী পুরুষ। অজস্র গল্প তাঁকে নিয়ে। সুর ও সুরা এই ছিল তাঁর সমান প্রিয় 'চীজ'।[১১]

কখনও কখনও মনে হয়—বঙ্কিম তাঁর সুর ও সুরাপ্রিয় দেবেন্দ্রর সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বে যদুভট্টেরই ছায়া প্রক্ষেপ ঘটিয়েছেন।

অবিকৃত ঠাটে গেয় শুদ্ধ সঙ্গীতের কান বঙ্কিমের যদুভট্টের সঙ্গগুণে বিশেষভাবে তৈরি হয়েছিল। উচ্চকণ্ঠে গাওয়া মধুর সুর, স্বর, তান লয় সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসঙ্গ বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে বারবার ব্যবহার করেছেন। এমন কি 'আনন্দমঠ'-এ শান্তির গাওয়া দশাবতার স্তোত্র এবং 'সীতারামে' জয়ন্তী ও শ্রীর যুগল কণ্ঠের স্তব গানেও অনুশীলন সাপেক্ষ উচ্চাঙ্গ গায়ন রীতির বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব যথার্থই বাংলাদেশে রাগ সঙ্গীত চর্চার 'পুষ্পিত ও ফলবন্ত অধ্যায়'।[১২] একদিকে দেশী বিদেশী গুণী ওস্তাদদের শিল্প কৃতিত্বে

মুখরিত হয়েছে বিদগ্ধ সঙ্গীত সভা, অপর দিকে রচিত হয়েছে সঙ্গীত বিষয়ক নানা গ্রন্থ।

সঙ্গীত বিষয়ক প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ, রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীত তরঙ্গ' (১৮১৮)। তারপর বঙ্কিমের জন্ম বৎসর ১৮৩৮-এ প্রকাশিত নিধুবাবুর টপ্পা সংকলন 'গীতরত্ন' থেকে শুরু করে মুদ্রিত হয়েছে নানা ধরনের বই ও রচনা। কৃষ্ণদাস ব্যাসের 'সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম' তিনখণ্ড (১৮৪২—১৮৪৯), প্যারীচাঁদ মিত্রের গীত সংগ্রহ 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১), ধ্রুপদীয়া রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাংলা ধ্রুপদ গানের সংকলন—ব্রজভাষায় রচিত মূল ধ্রুপদের রাগ অনুসরণে 'মূল সঙ্গীতাদর্শ' (১৮৬৩), কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম বাংলা ভাষার স্বরলিপি পুস্তক 'বঙ্গৈকতান' (১৮৬৭) বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ১৮৬৭ থেকে প্রায় প্রতি বছরই ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত বিষয়ক নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস, উৎপত্তি সংক্রান্ত গ্রন্থ। বিভিন্ন প্রকার স্বরলিপি পরিচায়ক গ্রন্থ, নানা যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত বিষয়ক পুস্তক-এর অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে সঙ্গীতের নবজাগরণের ক্ষেত্রে শৌরীন্দ্রমোহন, ক্ষেত্রমোহন ও তাঁর শিষ্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

শৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন নানামুখী সাঙ্গীতিক আন্দোলনের উদ্যোক্তা।

১৮৬৫তে, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীকে সঙ্গীতাচার্য নিযুক্ত করে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়'। শৌরীন্দ্রমোহন তার উৎসাহী সমর্থক। তাঁরই উদ্যোগে এই ঠাকুরবাড়িতে ১৮৬৭ সালে প্রথম সর্ব-ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৭১-এ পদ্ধতিগত সঙ্গীত শিক্ষা দানের জন্য তিনি স্থাপন করেন 'বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়', ১৮৮১-তে 'বেঙ্গল একাডেমী অব্ মিউজিক' প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রাদির সংগ্রহশালাও স্থাপন করেন তিনি। করেন দক্ষ শিল্পীদের দিয়ে বিভিন্ন রাগরূপের চিত্রাবলী অঙ্কন ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

১২৭৯-র বঙ্গদর্শনে (ইংরেজি ১৮৭২) 'সঙ্গীত' প্রবন্ধে বঙ্কিম প্রথম রাগরাগিণীর ধ্যান-রূপ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাই শৌরীন্দ্রমোহনের 'মরকত কুঞ্জে' রাগচিত্রমালা প্রদর্শনীতে তিনি সাদরে আমন্ত্রিত হয়েছেন সংগত ভাবেই।

বঙ্গদর্শনের মন্তব্য (১২৭৯, শ্রাবণ)—'সভ্যতার প্রধান চিহ্ন সঙ্গীতানুরাগ'।

সেকালের অন্যতম সঙ্গীতানুরাগী 'সুসভ্য সুশিক্ষিত' বঙ্কিম সঙ্গীত বিষয়ক যাবতীয় উদ্যোগকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন দেখা যায়।

বিলিতি অর্কেস্ট্রার অনুকরণে বাংলায় একতান বাদনের প্রচেষ্টা শুরু হয় যতীন্দ্রমোহনের উৎসাহে। 'জাতীয় নাট্যশালার সঙ্গে জাতীয় একবাদনও সংঘটিত হওয়া কর্তব্য'—এই ছিল যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রস্তাব। আচার্য ক্ষেত্রমোহন তাই বিলিতি হার্মনি নীতির অনুকরণে একতান বাদন সম্প্রদায় গঠন করেন প্রথম। ১৮৫৮য় বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রথম নাটক "রত্নাবলী"র জন্য তিনি অর্কেস্ট্রা-বাদনের স্বরলিপি তৈরী করে দেন। ১৮৬৭-তে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতের গৎ রচনায় পাশ্চাত্য পদ্ধতির হার্মনি যোজনা করেন, এবং তা প্রকাশ করেন তাঁর 'বঙ্গৈকতান' গ্রন্থে ও 'Hindusthani Airs Arranged for the Piano Forte' (১৮৬৮) গ্রন্থে!

এই বিচিত্র উদ্যোগ বা 'হার্মনি' ব্যাপারটি বাঙালী সমাজ বোধ করি সাদরে গ্রহণ করেননি। কিন্তু করেছেন বঙ্কিম। তাই তাঁর 'সঙ্গীত' প্রবন্ধে লেখেন—'সংস্কারবিহীন ব্যক্তি রাগরাগিণী পরিপূর্ণ কালোয়াতী গান শুনিতে চাহেন না, এবং বহুমিলন বিশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালীর কাছে অরণ্যে রোদন। কিন্তু উভয় স্থানেই অনাদরটি অসভ্যতার চিহ্ন বলিতে হইবে।'

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬—১৯০৪) ছিলেন ক্ষেত্রমোহনের শিষ্য। তিনি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীততাত্ত্বিক। বিখ্যাত গ্রন্থ 'গীতসূত্রসার' (১৮৮৪)-এর লেখক। হিন্দু কলেজের ছাত্র, মধুসূদন দত্তের অন্তরঙ্গ এই কৃষ্ণ-ধন ইউরোপীয় সঙ্গীত ও উচ্চাঙ্গ হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রে ছিলেন সমান অভিজ্ঞ। গোয়ালিয়রেও তিনি সঙ্গীতশিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ছিল বিশেষ অভিনয় ক্ষমতা। ১৮৫৯-এ অভিনীত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের নাম ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হন। ১৮৬৫তে পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয়ে মঞ্চস্থ হয় 'বিদ্যাসুন্দর'। সে নাটকের বিখ্যাত 'হীরা-মালিনী' তাঁরই রূপায়ণ। ১৮৭৫-এ তিনি চালনা করেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার। টপ্পা ও খেয়াল গায়িকা বিখ্যাত বাঈজী যাদুমণি ছিলেন তাঁর থিয়েটারের অন্যতমা অভিনেত্রী। ১২৮১-র চৈত্র সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' কৃষ্ণধনের 'সঙ্গীত সমালোচনা' নিবন্ধটি প্রকাশ পায়।

ভারতীয় রাগসঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞ নামে খ্যাতিমান শৌরীন্দ্রমোহন, ক্ষেত্রমোহন ও কৃষ্ণধন 'বঙ্গদর্শন'-এর ১২৮০ ফাল্গুন সংখ্যায় "ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র" প্রবন্ধে নিবন্ধকার রামদাস সেন-এর কাছে প্রশংসিত উল্লেখ পেয়েছেন। তাঁদের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন রামদাস এবং মন্তব্য করেছেন—

'আর্য' জাতীয় সঙ্গীত বিদ্যা ক্রমে বঙ্গদেশে শ্রীহীন হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া সহৃদয় মাত্রই দুঃখিত ছিলেন। এক্ষণে কৃতবিদ্যগণ পুনরায় সঙ্গীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াতে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি।'

সহৃদয় বঙ্কিম তাঁর 'সঙ্গীত' প্রবন্ধে সেই 'কৃতবিদ্যগণে'রই সামিল হয়েছিলেন। স্বল্প পরিসরে সঙ্গীতের সংজ্ঞা, সঙ্গীতের উদ্দেশ্য, সঙ্গীতের ধ্যানরূপ, রাগচিত্র ও জীবনে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা তিনি সুন্দর ও স্বচ্ছ ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। এ দেশের উচ্চাঙ্গ সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও তার গৌরব প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমেরও কাম্য ছিল। তার প্রমাণ তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "সঙ্গীত" (১২৭৯), 'ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র' (১২৮০), রাগনির্ণয় (১২৮৫) ইত্যাদি প্রবন্ধাবলী।

কিন্তু এই সঙ্গে লক্ষণীয় তাঁর পত্রিকায় সমানভাবেই অভ্যর্থিত হয়েছে 'যাত্রা' (১২৭৯ পৌষ, ১২৮০, শ্রাবণ), 'জ্ঞানদাস' (১২৮০ মাঘ), বলরাম দাস (১২৮০ চৈত্র)-এর মতো প্রবন্ধাবলী এবং 'অধঃপতন সঙ্গীতে'র (১২৮০ অগ্রহায়ণ) মতো সুদীর্ঘ কবিতা।

রামদাস সেন, তাঁর 'ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র' প্রবন্ধে বৈদিক কাল থেকে শুরু করে তাঁর সমকাল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রবহমান উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও রেখাপথ সম্পর্কে আলোচনা করেন। দেখা যায়, বঙ্কিম কিন্তু শুধু ভদ্রলোক-এর বন্ধনীভুক্ত সংস্কৃতিবান বাঙালীর অনুশীলনযোগ্য সঙ্গীতের ইতিহাসে কৌতূহলী নন। সেকাল ও একাল মিলিয়ে বাংলার সমগ্র গানের জগৎ সম্পর্কেই তাঁর পূর্ণ কৌতূহল। সমগ্র বাংলার গীতরসিক সমাজের বিভিন্ন রুচি, গীতমতি, তার ঐতিহ্য ও অবক্ষয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি সন্ধানেই তিনি বিশেষ আগ্রহী।

বঙ্কিম অবশ্যই খুঁজেছেন মহিমান্বিত ধ্রুপদী গান যা ছিল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গর্বস্বরূপ। তারই পাশাপাশি একান্ত আকুতিমাখা বাসনায় শুনতে চেয়েছেন বাঙালিরই একান্ত নিজস্ব ঐতিহ্য খাঁটি দিশি 'বাঙলা' গান। যা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা ছিল না শৌরীন্দ্রমোহনের। পাশ্চাত্য ভারতবিদ্যা পথিকদের পরানো জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় তখনকার নব্য কৃতবিদ্যেরা কেবল ধ্রুপদী ঐতিহ্যের জগৎ দেখবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। উইলিয়ম জোন্স্, অগস্টাস উইলয়ার্ড, ব্লকম্যান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রশংসা ও আলোচনা করায় কৃতবিদ্যগণ কেবল হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রতি তাঁদের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। জগদীশনাথ রায় 'সঙ্গীত' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

"দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ব সঞ্চিত ধনসকল আমাদের বিনষ্ট হইবার

সম্ভাবনা হইয়াছে। ইউরোপীয় বিদ্যা প্রভাবে নব্য সম্প্রদায়ের দ্বারা এই দুর্ভাবনা দূর হইবার আশা হওয়াতে যে কিরূপ আহ্লাদ হয় তাহা বলা বাহুল্য।

(বঙ্গদর্শন, ১২৭৯, বৈশাখ)

রামদাস সেন কিন্তু খেদভরে লিখেছিলেন—'প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সঙ্গীতের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল।…এখন সঙ্গীত নিতান্ত প্রভাহীন অসহায় …ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ 'নেটিভ মিউজিক' বলিয়া সঙ্গীতের আদর করিল না।'

এই খেদ ছিল বঙ্কিমের। তাঁর 'বাঙলা'-ই তাঁর কাছে হতাদর 'নেটিভ মিউজিক'! তাই তিনি তাঁর উপন্যাসে যথাযথ সামাজিক প্রেক্ষিত চিত্রিত করে সেই প্রাচীন, সুখস্মৃতিজনক ও বর্তমান নিষ্প্রভ হীনদশার 'নেটিভ মিউজিক' বা বাংলা গানের ছবি ফুটিয়ে তুললেন যথোচিত দৃষ্টান্তে। উপরন্তু তিনি জাগিয়ে তুললেন আশা। এই অসহায়তা অতিক্রমী নবভাবে রূপে রসে উজ্জীবিত বাংলা সঙ্গীতের নবজন্মের। বাংলা গানের স্মৃতি সত্তা ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল উদাহরণমালায় সজ্জিত হয়ে বঙ্কিমের কথাশিল্প তাই পেল এক অভিনব মাত্রা।

রাগসঙ্গীত চর্চার বিপুল কর্মকাণ্ডের যুগে বসবাস করেই বঙ্কিম অনুধাবন করেছিলেন, সংস্কৃতিবান বাঙালী গীতরসিক মার্গরীতির সঙ্গীতকলা সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু ক্রমে উচ্চমহলে উপেক্ষিত হয়েছে বাঙালী প্রাণের অনাবিল আনন্দ বেদনার প্রকাশ খাঁটি 'দেশী' 'আলাপাদিবিহীন' বাংলা গান। তাই বঙ্কিম দেখিয়েছেন 'ইন্দিরা'র উ-বাবু সনদী খিয়ালে কৃতবিদ্য, কিন্তু 'বদন অধিকারী' বা 'দাশু রায়ে'র যাত্রা বা পাঁচালী গানে তিনি অপটু।

বিমলার গানে যেমন মন ভরেনি গজপতির তেমনি পাকা খিয়ালিয়া উ-বাবুর কণ্ঠচাতুর্যেও সন্তুষ্ট হয়নি তাঁর বাসরঘরের রমণীরা। তাদের প্রতিক্রিয়া —'শুনিয়া সে আপ্সরোমণ্ডলী হাসিল।' (ব. র. ১ম, পৃ ৩৮৭)

'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'ইন্দিরা'র উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দানেই বুঝিয়েছেন বঙ্কিম গানের শুধু নয়, শ্রোতারও রয়েছে শ্রেণীভেদ। তাঁর উপলব্ধি, হিন্দুস্থানী গান বাংলার মাটিতে যত বড় সম্ভ্রান্ত মর্যাদা ভূমি গড়ে তুলুক না কেন, বাংলার লোকায়ত জীবনেরও মনের কাছে তা ভিন্ দেশী। অপরিচিত বৃজ ভাষায় গাওয়া প্রকৃতি বর্ণনা ও ঈশ্বর বন্দনামূলক রাগসর্বস্ব সঙ্গীতে প্রকাশোন্মুখ বাঙালীর মন ভরেনি। সুরের সঙ্গে সঙ্গে সে চেয়েছে সুখ দুঃখ বাসনা বেদনা উজাড় করা মনের কথা ও জীবনকাহিনী। তার গান তাই সুরে ও বাক্যের যোগে সম্পূর্ণ।

সুর ভাব ভাষার সুসমন্বয়ে পরিপূর্ণ বাংলা গানের প্রাচীন ঐশ্বর্যের দিকে মন ফেরাবার জন্যেই বঙ্কিম তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'মৃণালিনী' গানে গানে ভরিয়ে তুললেন। 'একটি বাঙলা গাও' দিগগজের এই সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখবার সুযোগ বিমলা পাননি। 'মৃণালিনী'র গিরিজায়াই গ্রহণ করেছে সেই 'বাঙলা' শোনাবার সম্পূর্ণ ভার।

'সই মনের কথা সই'।

—মৃণালিনী।

মোট বারোটি গানে অনুবিদ্ধ 'মৃণালিনী'র অন্তঃপুরে প্রবেশ করে মনে প্রশ্ন জাগে—যদুভট্টের প্রতিভার সদাস্পর্শে কি বঙ্কিম হয়েছেন এমন সঙ্গীতমুখর। এত গান বঙ্কিম আর কোনো উপন্যাসের জন্য রচনা করেননি। 'মৃণালিনী' রচনার সমসময়ে তিনি যদুভট্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যদুভট্ট ছিলেন সাঙ্গীতিক সত্তার পূর্ণ আদর্শ; যিনি পদ রচনা করতেন, সুর সংযোজনা করতেন এবং শুদ্ধ ঠাটে বিচিত্র ধরনের গান পরিবেশন করতেন। শুদ্ধ ধ্রুপদ সাধনা ছাড়াও বহু 'বাঙলা' গান রচনা করেছেন তিনি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন 'সঙ্গীত ভাবুক'। এই পূর্ণ সাঙ্গীতিক সত্তার সঙ্গগুণেই বুঝি বঙ্কিম বিশেষভাবে এই পর্ব থেকেই হয়ে উঠেছেন সঙ্গীত রচয়িতা ও সঙ্গীত ভাবুক। 'মৃণালিনী' (১৮৬৮) ও তৎপরবর্তী 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭১) গানে গানে উতরোল। গীতিশ্বাস নানাভাবে ছড়িয়ে গেছে তার পরের সব উপন্যাসেও। সুরের মূর্ছনা 'সীতারাম' (১৮৮৭) অবধি সঞ্চারিত। আর সেই গীতিসুরে অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে আছে বঙ্কিমের বিশেষ ভাবনার পারম্পর্যে বিধৃত তাঁর না-বলা বাণীরই এক নিগূঢ় জগৎ।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে বলেছেন 'স্বভাব গীতমুখর ও গীতমুগ্ধ'।[১৩] বাঙালীর সেই স্বভাব গীতমুখর সত্তার প্রতীক 'মৃণালিনী'র গৌড়ী বৈষ্ণবী ভিখারিনী গিরিজায়া। সমগ্র 'মৃণালিনী' তারই গানে কলস্বনা। এই উপন্যাসের দশটি গান তার কণ্ঠোৎসারিত। মাত্র দুটি গান নায়িকা মৃণালিনীর গাওয়া। মৃণালিনী গীতমুগ্ধা শ্রোত্রী।

বাংলার প্রাচীন গানের দুই ধারার নিদর্শন কণ্ঠে বয়ে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় প্রথম আবির্ভাব গিরিজায়ার। প্রাচীন পদাবলী কীর্তন ও গ্রামীণ লোক-

গীতির আদলে বাঁধা গানের ভার নিয়ে সে অভিজাতের অন্তঃপুর থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরে অবাধচারিণী। গানে গানে নায়ক নায়িকার মনের কথা আদানপ্রদান করে সে; নিজেও প্রাণসখী মৃণালিনীর ব্যথার ব্যথী হয়ে উজাড় করে তার নিজস্ব ভাবনা।

'মৃণালিনী'র প্রথম খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'ভিখারিনী' বৈষ্ণবী গিরিজায়ার প্রথম প্রবেশ। তার 'কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত' মধুর সঙ্গীতে মৃণালিনী উৎকর্ণ। এই গানের বাচনের আড়ালে রয়েছে অন্য এক বাণী। মৃণালিনী বোঝে ভিখারিনী আসলে দূতী। কৃতসংকেতে বয়ে এনেছে তারই জন্যে সু-সমাচার। তার হারানো প্রণয়ী হেমচন্দ্রের উদ্দেশ। তাই গিরিজায়াকে সাগ্রহে ডেকে সেই গান আবার শোনে। বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রথম গান 'মথুরবাসিনী, মধুরহাসিনী' পদটি দুবার শোনান আমাদের গিরিজায়ার 'দিব্য গলায়'। কোমলকান্ত পদাবলীতে গাঁথা বঙ্কিমের এই প্রথম গান :

'মথুরবাসিনি, মধুরহাসিনি শ্যামবিলাসিনি-রে।
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী-রে॥
বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু
তেয়াগী-রে।
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুয়া
লাগি-রে।
বিকচ নলিনে, যমুনাপুলিনে, বহুত পিয়াসা-রে।
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা-রে॥
সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরী, কাঁহা মিলে
দেখা-রে।
শুনি, যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে
একা-রে॥

মগধবাসী হেমচন্দ্র তাঁর হারানো প্রেমিকা মথুরাবাসিনী মৃণালিনীর উদ্দেশ্যে এ গান রচনা করে 'গীত গাইয়া দিনপাত' করা বৈষ্ণবী ভিখারিনী গিরিজায়ার কণ্ঠে সমর্পণ করেছেন! এ গান গেয়ে, বৈষ্ণবীর পক্ষে যে সহজ হবে, দ্বারে দ্বারে ঘুরে সেই অজ্ঞাতবাসিনী মৃণালের সন্ধান করে ফেরা। এ গানের ভাষা মৈথিলী বাংলা বা বলা চলে 'ছদ্মবেশী বাংলা'। বৈষ্ণব পদকার জ্ঞানদাসের ভাষা সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন' যেমন বলেছিলেন—'জ্ঞানদাসের হিন্দী মিশ্রিত বাংলা ছদ্মবেশী বাংলা' (১২৮০, মাঘ : জ্ঞানদাস), এ হল তাই। গৌড়ী গিরিজায়া গাইলেও

এ গান একেবারে খাঁটি বাংলা নয়। আবার বাঙালীর অপরিচিতও নয়। পদকার রাখতে চান রহস্যের আবরণ। তাই তাঁর ভাষার এই ছদ্মবেশ ধারণ।

গুরু মাধবাচার্যের অভিসন্ধিতে অজ্ঞাতবাসে বাধ্য হয়ে লুকিয়েছিল মৃণালিনী। হেমচন্দ্র তারই সন্ধানে প্রেরণ করেছেন তাঁর গানের দূতী গিরিজায়াকে। বিরহী হৃদয়ের ব্যাকুলতায় গড়া এই গানের আকর্ষী দিয়েই অবশেষে বৈষ্ণবী নাগাল পেয়েছে সেই হেমপ্রিয়ার। এই সঙ্গীতের ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয় মৃণালিনী। তার অজ্ঞাতবাসের অবরোধ পার হয়ে ভিখারিনীর সঙ্গে আলাপ শুরু করে।

কৌতূহলী মৃণালের প্রশ্ন :—'তুমি গীতসকল কোথায় পাও ?'

গি। 'যেখানে যা পাই তাই শিখি।'

গান গাওয়া ভিখারিনীর গানের ঝুলি কেমন করে ভরে ওঠে, বঙ্কিম যেন জানাতে চান সে কথাও। হাটে মাঠে বাটে গান গেয়ে ফেরা বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা আদি কাল থেকেই বাংলার সেরা গীত-সংগ্রাহক।

'মৃ। এ গীতটি কোথায় শিখিলে ?

গি। একটি বেণে আমাকে শিখাইয়াছে।

.. ..

মৃ। সে বণিক কিসের বাণিজ্য করে ?

গি। সবার যে ব্যবসা, তারও সেই ব্যবসা।

মৃ। সে কিসের ব্যবসা ?

গি। কথার ব্যবসা।

মৃ। এ নূতন ব্যবসা বটে। তাহাতে লাভালাভ কিরূপ ?

গি। ইহাতে লাভের অংশ ভালবাসা, অলাভ কোন্দল।

মৃ। তুমিও ব্যবসায়ী বটে। ইহার মহাজন কে ?

গি। যে মহাজন।

মৃ। তুমি ইহার কি।

গি। নগদা মুটে।

মৃ। ভাল তোমার বোঝা নামাও। সামগ্রী কি আছে দেখি।

গি। এ সামগ্রী দেখে না শুনে।

মৃ। ভাল—শুনি।'

গিরিজায়া আবার শোনায় গান পরপর দুখানি। প্রথমে গায়—

'যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল।

ঝাঁপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কতূহলে, যে রতনে।
নিদ্রার আবেশে মোর গৃহেতে পশিল চোর,
কণ্ঠের কাটিল ডোর মণি হরে নিল।'

এ গানে নিহিত আছে হেমচন্দ্রের পরিচয় প্রমাণ। একদিন হেম জলমগ্না মৃণালিনীকে উদ্ধার করে বাঁচিয়েছিলেন। সেই তাঁদের প্রথম পরিচয়, পরে অনুরাগ ও শেষে আকস্মিক ভাগ্য বিপর্যয়ে তাঁদের বিচ্ছেদের কথা সংক্ষেপে ধরা আছে এই পদে।

দ্বিতীয় গানে রয়েছে মৃণাল-হারা হেমের উদ্‌ভ্রান্ত দশার কাহিনী—

'ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি ফিরনু বহু দেশ।
কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজ বেশ॥
হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি।
সোহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি॥'

এই গানের অভিঘাতেই খুলেছে আত্মসংবৃত মৃণালিনীর গোপন ব্যথার উৎসমুখ। অবারিত হয়েছে তার রুদ্ধ হৃদয়। ভিখারিনীর কাছে মন উজাড় করে জানিয়েছে তার জীবন-মনের খবর। গানেরই মারফতে দিয়েছে নিজের সন্ধান।

'কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে॥
রাজহংস দেখি এক নয়ন রঞ্জন।
চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন॥
বলে, হংসরাজ, কোথা করিবে গমন।
হৃদয় কমলে মোর, তোমার আসন॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয় কমলে।
কাঁপিল কণ্টকসহ মৃণালিনী জলে॥
হেনকালে কালো মেঘ উঠিল আকাশে।
উড়িল মরাল রাজ মানস বিলাসে॥
ভাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগভরে।
ডুবিল অতল জলে, মৃণালিনী মরে॥'

সংস্কৃত নাটকের গানে[১৪] যেমন তির্যক প্রাণীর রূপকচ্ছলে নায়ক নায়িকার সুখ দুঃখ বা প্রেমের ছবি আঁকা হয় ঠিক সেই কৌশলে বঙ্কিম জনমদুঃখী

মৃণালিনীর ক্ষণিক প্রেমের সুখ ও বিচ্ছেদের নিদারুণ দুঃখের ছবিটি গানেই পরিস্ফুট করতে চান।

এই দুঃখের পাঁচালী গান মৃণালিনী তার বুক নিঙড়ানো 'চোখের জলটুকু শুদ্ধ' গিরিজায়াকে শিখিয়েছে। যেন দূতী এ গানের মর্মস্পর্শী আবেদন যথাযথভাবে হেমের কাছে পেঁছে দেয়। কিন্তু এ গান তাকে শেখাতে হয়েছে সন্তর্পণে। আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ ও তার কন্যা মণিমালিনীর কান বাঁচিয়ে। গানটি শেখানোর বিষণ্ণ আদ্র' মুহূর্তটুকু শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মণিমালিনী শুধায়—'সই, ভিখারিনীকে কানে কানে কি বলিতেছিলে?' মৃণালিনী উত্তর দেয় গান গেয়ে—

'কি বলিব সই—
সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই —
কানে কানে কি কথাটি ব'লে দিলি ওই ॥
সই ফিরে ক'না সই, সই ফিরে ক'না সই।
সই কথা কোস্ কথা কব নইলে কারো নই ॥'

এ গানের ভিন্ন সুর, মেজাজ, ভাব, ভাষায় নিমেষে বদলে যায় একটু আগের 'কণ্টকে গঠিল বিধি'র বিষণ্ণ ভারী আবহ। রহস্যপ্রিয় লোককবির গানের মতো যমক অনুপ্রাসের কোমল করতালির হাল্কা নাচনী চালে আর চপল ঝুমুর সুরে চাপা বেদনার গুমোট মেঘ সরে যায়। ঝিকিয়ে ওঠে এ গানে স্বস্তির প্রসন্ন রোদ।

মৃণালিনীর স্বস্তি—হেমচন্দ্রের সন্ধান জেনে, আনন্দ—প্রিয়ের সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের সুযোগ পেয়ে। এই দুয়ে মিলেই তার মন হয়ে গেছে নির্ভার, খুশী চপল। তবুও গানের ভেতরের আড়াল সে ভাঙেনি। মনের আসল কথা-প্রিয়ের জন্যে ব্যাকুলতা মৃণালিনী মনে মনেই যে সইছে। মণিমালিনীকে সে কথা তো জানাবার নয়। এ গান আসলে গিরিজায়ার উদ্দেশ্যেই গাওয়া। মৃণালিনীর মনের কথা গিরিজায়া যেন হেমচন্দ্রের কাছে ফিরে গিয়ে বলে ও আবার তাঁর বারতা ফিরিয়ে নিয়ে আসে। যদি আসে নিয়ে তবে জবাবও মৃণালিনী দেবে।

'মৃণালিনী'র এই হ্রস্ব পরিচ্ছেদের পাঁচটি গান সখী মারফত তত্ত্ব বা সংবাদ কেনা বেচারই গান। প্রথম দুই রহস্যগীত 'মথুরবাসিনী' ও 'যমুনার জলে মোর' পদ দুটির ফাঁকে রয়েছে যে নাট্য সংলাপ তা পালা কীর্তনের-পদগানের ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশিত গদ্যসংলাপ আখরের মতো রসরহস্য ঘনিয়ে তুলেছে। আসর জমাটি কীর্তনিয়া গানের মাঝে মাঝে রহস্যোমোড়া সংলাপ

ব্যবহার করে রস জমিয়ে তোলেন ও সেই সঙ্গে মূল পালার মর্মকথার চাবিকাঠিটির হদিশ দেন। এই সংলাপধর্মী আখরকে বলা হয় পালাগানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বার্তিক-আলোক সূত্র বা তুক্।

'মৃণালিনী'র সখী-সংবাদ পালার ঐ নাটকীয় রহস্যালাপ বঙ্কিমের নতুন গানের পালার গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরই বার্তিক বা আলোক সূত্র।

মৃণালিনী বলেছিল, গিরিজায়ার 'বণিক মহাজন'। তিনি 'নূতন ব্যবসা' শুরু করেছেন। তাঁর 'সামগ্রী' 'দেখার' নয় 'শোনার'। বঙ্কিমও যে তাঁর সাহিত্যের হাটে নতুন উদ্যোগে নেমেছেন। বিদ্যাপতি চন্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রমুখ মহাজন পদগীতিকারদের 'মুটে'গিরি দিয়েই তাঁর এই 'নতুন ব্যবসা'—গান বাঁধার নতুন প্রচেষ্টার শুরু। পদগীতিকারদের মতোই এ গীতিব্যবসার মূল 'সামগ্রী' কথা। কথাই তাঁর সব ভাবনার বাহন। এই কথার ভারে ক্রমশ ভারী হবে তাঁর বোঝা। আর সে বোঝার ভার গীতপসারী হয়েই বঙ্কিম তাঁর সৃষ্টির আঙিনায় বিকিয়ে ফিরবেন। ফিরবেন তাঁর সহৃদয় গ্রাহকের কাছে। রহস্যে মোড়ানো তাঁর সে সব মনের কথা কানে কানে গানে গানেই শোনাবেন এখন থেকে।

উনিশ শতকের ধ্রুপদী রাগসঙ্গীত চর্চার গমগমে আবহাওয়ার মাঝখান-টিতে বসে বঙ্কিম মনে মনে বড় একা হয়ে অন্য ভাবনায় উন্মনা ছিলেন। মনের মধ্যে মন লুকিয়ে সইছিলেন অনেক না-বলা উথাল-পাথাল কথা। জীবন ও সমাজ ভাবনার সঙ্গে জড়িত প্রেম ভাবনা, স্বদেশ ভাবনা ও সেই সঙ্গে বাংলার নিজস্ব গানের ভাবনা তীব্র উচ্ছ্বাসে ফেনিয়ে উঠে প্রকাশ বেদনায় তাঁর মনের মধ্যে গুমরে মরছিল। মনুস্মৃতি শাসনের দাপটের যুগে, বৃটিশের রাজদণ্ডের প্রতাপের যুগে, রাজা ও বাবু-সংস্কৃতির উন্নাসিকতা ও অবক্ষয়ের যুগে মনের কথা মনে না সয়ে বঙ্কিমের উপায় ছিল না। তাই মৃণালিনীর মতো মূক বেদনার কাঁটায় কেবলই মরমে পীড়িত হচ্ছিলেন। মৃণালিনীর গাওয়া মাত্র দুটি গান 'কণ্টকে গঠিল বিধি' ও 'সই, মনের কথা সই'-এর শ্লিষ্ট বাচনের আভাসে বুঝি বা ছিল তারই ইঙ্গিত। অবশেষে মৃণালিনীব মতোই বঙ্কিম মনের কথা উজাড়ের কূট কৌশল খুঁজে পেলেন। গানই হল তাঁর 'মনের কথা'র অন্যতম বাহন। আত্মপ্রকাশের এই আনন্দেই লোকগানের প্রাচীন ঝুমুর সুরে মুখর বঙ্কিম গাইলেন—'কি বলিব সই—সই মনের কথা সই।'

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রকার মতঙ্গ মুনি গানকে বলেছেন 'অন্তরভাষিকা'। তানসেনের কাছে তাঁর ধ্রুপদ হল 'অন্তর্বাণী'। ('তানসেন অন্তর্বাণী ধ্রুপদ ফুকারে'।) বঙ্কিমের কাছে তাঁর গানই 'অব্যক্ত' বা 'মনের কথা', 'মরম কথা'।

রাগাশ্রয়ী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে মনের কথার আশ্রয় নিছক সুর। কিন্তু বাঙালির নিজস্ব গানে সুরের স্রোতে বাণীর ভেলায় অনির্বচনীয় ভাব ও নিবিড় ভাবনা বাঙ্ময় হয়েছে। বাঙালির গান তাই একাধারে গীত ও কাব্য। বঙ্কিম তাঁর 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে (১৮৭৬) গানের এই বাচ্যার্থ বা শব্দ গুরুত্ব ও কাব্যমূল্যকে স্বীকৃতি দিয়ে গীত ও গীতিকাব্যের মিলন ও বিরহ বিন্দুটি নির্ণয় করেছেন। উদাহরণ দিয়েছেন বাঙলার আদি গীত ও গীতিকাব্যের।

'অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক।

'গীতের পারিপাট্য জন্য আবশ্যক দুইটি—স্বর চাতুর্য এবং শব্দ চাতুর্য। এই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সু-গায়ক, ইহা অতি বিরল।

'কাজে কাজেই একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতি কাব্যের আদিম উদ্দেশ্য।'

'স্বরচাতুর্য' এবং 'শব্দচাতুর্যে'র হরগৌরী মিলনে গড়ে ওঠা বাংলা গান সম্পর্কেই ১৯৩২-এ রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> বাংলা দেশে সঙ্গীতের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান, অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ।

বাংলার গানের নানা শাখার উদাহরণ দিয়ে তিনি এই বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন ১২৯৯-এ লেখা 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' নিবন্ধে—'কথাকে সামান্য উপলক্ষমাত্র করিয়া সুর শোনানোই হিন্দিগানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য। কবির গান, কীর্তন, রামপ্রসাদী গান, বাউলের গান প্রভৃতি দেখিলেই ইহার প্রমাণ হইবে।' (র. র. জন্মশত সং ১৪ পৃ. ৯৯৮)

বঙ্কিম তাঁর বক্তব্য উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করেছেন নিজের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। 'মৃণালিনী'তে। দেখি 'মনের বেগ প্রকাশের আতিশয্যে' হেমচন্দ্র শব্দচাতুর্যে পদ গেঁথেছেন। আর সেই পদ বৈষ্ণবী গিরিজায়ার 'দিব্য গলার' স্বরচাতুর্যে হয়ে উঠেছে 'মধুর সঙ্গীত'।

গীতিকাব্যরূপে গীতের ঐতিহ্য বাংলা প্রাচীনকাল থেকে বহন করেছে। বাংলা গানের জন্মই সাহিত্যগত বাণীর ঐশ্বর্য নিয়ে। বিদ্যাপতি ও তাঁর ধারাগামী মহাজন বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্য দিয়ে, কীর্তনিয়াদের কণ্ঠে কণ্ঠে তার

আদি ও বিচিত্র প্রকাশ। সে গান রাগ ঐশ্বর্যে সুর বৈচিত্র্যে বিভিন্ন ভাব ব্যঞ্জনায় নাট্যাবেগে ছিল সু-সমৃদ্ধ। তা একই সঙ্গে স্পর্শ করেছিল অভিজাত বিদগ্ধ জন ও লোকায়ত সামান্য জনের গভীর হৃদয়। এই গানই ছিল উচ্চ নীচ দুই বিপরীত বর্গের সেতুবন্ধনের মতো। আবার বাঙালীর নিজস্ব উচ্চাঙ্গ গান কীর্তনের পাশেই সহজ প্রবাহে বয়েছে লোকজ গানের ধারা। ভাব প্রকাশের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ভাষার সারল্যে সে গানেরও ছিল বিশেষ সৌন্দর্য, আবেদন। ভাবপ্রবণ বাঙালী এই দুই ধারার গানের মধ্যে দিয়েই ভাবমোক্ষণ ঘটিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। এইসব বিশেষ কথাই বঙ্কিম 'মৃণালিনী'র গানে গানে সহৃদয় সামাজিকের কাছে তুলে ধরেছেন।

বঙ্কিমের সেই গীত-সময় ছিল 'এলিটিস্ট'দের ধ্রুপদী গানের বন্দনার যুগ। উইলিয়ম জোনসের মতো ভারত সংস্কৃতির বোদ্ধারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রশস্তি করায়[১২] এবং লোকগানের অশ্লীলতায় বিরক্তি প্রকাশ করায় অভিজাত দেশী বিদগ্ধদের দৃষ্টি বাংলার দেশী গান বা 'নেটিভ মিউজিকে'র প্রতি নিবদ্ধ হয়নি। বঙ্কিমই প্রথম বাংলার নিজস্ব গানে কৌতূহলী ও মনোযোগী হলেন।

'মৃণালিনী'তে বঙ্কিম প্রথমে দিলেন বাংলার নিজস্ব উচ্চাঙ্গ গান কীর্তনের উদাহরণ। বাংলার আদি গীতিকার বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষায় ভঙ্গিতে গান বেঁধে সেই গীতাকর্ষী দিয়ে সম্ভ্রান্ত এলিটিস্টদের মন প্রাণ তিনি টেনে আনলেন। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদী গীতঘোরের অবরুদ্ধ কক্ষ থেকে শিক্ষিতদের বের করে এনে তাঁদের হাজির করলেন বাংলা গানের খোলামেলা সুবিস্তীর্ণ আঙিনাটিতে। গৌড়ী বৈষ্ণবী গিরিজায়া মথুরাবাসিনী মৃণালিনীকে গীতোৎকর্ণ করে তাকে বাধ্য করেছিল ভিখারিনী গায়িকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে। বঙ্কিম সেই ভাবেই সেকালের শিক্ষিত অভিজাতকে বাধ্য করলেন তাঁদের শিক্ষা ও সভ্যতার অভি-মানের অবরোধ ডিঙিয়ে ভিখারিনী দেশী গানের সঙ্গে চেনা পরিচয়ে সমুৎসুক হতে।

'মৃণালিনী'র প্রথম খণ্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদের নামই 'ভিখারিনী'। সম্ভ্রান্তের বৈঠকে "ভিখারিনী" দূতী গিরিজায়াকে দিয়ে বঙ্কিম পেশ করালেন বর্তমান ভিখারিনী কিন্তু একদা ঐশ্বর্যময়ী বাংলা গানের বা নেটিভ মিউজিকের দুই ধারার নমুনা। ধ্রুপদী বাংলা বা কীর্তন, দিশি বাংলা বা উদাসী বাউল বৈরাগীর হাটে মাঠে ফেরা লোকগান। এই দুই ধরনের গান বাঁধবার উপযুক্ত পরিস্থিতি বঙ্কিম নিজেই কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে গড়ে নিলেন। খাঁটি বাংলা গান কেন কথা চেয়েছে, মনের বেগ প্রকাশের জন্য কেন বিশেষ বিশেষ সুরে

'শব্দচাতুর্যে'র সংযোগ ঘটিয়েছে তার প্রমাণ ব্যাখ্যায় তিনি রচনা করলেন হেম-মৃণালিনীর প্রেমের পালা।

'মৃণালিনী'র নায়ক হেমচন্দ্র গানের দৌত্যে খুঁজে ফিরেছেন হারানো প্রণয়িনীকে, বঙ্কিমও তেমনি আকুলতায় খুঁজেছেন তাঁর প্রিয় বাংলার হারানো দিনের গান। অনাদি পুরুষ প্রকৃতির চিরন্তন বৃন্দাবন লীলা আশ্রয় করে বিদ্যাপতির পদাবলী কীর্তন বাংলা গানের যে ঐশ্বর্যময় যুগের সূচনা করেছিল বঙ্কিম তারই জন্যে যেন স্মৃতি বেদনায় মথিত হয়ে গেয়েছেন তাঁর 'মথুরবাসিনী' গান। সেই গীতসম্পদ যে ঐতিহ্য বিস্মৃত বাঙালী নিজের দোষেই হারিয়েছে। তারই আভাস বুঝি 'যমুনার জলে মোর' গানের আখরে।

'নিদ্রার আবেশে মোর গৃহেতে পশিল চোর
কণ্ঠের কাটিল ডোর মণি হরে নিল।'

একদিকে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত চর্চার জোয়ার আর একদিকে যাত্রা কবি-ওয়ালাদের স্থূলে প্রেমের নিম্ন রুচির গানের শোরগোল। এই দুয়ের মাঝে বসে বিষণ্ণ বঙ্কিম দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখের কাব্য প্রতিভায় উজ্জ্বল 'সা মধু যামিনীর' জন্যে।

'মৃণালিনী' গ্রন্থ নামেই ছিল বৈষ্ণব পদাবলীর অনুষঙ্গ। স্মরণীয় পদকর্তা শ্যামাদাস ও অনন্তদাসের দুটি গীত পংক্তি।

'হেম-কমলিনি সঞে নীলকমল জনু
ভাসই যমুনা তরঙ্গে।'

এবং

'যৈছে যমুনাক মাঝে বিহরই
কনকময় মিরিণাল রে।'

হেম-মৃণালিনী ও দূতী গিরিজায়াকে ঘিরে বঙ্কিম নব প্রেমাভিসারের গাথা রচনা করেছিলেন। করেছিলেন 'বিরহ' 'সখী সংবাদের' নব রূপায়ণ।

বিদ্যাপতির অনুসরণে ব্রজবুলির ভাষায় বৃন্দাবনী সুরের আবহ ঘনিয়ে বঙ্কিম হেম-মৃণালের প্রেম আকুলতার গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুনিয়েছেন আমাদের। এই প্রেমই বঙ্কিমের যাবতীয় সৃষ্টি কথার ধ্রুব সঙ্গীত। চিরন্তন পুরুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে সংসারে যে প্রেম 'ঘর কৈল বাহির বাহির কৈল ঘর'—সেই প্রেমকেই বঙ্কিম এখন থেকে তাঁর পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টিতে নানান ঘটনা পরিস্থিতি চরিত্র সংঘাতের শাণযন্ত্রে ফেলে ছিলে-কাটা হীরের মতো বহুমুখী ও বর্ণময় করে তুলবেন। স্বদেশ ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে ক্রমে এই

প্রেমকেই তিনি দেবেন অন্য এক বৃহৎ মাত্রা।

মৃণালিনীর সহজ প্রেমে দৈব-দুর্বিপাকে ঘটনাচক্রে ঘনিয়েছে কুটিল আবর্ত। মৃণাল হেমের জীবনে এসেছে বিচ্ছেদ, হতাশা, দুঃখ, ভ্রান্তি, প্রত্যাখ্যানজনিত বেদনা। তৈরী হয়েছে আত্মিক সংকট, সেই সঙ্গে গীতোচ্ছ্বাসের উপযুক্ত পরিস্থিতি। এই উপন্যাসেই বঙ্কিম প্রমাণ করেছেন 'সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।' (সঙ্গীত, ব. র. ২য়, পৃ ২৮৫)

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছিলেন—'যখন হৃদয় কোনো বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্য প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয় মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। সত্য বটে যে, গীতিকাব্য লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে। নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়, কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অবক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।' (গীতিকাব্য, ব. র. ২য়, পৃ ১৮৭)

তাই 'মৃণালিনী'র নাট্যপ্রতিম পরিচ্ছেদে সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে অনিবার্য-ভাবে বয়ে গেছে গীতোচ্ছ্বাস।

'মৃণালিনী'র চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'দূতী'। এখানেও ভেসে এসেছে পূর্ব পরিচ্ছেদ 'ভিখারিনী'র গানের ঢেউ। দূতীর প্রতীক্ষায় অধীর হেমচন্দ্র মানসিক অস্থিরতা উপশমের জন্যে ভাঁজেন তাঁর প্রিয় গানের কলি 'বিকচ নলিনে যমুনা পুলিনে বহুত পিয়াসা রে'। এর পরের কলিটি মুখে নিয়েই সু-স্মিতা দূতী গিরিজায়া ফেরে মৃণালিনীর সংবাদ নিয়ে। এ অধ্যায় ও পালাকীর্তনের মহাজনী রহস্যালাপের মতো সরস ও মধুর সংলাপে গাঁথা। হেমচন্দ্র প্রেমতিয়াষী নায়ক। গিরিজায়া যেন তাঁর রহস্যময়ী বৃন্দাদূতী। প্রিয়ার সংবাদের আশায় উৎকণ্ঠিত রাজপুত্র হেম সামান্যা এক ভিখারিনীর কৃপা-ভিখারী। গিরিজায়া উৎসুক হেমের কাঙ্ক্ষিত কথা এড়িয়ে গানে গানে শুধু তাঁর উৎকণ্ঠার মাত্রা বাড়িয়েছে, তাকে উত্তেজিত করেছে। আবার গান গেয়ে সে উত্তেজনা প্রশমনও করেছে। মৃণালিনীর শেখানো গান 'কণ্টকে গঠিল বিধি' যথাযথভাবে শুনিয়ে হেমের তৃষ্ণা সে মিটিয়েছে। হাস্য পরিহাসে রঙ্গে রসে মাতিয়ে তোলা রসবতী এই

রমণীর অন্তরে যে লুকিয়ে আছে এক গভীর দরদী ও ভাবুক সত্তা। তাই মৃণালিনীর ব্যথার ব্যথী হয়ে সে গান করে আপন ভাবাবেগে।

'যে ফুল ফুটিত সখি, গৃহতরু শাখে,
কেন রে পবনা, উড়ালি তাকে।'

হেম-মৃণালের শেখানো কুশল কেনাবেচার গান নয় এ। এই আকুলতার গান গিরিজায়া গেয়েছে নিজের পরদুঃখকাতর অন্তরের সহজ তাগিদে। মন-উদাস-করা এই মরমিয়া গানে নেই মথুরা কিংবা মগধজনোচিত বিদগ্ধ ভাষার পরিশীলন। সহজ লোকভাষায় স্বতোচ্ছ্বাসে ঝরেছে এক ভাবদরদী মনের আকৃতি ও করুণা।

'পরদুঃখাসহ করুণা'। পরদুঃখকাতরতাই করুণা। এই করুণাই একদিন ভিখারিনী গিরিজায়ার সঙ্গে হেমপ্রিয়া মৃণালিনীর প্রাণসখিত্বের ডোর রচনা করবে। বঙ্কিম গিরিজায়াকে করবেন মুগ্ধা নায়িকার সার্থক মঞ্জরী।

শুধু তাই নয় এখন থেকে গিরিজায়া নাট্য-বিবেক ও নিয়তির রূপ নেবে। তার প্রতিটি গানই হবে নাট্যব্যঞ্জনাময়।

যে মৃণালিনীর হেমচন্দ্রের নিভৃত সংসারের সুখী গৃহকোণে শোভমানা হবার কথা আজ সে বিধির দোষে স্বদেশ স্বগৃহ ছেড়ে বিদেশে অজ্ঞাতবাসিনী। আবার এই অজ্ঞাতবাসের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ও সে হারাবে। ব্রাহ্মণ হৃষীকেশের গৃহ থেকে সে বিতাড়িত হবে পরের অধ্যায়ে। তখন তার দশা হবে 'বিপথে পড়িল যৈছে মালতীর মালা।' কিন্তু সেই মালাগাছি সযতনে কুড়িয়ে নেবে এই ভিখারিনী গিরিজায়া। নিয়ে এ মালা যার কণ্ঠহার তারই সন্ধানে তরণী ভাসাবে ওই করুণাময়ী। তার পবনে ওড়া ফুলের গানে তাই রয়ে গেল ভাগ্য-তাড়িত মৃণালিনীর ভাসমান জীবনের আগাম আভাস dramatic irony র মতো।

এই খণ্ডের শেষ অধ্যায়ের সমাপ্তিতেও রয়েছে উড়ে চলার গান। মৃণালিনী তো ভেসেছেই, স্বেচ্ছাসাথী তার গিরিজায়া। কণ্ঠে যার 'দুঃখ সুখের সাথী সঙ্গী দিন রাতি' অবিরাম সঙ্গীত।

এখন সে শোনায় চাতকিনীর আশা জাগানিয়া গান :

'মেঘ দরশনে হায় চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে রে, তোরা আয় আয় আয় রে॥
মেঘেতে বিজলী হাসি আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে॥'

এ গান হল কালো রাতের বুক চিরে গাওয়া অরুণোদয়ের আভাসবাহী

'প্রভাতী'। শেষরাত্রির প্রগাঢ়তম প্রহরে আলো ফোটার আশ্বাস দিয়ে দিবসের সুখধ্বনি জাগিয়ে গাওয়া বৈষ্ণব কণ্ঠের 'প্রভাতী' গান একদা বাংলাদেশে বড় জনপ্রিয় ছিল। প্রিয় ছিল বঙ্কিমেরও। পূর্ণচন্দ্রের স্মৃতিসাক্ষী—মাঘ মাসের রাত্রিশেষে এক বৈষ্ণব খঞ্জনী বাজিয়ে 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে' পদটি রোজ গেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাড়ির সদর রাস্তা ধরে ঠাকুরবাড়ি যেতেন। পূর্ণচন্দ্র লিখছেন—'কয়েক রাত্রি ধরিয়াই তিনি (বঙ্কিম) গানটি শুনিলেন। ইহার পর অষ্ট প্রহর এই গীতটি তাঁহার মুখে শুনিতাম।'

স্মৃতিতাড়িত এই স্তোত্রপদ বঙ্কিম ব্যবহার করেছেন 'আনন্দমঠে' (১৮৮২)। আর তার প্রভাতফেরীর সুরছন্দে ও ভাব ব্যঞ্জনায় বুঝি বেঁধেছিলেন মৃণালিনী'র এই 'মেঘ দরশনে হায়' গান।

গভীর রাতে গৃহ বিতাড়িত মৃণালিনীর সঙ্গে সাক্ষাতে আসা গিরিজায়া গায় এই গান। মৃণালিনী সেই রাতটুকু পোহানোর আশায় হৃষীকেশের গৃহে স্থান প্রার্থনা করেছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 'কালি প্রাতে যাইব'। কিন্তু কোথাও যাবার স্থান তো তার ছিল না। প্রগাঢ় রাত্রির মতোই সম্মুখে তখনও যে ঘন আঁধার; অনিশ্চিত জীবনের, অনির্দেশ আশ্রয়ের, অসহায় ভাগ্যের। গিরিজায়া এল তার মেঘ-ঘনিয়ে-আসা জীবনের কাণ্ডারী হয়ে। মুখে তার আশ্বাসের বাণী, কণ্ঠে আশার সুর। দুর্যোগের ঘনঘটা এখন পরিপূর্ণ; বরিষণ আসন্ন; কিন্তু চাতকিনীর তৃষ্ণা তো মিটবে। এই মুক্তির ফলে হেমচন্দ্রের সঙ্গে মিলনের সুযোগ এবার মৃণালিনীর মিলবে। হেমচন্দ্রের দর্শনতিয়াষী মৃণালিনীর অভিসার যাত্রা শুরু হবে এবার সেই 'দূতী' বৈষ্ণবীকেই সহচারিণী করে।

দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'নৌকাযানে' নদীবক্ষে এই দুই কূল সন্ধানী রমণীকে দেখা যায়। গীতপ্রাণা গিরিজায়ার মুখে শুনি মৃণালিনীরই অন্তরবাণী।

> 'চরণতলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন।
> দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন॥
> এ রতন সমতুল, ইহা তুমি দিবে মূল,
> দিবা নিশি মোরে নাথ দিবে দরশন॥'

বঙ্কিম বজায় রাখতে চান মৃণালিনীর 'অভিজাত সম্বরণ'।[১৭] তাই এই ভাগ্যবিমূঢ়া নারী সুমিতভাষিণী। নিদারুণ উৎকণ্ঠা, আকুলতা, খেদ, আক্ষেপ, আশাভঙ্গ, মর্মপীড়া ও প্রেমিকের নিষ্ঠুরতায় মরণান্তিক যন্ত্রণায় কাতর

মৃণালিনীর আত্মপ্রকাশকে গীতোচ্ছ্বাসেও তরল করা বঙ্কিমের অভিপ্রায় নয়। তার প্রাণের গোপন কথা শোনায় গিরিজায়া। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'[১৮] কালিদাস দূতীর স্বভাব উল্লেখ করে বলেছিলেন, তারা প্রেমিকার মনের কথা জেনে কথা বলে। সেই স্বভাবেই সিদ্ধ বঙ্কিমের গিরিজায়া, তাই নায়িকার আত্ম নিবেদনের আকাঙ্ক্ষায় গাওয়া 'চরণ তলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন' অথবা তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে খেদে আকুলতায় গাওয়া 'কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান' ও হতাশার গান—'এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে' ; এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে মর্মন্তুদ বেদনার আর্তি 'পরাণ না গেল' গিরিজায়ার কণ্ঠোৎসারিত। এ গান সে তার প্রাণসখির বুক নিঙড়োনো 'চোখের জলসুদ্ধুটুকু' গেয়েছে ; নিজেরই অন্তরত্যাগিদে।

'চরণতলে দিনু হে শ্যাম' গানে রয়েছে মৃণালিনীর প্রেমের প্রকৃতির পরিচয়। তার প্রেম অমলিন ও চিরন্তন। 'মিছার যৌবন' সর্বস্ব নয়। হৃদয়গভীর মূলেই এর স্থিতি। প্রাণসখিরই আত্মার প্রার্থনায় গিরিজায়ার তাই আবেদন, 'হে প্রেমিক, রতনের মতো মহার্ঘ সেই হৃদয়ের মূল্য তুমি দিও।'

'এ রতন সমতুল ইহা তুমি দিবে মূল।' 'দিবে' গিরিজায়ার এই বিশ্বাস, অনুরোধ আবার অনুজ্ঞা। 'মূল' শব্দ ও শ্লিষ্ট : মূল্য ও স্থায়িত্ব।

কিন্তু হেম কি এই বিশ্বাসকে মূল্য দেবে! খাঁটি রতন চিনতে তাঁর ভুল হবে না তো! একটা সংশয়ের কাঁটাও বোধহয় বিঁধেছিল গায়িকার অবচেতনে। শঙ্কার সুরে স্পষ্ট হল সেকথা পরের 'সাধের তরণী' গানে।

এ গানেও 'ঘন' এই মেঘের প্রতিশব্দ আবার ভেসে এসেছে। আছে এখানে অপ্রত্যাশিত দুর্যোগের আগাম সঙ্কেত।

'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছ কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে ॥
ভাসল তরী সকালবেলা, ভাবিলাম এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে ॥
এখন গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্গে।
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে ॥
যাহারে কাণ্ডারী করি সাজাইয়া দিনু তরী।
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে ॥'

বড়ো সাধ করে দুই রমণী ঘর ছেড়ে পথ ধরেছেন। মনে আশা মৃণালিনী তার কান্তের কমনীয় আশ্রয় পাবে। কিন্তু হেম-মৃণালের সহজ প্রেমের মিলনের কাঁটা হেমের গুরু মাধবাচার্য। হেমচন্দ্রের দুর্দমনীয় প্রেমাবেগ রোধ করার জন্যে এই আচার্যই তাঁর মনে ঢালবেন কুটিল সন্দেহ ও মিথ্যাপলাপের কূটবিষ। কান ভারীকরা মন নিয়ে হেম তাঁর মিলনোৎসুক প্রিয়ার সঙ্গে ব্যবহার করবেন ব্যাধের মতো। মৃণালিনীকে নিষ্ঠুর বাক্যবাণে নিপীড়িত করে ক্রোধের খড়্গে তাকে আহত করবেন। মৃণালিনী 'কুলটা', তাই হৃষীকেশের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের কূল ত্যাগ করেছে এই ভ্রমকেই হেম সত্য বলে মেনে নেবেন। আর তাই তাঁর শরণাগত, নিরাশ্রয়, অসহায় প্রিয়াকে রোষভরে পরিত্যাগ করতে তাঁর বিবেক কাঁপবে না। অবিশ্বাসী হেমের পাষাণ হৃদয়ের প্রতীক সরোবরের পাষাণ সোপানে রক্তক্ষরণ হবে মৃণালিনীর হেমচন্দ্রেরই দেওয়া নির্মম আঘাতে। এই আতঙ্কিত ঘটনা ঘটবে অচিরেই। হেমেই যার চিত্ত নিবেশিত হেমই যার নিত্য আশ্রয় সেই তার চির জনমের প্রিয়ার আত্ম নিবেদন মুহূর্তেই হেম তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন। শেষ মুহূর্তে কূল হারানোর এই 'আতঙ্গে'র পূর্বগামী ছায়া পড়েছে গিরিজায়ার মনে ও তাই গানে। স্নেহ যে পাপশঙ্কী।

গিরিজায়াকে বলেছিলেন মৃণালিনী—'এ কোন্ অ-প্রেমিকের গান?' অ-প্রেমিকের কাছে যখন সত্যিই মৃণালের এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো—তখনও তার অন্তরের সব কান্না ঝরিয়েছে গিরিজায়া গানে গানে।

গুরুবাক্যে ভ্রান্তি হয়েছিল হেমচন্দ্রের। মনোরমার সঙ্গে হেমকে একত্র দেখে বিভ্রান্তি হয়েছিল গিরিজায়ার। ভেবেছিল মৃণালের 'পিঞ্জরপক্ষী শিকলি কাটিয়াছে'। প্রিয়-সখির জন্যে বেদনায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে সে। সন্দেহ সংশয়ে আক্ষেপে হতাশায় গেয়েছে—

'কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজ কি কিশোর সই কাঁহা গেল ভাগই
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ॥
মিলি গেই নাগরী, ভুলি গেই মাধব,
রূপবিহীন গোপকুঙারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,
হেন বঁধু রূপকি ভিখারী॥
আগে নাহি বুঝনু রূপ দেখি ভুলনু
হৃদি বৈনু চরণ যুগল।

যমুনা-সলিলে সই, অব তনু ডারব,

আন সখি ভখিব গরল।

কিবা কানন বল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁধহু,

নবীন তমালে দিব ফাঁস।

নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপয়ি

ছার তনু করব বিনাশ।'

এই তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে গিরিজায়া আর একবার দূতীর ভূমিকায় গীতিমুখর। এবার তার গানে উৎকর্ণ হেম। হেমের প্রতি সন্দিগ্ধ গিরিজায়া গানের ভেতর দিয়েই হেমকে অভিযোগে বিদ্ধ করেছে সেই সঙ্গে জানিয়েছে মৃণালের হেম-সর্বস্ব প্রেমের কথা। মৃণালের অক্ষয় প্রেম এ জনমে যদি সার্থক নাও হয় জন্ম জন্মান্তরে হবেই। খাঁটি প্রেম ব্যর্থ হয় না। এই প্রত্যয় ও মিলন সাধ 'এ জনমের সঙ্গে কি সই' গানে।

'এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে।

কিবা জন্মজন্মান্তরে, এ সাধ মোর পুরাইবে॥

বিধি তোরে সাধি শুন, জনম যদি দিবে পুণ,

আমারে আবার যেন, রমণী জনম দিবে।

লাজ ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পুরাইব

সাগর ছেঁচে রতন নিব, কণ্ঠে রাখব নিশি দিবে।'

কিন্তু হেম গিরিজায়ার গানে মন দেননি। শুধু শুনেছেন তার মুখের কথা। তার মিথ্যা ভাষণ। মৃণালিনী অন্যের বধূ হতে চলেছে—এই কথা বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল গিরিজায়া। বিভ্রান্ত হেমের আচরণে ভ্রম হয়েছিল তার নিজের।

কিন্তু ভ্রান্তি হয়নি মৃণালিনীর। তার প্রেম যে ধ্রুবজ্যোতি।

হেমচন্দ্রের নিষ্ঠুর বাক্যবাণ 'কুলটার পত্র আমি পড়িব না'—নির্দয় আচরণ—মৃণালিনীর 'লিপিখানি না পড়িয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিলেন', মৃণালের কাছে 'সবিশেষ বিবৃত' করে গিরিজায়া। 'কিছু লুকাইল না।' কিন্তু কি তার সখির প্রতিক্রিয়া। 'নীরব মৃণালিনী রোদনও করিলেন না। যেরূপ অবস্থায় শ্রবণ করিতেছিলেন সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন।' প্রিয়জনের দেওয়া অপ্রত্যাশিত আঘাত তাকে করেছিল স্তম্ভিত। কিন্তু বেদনাহত সেই মূক নারীর হৃদয়ে যে নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ হচ্ছিল সখি গিরিজায়া শুনেছে তার পতনশব্দ। বিষাদময়ী পাষাণ প্রতিমাকে অন্ধকারে একান্তে রেখে তাই সে গীতি-বিলাপে

ঘটিয়েছে তারই সখির ভাবমোক্ষণ।

গিরিজায়া গাহিল—

'পরাণ না গেলো।

যো দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে,

গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,

ওঁহি পর পিয় সই, কাহে কালো নীরে,

জীবন না গেলো?

ফিরি ঘর আয়নু না কহনু বোলি,

তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আঁচোলি,

রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরানি,

তইখন না গেলো?

শুননু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,

রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে।

যব শুননু লাগি সই, সো মধুর বোলি,

জীবন না গেলো?

ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে,

লুটায়নু কাঁদি সই শ্যাম পদ মূলে,

সোহি পদমূলে রই কাহে লো হামারি,

মরণ না ভেল?'

ভিখারিনী বৈষ্ণবী তার প্রেম-ভিখারিনী 'পিয় সই'-এর হৃদয় গুহাশায়ী নিরুদ্ধ বেদনার সমস্ত আবেগ ও আকূতি আক্ষেপানুরাগের ভাষায় নির্বারিত করেছে। এ গান উচ্চাঙ্গ কীর্তন। 'সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ তানলয়বিশিষ্ট।' কমনীয় কণ্ঠ সম্ভূত সেই অপূর্ব সুধাসঙ্গীত 'স্বর্গচ্যুত স্বর সরিত্তরঙ্গস্বরূপ' মৃণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

বঙ্কিম স্মরণ করাতে চান সঙ্গীতের আছে হৃদয়দ্রাবী শক্তি ও পরমা পাবনী শক্তি।

পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত সুরেশ্বর মহাদেবের গীতকীর্তি। পুরাণ বলে, মহেশ্বরের সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ তানলয়বিশিষ্ট গানে বিষ্ণু অভিভূত হন। তাঁর অন্তর ও দেহসত্তা বিগলিত হয়ে জন্ম নেয় সুরধুনী। সুরজাত দৈবত সরিত্তরঙ্গ গঙ্গার তাই আছে পাবনী গুণ। আবার কমনীয় কণ্ঠসম্ভূত সপ্তস্বরা সঙ্গীত যখন ভাবোর্ধ্ব চিত্ত গগন থেকে ঝরে পড়ে তখন সেও লাভ করে সুরধুনীর পাবনী মহিমা।

বিষ্ণুর হৃদয়দ্রাবী গানই বৈষ্ণবসঙ্গীত 'কীর্তন'। এই কীর্তনের পাবনী মহিমার কীর্তন আছে সন্ত কবি তুকারামের একটি অভঙ্গে। তিনি বলেছেন, জাহ্নবী ধারা ভগবানের পাদপদ্ম থেকে উত্থিত হয়ে ধরাধামে নেমেছে। আর কীর্তন মানুষের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে ঈশ্বর পাদপদ্মে গিয়ে মিশেছে। উভয় ধারাই পতিত পাবনী। মানুষের হৃদয় পবিত্র করতে পাপরাশি ধৌত করতে কীর্তন গঙ্গার মতই ফলপ্রদ।[১৯]

বঙ্কিম এই কীর্তন গান শুনিয়েছেন এক বৈষ্ণবীরই কণ্ঠে। সেই পবিত্র গানের বিশেষণ দিয়েছেন 'স্বর্গচ্যুত স্বরসরিত্তরঙ্গস্বরূপ'। সে গান মৃণালিনীর মনের সব মলিনতা ধুইয়ে দেয়, সকল 'ক্লেশ উপশম করে'।

শঙ্কর মহাদেব সঙ্গীতের জন্ম দিয়েছিলেন কেন, এ প্রশ্নের উত্তর আছে 'সঙ্গীত দামোদর' গ্রন্থে। বলা হয়েছে—

সংসার দুঃখ দগ্ধানামুত্তমানামনুগ্রহাৎ
প্রভুনা শঙ্করেনাত্র গীতবাদ্যং প্রকাশিতম্ ॥[২০]

উত্তম সংবেদনশীলের দুঃখদগ্ধ চিত্তজ্বালা উপশম করার জন্যেই প্রভু শঙ্কর সঙ্গীতের জন্ম দেন। চিত্তে শমতা আনেন বলেই তো তিনি শঙ্কর। সঙ্গীতই সেই শান্তির বাহন।

শঙ্করের সঙ্গীতে পুলকিত মাধবের দেহমন বিগলিত হয়ে ঝরেছিল স্বেদ-অশ্রুধারা। গিরিজায়ার ভাবপ্লাবী সুরকারুণ্যে দ্রবীভূত হল মৃণালিনীর মর্মন্তুদ দুঃখে জমাট বাঁধা পাষাণবৎ চিত্তভার। বাঁধভাঙা অশ্রুধারায় তার সব ব্যথা নির্গলিত হল। গিরিজায়া স্বস্তি পেল সখির হৃদয়ভার লাঘব হল দেখে। বঙ্কিম জানেন, গভীর দুঃখ শোকের সঙ্কট মুহূর্তে বাক্যের শত অভিঘাতেও হৃদয় দুয়ার খোলে না, খোলে কেবল গানের চাবি দিয়ে। 'আনন্দমঠে'ও আছে এই দৃষ্টান্ত। মৌন মহেন্দ্র ভবানন্দর গানের অভিঘাতে মুখর হয়েছেন।

প্রাণ গলানো গানের সুরে নীরবতা ভঙ্গ করেছে মৃণালিনী। দুঃখ মালিন্য ঘুচে গিয়ে পুনর্মার্জিত হয়েছে তার চেতোদর্পণ। তাই হেমচন্দ্রের ভ্রান্তিজনিত সমস্ত আচরণ সে ক্ষমা করেছে শান্ত মনে।—'হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন, এ সংসারে অভ্রান্ত কে'? 'কিন্তু হেমচন্দ্র পাষণ্ড নহেন'! এই স্থির বিশ্বাসে সে সঞ্জীবিতও হয়েছে। তাই মৃণালিনী 'পরাণ না গেলো' গানের কাতরতায় বিমূঢ় হয়নি। অবশ্য বলেছে, যদি সত্যি প্রিয়ের আশ্রয় হারায় তবে মরণই হবে তার শেষ আশ্রয়।

কিন্তু গিরিজায়ার গানে প্রেমের আশ্রয় হারানোর বেদনায় বারে বারে ধুয়োর

মতো ফিরে এসেছে মৃত্যু প্রার্থনা। 'পরাণ না গেলো', 'জীবন না গেলো', 'মরণ না ভেল'—এই মৃত্যু ও মৃত্যুগন্ধী গরলের স্পষ্ট উচ্চারণ রয়েছে তারও আগের গানে—'জীয়ত মরত কি বিধান' 'টুটায়ল পরান', 'আন সখি ভখিব গরল' ইত্যাদি পদে।

গিরিজায়া যে নাট্যবিবেক, নিয়তি। তাই তার গান ভবিতব্যের সংকেত ঝরায়। এ গানও পরবর্তী অমঙ্গলের আভাস দেয়। মৃণালিনীর স্থির বিশ্বাস ভঙ্গ করে হেমচন্দ্র পাষণ্ডই প্রমাণিত হবেন। তাঁর অধরসমীপের প্রেমসুধার পাত্রে কূট সন্দেহ বিষের ছায়া ফেলে নিজেকে ক্রোধে ও প্রিয়াকে আঘাতে ক্লিষ্ট করবেন। পরের অধ্যায়ের নাম 'অমৃতে-গরল, গরলামৃত'। অমৃতে গরল হেমচন্দ্রের পক্ষে আর গরলামৃতের উদ্দিষ্ট পশুপতি।

'কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান', গানের মৃত্যু বিধানও পশুপতির জন্যেই নির্দিষ্ট আর 'জীয়ত মরত' তার সহমৃতা সহধর্মিণী মনোরমার ভবিতব্য।

বঙ্কিম নিজেই মৃণালিনীর সুখ-তারার সঙ্গে গৌড়ের সৌভাগ্যশশীর যোগসাধন করে এই প্রেমকাহিনীর সঙ্গে স্বদেশ-প্রেম-ভাবনার অন্বয় সূচিত করেন। 'ঊর্ণনাভ' পরিচ্ছেদে দেখি—

> যতক্ষণ মৃণালিনীর সুখের তারা ডুবিতেছিল, ততক্ষণ গৌড়দেশের সৌভাগ্যশশীও সেই পথে যাইতেছিল। যে ব্যক্তি রাখিলে গৌড় রাখিতে পারিত, সে ঊর্ণনাভের ন্যায় বিরলে বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার জন্য জাল পাতিতেছিল। (ব র ১ম. পৃঃ ২৩৯)

তাই 'সাধের তরণী' গানের কাণ্ডারী শব্দ পশুপতিরও অভিধা। তাঁরই বিকল চিত্তের সিদ্ধান্তে জন্মভূমির স্বাধীনতার ভরাডুবি হবে। তাঁরই লোভ ও আত্ম-পরতায় দেশলক্ষ্মী হবেন বিপন্ন। শুধু তাই নয় বিপন্ন হবে তাঁর নিজের অস্তিত্ব। জেনে শুনে তিনি আপন হাতে 'হলাহল কলস পরিপূর্ণ করবেন। স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করবেন। 'আন সখি ভখিব গরল'—তাঁর হয়েই নিয়তিরূপী গিরিজায়া শোনায় এই মরণ সঙ্গীত। অথচ পশুপতির সাধ্বী পত্নী মনোরমার শ্রেয়োপদেশ গ্রহণে জীবনে সহজ ছিল অমৃত চয়ন। সর্বনাশা পরিণতি থেকে তাহলে রক্ষা পেত ঐ দম্পতী ও দেশলক্ষ্মী। কিন্তু দুই দুর্ভাগা নরনারীর নিয়তি নির্দেশে অমৃত সম্ভাবনা নিঃশেষে মুছে গেল। মুছে গেল উভয়েরই গরল রসের স্বেচ্ছাপানে। অপঘাত ও অকালমৃত্যু গ্রাস করল পশুপতি ও মনোরমাকে। মৃত্যু হল দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার আশার।

'মৃণালিনী' মিলনান্তক উপন্যাস। কিন্তু আশাহীনতা ও বেদনার, খেদ ও

আক্ষেপের একটি করুণ সুর হেম-মৃণালের মিলন কথায় সর্বত্র সঞ্চারী। 'পরাণ না গেল'র বিষাদ-মূর্ছনা নাট্য ব্যঞ্জনায় উপন্যাসের সমাপ্তিতেও ছড়িয়ে পড়ুক এই ছিল কাহিনীকারের গোপন অভিপ্রায়। তাই 'মৃণালিনী'র শেষ গান 'পরাণ না গেল'।

নৈরাশ্য ও বিরহবেদনার সুর বঙ্কিম এ উপন্যাসের প্রথম গানেই ঘনিয়েছিলেন। 'চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী না মিটল আশা রে'।

সাধ না মেটার এই কান্নার সুর বাজে 'এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইব' গানেও।

আসলে ভিখারিনী গিরিজায়ার গানের আড়ালে বঙ্কিম তাঁর স্বদেশলক্ষ্মীর জন্য গোপন কান্না নিঃশব্দে ঝরিয়েছিলেন। 'মৃণালিনী' তাঁর স্বদেশভাবনার ও প্রথম পদ্মকলি 'বিকচনলিন'। দেশের জনাই তাঁর দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, দীর্ঘশ্বাস কৌশলে ছড়িয়ে রেখেছেন প্রেম-পদাবলীর গানে। বিদ্যাপতির শৈলী গ্রহণ করেছেন তিনি। তার কারণ 'বিদ্যাপতি দুঃখ', 'বিদ্যাপতির গান সায়াহ্ন সমীরণের নিঃশ্বাস'।

'বিদ্যাপতি স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষা' (ব. র ২য় পৃ. ১৯১)। এই স্মৃতি আর আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে 'মৃণালিনী'র 'চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী' কিংবা— 'এ জনমের সঙ্গে কি সই' গানের আখরে।

'মথুরবাসিনী'র সুর 'জয় জয়ন্তী'। 'মল্লারে'-র মতই এ বিরহের রাগ।

আর 'এ জনমের সঙ্গে কি সই'—গানটির সুর নির্দেশ 'ঝিঁঝিট আদ্ধা'। গানটি প্রাচীন বাংলা গান সংরক্ষণ মালায়[২১] এই সুর নির্দেশনাসহ সংরক্ষিত।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সে সময় রাজ্যহারা শোকার্ত নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁর বিখ্যাত 'বাবুল মেরে নৈহার ছুট যায়' গান মর্মস্পর্শী ভৈরবী আদ্ধায় বেঁধে বিদগ্ধ সংবেদীর হৃদয় মথিত করেছেন।—'বঙ্গদর্শন' সে গানকে বলেছিলেন 'বুলবুলির গান'। সে গানের মধুর কাতরতায় স্পৃষ্ট হয়ে কি বঙ্কিম বেঁধেছিলেন তাঁর 'এ জনমের সঙ্গে কি সই' আদ্ধা গান। তবে বঙ্কিমের এ গীতি নৈরাশ্যের নয় বরং বড়ো আশা বড়ো তৃষ্ণা বড়ো আকিঞ্চনেরই গান। 'মৃণালিনী'র এই 'জনমের সাধ' পরে 'আনন্দমঠে'র স্বপ্নসাধে প্রসারিত।

বঙ্কিমের কাতরতা ছিল বাংলার সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নিজস্ব গানের জন্য। তাঁর অনুভব, একদিন বাংলার কীর্তনগান কথায় ভাবে সুরের লাবণ্যে ছিল ষড়ৈশ্বর্যময়ী; সে গান নরনারীর প্রেমকে কেন্দ্র করে উচ্চ ভাবব্যঞ্জনায় ছিল প্রসারিত। তাই কীর্তন গানের হৃত গৌরব প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে বঙ্কিম

অবশেষে নিজেই রচনা করলেন নব পদাবলী। তাঁর সেই পদাবলী অবশ্যই সার্থক গীতিকবিতা।

'পাঁচশত বৎসরের পদাবলী'র সংকলক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর গ্রন্থের 'উনবিংশ শতকের পদাবলী' অধ্যায়ের ভূমিকায় বঙ্কিম পদাবলীকে স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছেন 'সেই রচনার পিছনে বৈষ্ণবীয় সাধনার প্রভাব নাই বলিয়া এই সঙ্কলনে উহা ধৃত হইল না।'[১১]

অর্থাৎ শিল্পকৃতিত্ব ও রসোত্তীর্ণতার বিচারে বঙ্কিম পদাবলী যে খাঁটি গীতি পদাবলীর যোগ্য সে বিষয়ে তাঁর সংশয় নেই।

'ভানুসিংহের পদাবলী'র (১৮৮৪) পূর্বসূরী কি নয় এই বঙ্কিম পদাবলী?

কিশোর রবীন্দ্রনাথ কবি চ্যাটার্টনের অনুপ্রেরণায় যশোপ্রার্থী হয়ে লীলাচ্ছলে ছদ্মনামে রচনা করেন রাধাকৃষ্ণের গীতিপদ। আর এ সংসারের মানুষ মানুষীর হৃদয় বাসনামাখা রাগসঙ্গীত নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় মূর্ত করাই ছিল পরিণত মনস্ক ও বয়স্ক বঙ্কিমের সুচিন্তিত অভিপ্রায়।

বঙ্কিমের ছিল প্রাচীন বৈষ্ণব গীতিপদ সংগ্রহের নেশা। তাঁর নিজের সংগ্রহে ছিল তিন হাজারেরও বেশি বৈষ্ণব গীতিপদ। Calcutta Review-এ প্রকাশিত তাঁর লেখা Bengali Literature (১৮৭১) প্রবন্ধে রয়েছে এর প্রমাণ। এই প্রবন্ধে তিনি বৈষ্ণব পদ ও পদকর্তাদের বাঙলা সাহিত্যের আদিতে স্থান দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে চর্যাপদ তখনও অনাবিষ্কৃত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংকলিত 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' প্রকাশ পায় ১৯১৬য়। একই বছরে বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' প্রকাশিত হয়। একালের গীতগবেষকরা চর্যাপদ থেকেই বাঙলা গানের ইতিহাস শুরু করেন। বঙ্কিম তাঁর প্রাপ্ত নথি অনুযায়ী বিদ্যাপতির সময়েই (পঞ্চদশ শতক) বাংলার গীতি সাহিত্যের আদিরূপ আবিষ্কার করেন। এই Bengali Literature প্রবন্ধেই বঙ্কিম বাঙলার আদি গীতিকবিদের আলোচনা সূত্রে কীর্তন প্রসঙ্গে এসেছেন। লিখেছেন—

> The first in order are the lyric poets, at the head of whom must be placed Vidyapati. They are exclusively vaisnavite, and their songs, either celebrate the amorous of Krishna or the holiness of Chaitanya. They are still sung by bands of Bairagies and are popularly known under the name of Kirtan.

Their number is immense. The present writer has in his possession a collection which contains more than three thousand of these songs.[২৩]

বঙ্কিম সংগৃহীত সেই তিন হাজার পদের হদিশ পাবার আজ আর কোনো উপায় নেই।

পদসংগ্রহের এই নেশাই প্রমাণ করে বঙ্কিমের কীর্তন-অনুরাগের তীব্রতা। এই প্রবন্ধের দীর্ঘ কীর্তন আলোচনায় বোঝা যায় এ গানের কাব্যিক সৌন্দর্য ও গীতিমাধুর্যের যুগ্ম সুষমায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ। এই গীতিপদের ভাষায় তিনি ছিলেন আকৃষ্ট। পদাবলীর ভাষা সম্পর্কে লেখেন—

If the music is peculiar the language is no less so. Many of these songs are probably very modern, but others are undoubtedly the most ancient extant specimens of Bengali language ; and in these the language is more like the Hindi of Tulsidas than the Bengali of the present day. Doubtless early Bengali and early Hindi differed little.[২৪]

বঙ্কিম তাঁর পদ সংগ্রহের নেশার সূত্রেই জেনেছিলেন, এদেশে ধ্রুপদের প্রবল প্রতাপ প্রতিপত্তির অনেক আগে থেকে বাংলা কীর্তনের মধ্যে দিয়েই রাগসঙ্গীতের চর্চা ছিল। কীর্তনই ছিল বাংলার নিজস্ব ধ্রুপদী গান।

কীর্তন বিশেষজ্ঞ খগেন্দ্রনাথ মিত্রের গবেষণা জানায় 'জয়দেবের সময় হইতে কীর্তনের প্রবাহ আসিয়াছে বলিয়া ধরা হয়'।[২৫] গীত-প্রাণ প্রাচীন বাঙালী 'প্রাচীন রাগরাগিনীর উপর পল্লীগানের সুরের তুলি বুলাইয়া এক মনোমুগ্ধকর সুরশিল্প' নিজের মনের প্রয়োজনে আবিষ্কার করেছিল। অর্থাৎ পাঠান কবলিত হবার আগে থেকেই বাংলা এই গীতসম্পদে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। 'মৃণালিনী'র ঐতিহাসিক কালের পটভূমিতে বঙ্কিমও সেই কথার আভাস দিয়েছেন অনেক আগেই। প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা শৈলীতে 'মৃণালিনী'র গান বেঁধে কীর্তনের প্রসারিত কালসীমার ইঙ্গিতও রেখেছেন বঙ্কিম। দিয়েছেন বিচিত্র ধারার কীর্তনেরও ইঙ্গিত।

কীর্তন গবেষকের মতে 'অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা দেশে কীর্তনের যথেষ্ট প্রসার ছিল'। তবে কীর্তনের বিশেষ সমৃদ্ধকাল পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও নরোত্তম দাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাসের কাল। উত্তর ভারতে যখন ধ্রুপদ মানসিং তোমর ও তানসেনের

মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা, সমৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করছিল তখন বাংলায় কীর্তনেরই প্রবল আধিপত্য। উচ্চাঙ্গ কীর্তনের তখন অভ্যুদয়-যুগ। বৃন্দাবন ধাম থেকে ধ্রুপদ গানের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে নরোত্তম দাস ষোড়শ শতকে উচ্চাঙ্গ কীর্তনের প্রবর্তন করেন। খেতরির মহোৎসবে সেই অভিনব কীর্তন প্রথম পরিবেশন করেন ভক্ত গোকুলানন্দ। শুধু স্বরালাপের দ্বারা সে গানের সূচনা করা হয়। ধ্রুপদের মত সে গানের বিন্যাসভঙ্গি। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে সে গানের বিবৃতি রয়েছে—

আলাপে অদ্ভূত রাগ প্রকট কারণে।
রাগিনী সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতিস্বর গ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরমামাদক সুধা নহে তার সম॥

বঙ্কিমের খেদ ছিল বাংলার পেশাদারী হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকারেরা কীর্তন গাইতেন না বলে। বোধ করি সেই জন্যে "বিষবৃক্ষে" (১৮৭২) সঙ্গীতবিদ্যায় পারগ দেবেন্দ্রকে দিয়ে উচ্চাঙ্গ কীর্তন গাইয়ে তাঁর মনের সাধ বঙ্কিম মিটিয়েছেন। 'মৃণালিনী'র শেষ গান 'পরাণ না গেল'র গায়ন ভঙ্গির বর্ণনায় বোঝা যায়, গিরিজায়ার এই গানও 'সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ তানলয় বিশিষ্ট' উচ্চাঙ্গ কীর্তন।

Bengali Literature প্রবন্ধ থেকেই জানি, বঙ্কিম বুঝতেন, কেন হিন্দুস্থানী গানের ওস্তাদেরা কীর্তন গাইতেন না। এর কারণ, কীর্তনের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের ভাবে ও রূপে এমন একটি নিজস্বতা আছে যা পেশাদারী মার্গসঙ্গীত গাইয়েদের বোধগম্য নয়। বঙ্কিমের এই ধারণাকে বিশদভাবে ব্যক্ত করেন রবীন্দ্রনাথ। ২৯শে জুলাই ১৯৩৬-এ দিলীপ রায়কে একটি পত্রে তিনি লেখেন—

> কীর্তন সংগীতে বাঙালীর এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি। ·· রাগরাগিনীর রূপের প্রতি তার মন নেই; ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারিনে হিন্দুস্থানী গাইয়ে কীর্তন গাইছে, এখানে বাঙালির কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে।
>
> (র. র. ১৪, জন্মশত সং, পৃ. ৯৬৬)

রাগরাগিনীর কড়া কানুন কীর্তন মানেনি। তাই এ গান হিন্দুস্থানী সঙ্গীত গাইয়ের কাছে আদালতের বিধিভঙ্গ করা আসামীর মতই অপরাধী। রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 'কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা

ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইনে এটা অপরাধ।'

(র. র. ১৪, জন্মশত সং, পৃ. ৯০০)

রবীন্দ্রনাথের এই মত বঙ্কিমের অভিমতের অনুগামী। বঙ্কিম তাঁর Bengali Literature-এ লিখেছিলেন—

The music to which they are set is peculiar, and is not ordinarily understood even by the professional musicians of Bengal. These, in fact, profess to hold Kirtan in utter contempt, but it nevertheless possesses a sweetness and pathos not ordinarily found in Indian music.[২১]

বৈষ্ণব বংশের সন্তান বঙ্কিম। গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের নিত্যপালাপার্বণে এবং বার্ষিক দুর্গোৎসবে নিয়তই তিনি কীর্তনের আসর শুনতেন। এমন এক আসরে রেনেটির বিখ্যাত কীর্তনীয়া বলরামদাসের কণ্ঠে শুনেছিলেন চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদ "এসো এসো বঁধু এসো"। সেই গান তাঁর প্রাণের কোন গভীরে ঘা দিয়েছিল তা নথিবদ্ধ হয়ে আছে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'একটি গীতে'—

যখনই এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম মনে হইয়াছিল, নীলাকাশ তলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই, মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টি কুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া মেঘের উপর যে বায়ুস্তর—শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া সেই মুরলীতে একা এই গীত গাই—এই গীত কখনো ভুলিতে পারিলাম না, কখনো ভুলিতে পারিব না। (ব. র. ২য়, পৃ. ৮২)

বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের মতো স্পষ্টত কখনো বলেননি, "কীর্তন সঙ্গীত আমি অনেককাল থেকে ভালবাসি", বা "বাঙালীর কীর্তন, গানে, সাহিত্য, সংগীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি, তার মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে", "সাহিত্যের ভূমিতেই ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সঙ্গীতের আকাশ স্ব-মহিমায় অধিকার করেছে"—বঙ্কিম তাঁর কীর্তন-পক্ষপাতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন অন্য ভাবে। 'বিষবৃক্ষে'র হরিদাসী তার গানের আসরে প্রশ্ন করেছিল 'কি গায়িব'। উত্তরে বঙ্কিমের পরাণপুতলী কুন্দনন্দিনী 'একজন বয়স্যার কাণে কাণে' লজ্জাবনত-মুখী হয়ে বলেছিলেন 'কীর্তন গায়িতে বল না'।

কীর্তনের সাহিত্যভূমির বিন্যাস, তার 'নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি'র প্রকাশ-পরিচয় 'মৃণালিনী'।

মহাজন পদকর্তাদের পরিশীলিত, সাহিত্যগুণান্বিত ও রাগরাগিনী আশ্রিত উচ্চাঙ্গ কীর্তন ছিল সেকালীন বিদগ্ধ মন্ডলীর সংস্কৃতির ফসল। বিদ্যাপতি রাজসভা কবি ছিলেন। নরোত্তম দাস গরাণহাটার খেতরীর উৎসবে যে দুরূহ তাল মানে জটিল উচ্চাঙ্গ কীর্তনের জন্ম দিয়েছিলেন, সেই কীর্তন ধারাও ছিল বিশেষ শিক্ষা ও কন্ঠসাধনা সাপেক্ষ। গরাণহাটার ধ্রুপদাঙ্গিক ধারা ছাড়াও ক্রমে খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী ভিত্তিক, মনোহরশাহী, রেনেটি ও মান্দারণী কীর্তন ধারা প্রবর্তিত হয়। মধ্যযুগের প্রতাপান্বিত হিন্দুস্থানী মার্গ গানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের ফসল বাংলার উচ্চাঙ্গ কীর্তন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত প্রথাকে নস্যাৎ করেই এই উচ্চাঙ্গ দেশী গান দশকুশী বিশকুশী ইত্যাদি নিজস্ব তাল মান রচনা করে। নিজস্ব শাখা বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। তাই বলা চলে কীর্তন বাঙালীর নিজস্ব গান হলেও সে গানও বিশেষভাবে শিক্ষিতের গান। বঙ্কিমের দেবেন্দ্র 'ছদ্মবৈষ্ণবী হরিদাসী' 'কৃর্তাবদ্য'ই ছিলেন।

কিন্তু এই উচ্চাঙ্গ-'দেশী' বা 'বাংলা'র পাশাপাশি এই বাংলায় সহজে বয়ে গেছে আর এক গ্রামীণ-লোকজ গীতিধারা। 'বাউল', 'ভাটিয়ালি', 'প্রভাতী', 'ঝুমুর' প্রভৃতি গানে সে ধারা বহুশাখায়িত। গ্রাম বাংলার সহজ সবল মানুষ এই গানের মধ্যে নিজেকে স্বচ্ছন্দে উজাড় করেছে। একে বলা যায় সহজ দেশী গান। লোকভাষায় অনায়াস স্ফূর্ত হলেও কখনো কখনো এ গান নিজস্ব তির্যক ভাষণের রহস্যময় আড়াল নিয়ে হয়ে উঠেছে বিশেষ আকর্ষণীয়, নিজস্ব শৈলী, গায়নভঙ্গি ছন্দ ও সুরে হয়েছে বিশিষ্ট।

বঙ্কিম এই 'বাঙলা' গানের ধারার ও উদাহরণ রেখেছেন গিরিজায়ার কণ্ঠে। যখন সে দূতীর সাজ খসিয়ে ফেলে নিজের মনের কথা বলে তখন তার ভাব আশ্রয় করে লোকভাষা ও লোকসুর। তার গাওয়া 'মেঘ দরশনে হায়'—যদি হয় 'প্রভাতী' তবে 'যে ফুল ফুটিত সখি গৃহতরু শাখে'—যেন মন উদাসকরা 'ভাটিয়ালি'। আর 'সাধের তরণী' গানের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় ঘরছাড়া বাউল গানের।

এ সব গানে বঙ্কিমের দেওয়া স্পষ্ট সুর নির্দেশনা নেই। শুধু গানের ভাব-প্রকৃতি, ছন্দ স্পন্দ ও মাত্রায় সুরবিশিষ্টতা আপনি ধরা দেয়। বোঝা যায় কোন সুরগুঞ্জরণে সৃষ্টির আবেগে স্বতঃই ভেসে এসেছে বঙ্কিমের 'অব্যক্ত' বাক্।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এত সব দেশী গান কোথা থেকে জড়ো করেন বঙ্কিম। 'গীত সকল কোথায় পাও ?'—মৃণালিনীর এই প্রশ্নে গিরিজায়ার উত্তরেই ছিল বঙ্কিমের জবাব - 'যেখানে যা পাই তাই শিখি'।

পাথুরিয়াঘাটার আভিজাত্যের গোঁড়ামি গীতসংগ্রাহক বঙ্কিমের ছিল না।

শুধু ছিল রুচিশীল বাছাই ও জহুরী মন। তার পরিচয় তিনি Bengali Literature প্রবন্ধে পদাবলী সংগ্রহের গুণগত মানবিচার প্রসঙ্গে দিয়েছেন। তার দশ ভাগের এক ভাগ সম্পর্কেই বলেছিলেন—

> There are gems of rare merit, which in tenderness of feeling have never been surpassed by anything in Bengali Literature.
>
> (B. R., P. 104)

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ভ্রাম্যমাণ জীবন ছিল বঙ্কিমের। ঘরে, বাইরে, হাটে, মাঠে, বাটে যেখানে যে গান ভালো লেগেছে স্মৃতির ঝুলিতে জড়ো করেছেন তিনি। তাই 'গান গাহিয়া দিনপাত করা ভিখারী' (মৃণালিনী) 'আপন মনে গায়িতে গায়িতে একলা পথ চলা পথিক', (একা-- কমলাকান্তের দপ্তর) 'ঘাটের রাণায় গায়িতে গায়িতে নামা' গাঁয়ের মেয়ে (ইন্দিরা) কিংবা 'জাল বাহিতে বাহিতে গান গাওয়া' জেলে (ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ—ভূমিকা) সবাই তাঁর গানের জগৎ আলো করে রাখে।

কর্মজীবনের প্রথম দিকে (১৮৫৮-৬০, ৬১-৬৪) ডেপুটিগিরির কাজে বঙ্কিম ঘুরেছেন যশোহর খুলনার গাঁয়ে গঞ্জে। যশোহর কুষ্টিয়া তখন ভদ্র-সমাজের অজ্ঞাতে লালন করে চলেছে এক মানুষবাদী ফকিরের গান। ছেঁউড়িয়া গ্রামের লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০) তাঁর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে রেখেছিলেন অজস্র বাউল গান। গীতি সংগ্রাহক বঙ্কিম কুড়িয়ে নিয়েছিলেন কি কীর্তনের মতই নানা বাউল গীতিপদ? বঙ্কিমের গানের জগৎ সন্ধানীর কাছে এটি একটি বিশেষ প্রশ্ন।

'মৃণালিনী'র দুটি গান 'মেঘ দরশনে চাতকিনী ধায়-রে' এবং 'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে'র পাশাপাশি উদ্ধার করা যায় দুটি বাউল গীতি পদ।

'মেঘদরশনে'র সমান্তরাল একটি লালন গীতি—'চাতক স্বভাব না হলে

> 'চাতকের এমনি ধারা।
> অন্য বারি খায় না তারা
> তৃষ্ণায় জীবন যায় গো মারা
> মেঘের জল না হলে'।[১৭]

'সাধের তরণী'র সদৃশ নীচের গানটি অবশ্য লালনের শিষ্য গোঁসাই গোপালের—

> 'না জেনে অকূল পাথারে ভাসালাম তরী,

এখন যা হবে তা হবে ভবে, ভেবে
উপায় কি করি ॥
দেখি ত্রিবেণীর তরঙ্গ, ভয়েতে কাঁপিছে অঙ্গ।
আমার হচ্ছে আতঙ্গ।
আমি ভয়ে মরি, ও শ্রীহরি।
বিপাকে ডুবে মরি ॥
শুনি তোমার নামের জারি।
নিদান কালে হও কাণ্ডারী
ওহে বংশীধারী।[২৮]

(দ্রঃ হারামনি (৮) গীতসংখ্যা ৪১৮ পৃ. ৩১৯)

বঙ্কিমের 'যে ফুল ফুটিত শাখে'র 'পবনা' শব্দ এবং 'সাধের তরণী' গানের 'আতঙ্গ' শব্দ তাঁর বিশেষ লোকগীতি মনস্কতার পরিচয় বহন করে।

'সাধের তরণী' গানের একটি ইতিহাস নাকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানতেন, অক্ষয় দত্তগুপ্তকে বলেছিলেন। কিন্তু কি সে কাহিনী অক্ষয় দত্তগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র'[২৯] গ্রন্থে সে কথা উল্লেখ করেননি। কোনো বিশেষ বাউল গানের অভিজ্ঞতা বঙ্কিমের এ গানের প্রেরণা কিনা জানতে ইচ্ছে করে।

সরলা দেবী চৌধুরানী এ গানের সুর দিয়েছিলেন 'বাগেশ্রী—তাল আড়া ঠেকা'।[৩০] কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই বিশেষ প্রিয় গানটি গাইতেন, 'পিলু' রাগে 'কাশ্মীরী খেমটা'[৩১] তালে। 'পিলু'র সুর ও খেমটা তাল বাউল গানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

বাউল গানের প্রথম সংগ্রাহক রবীন্দ্রনাথ আমরা জানি। শিলাইদহ পোস্টাফিসের ডাকহরকরা গান গেয়ে গেয়ে চিঠি বিলি করত। তারই মুখে 'কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে'—গানটি শুনে আকৃষ্ট হয়ে বাউল গান সংগ্রহের নেশা জাগে তাঁর। শিলাইদহ থেকে কুড়িটি লালন গীতি সংগ্রহ করে এনে ১৩২২-এর প্রবাসীতে তিনি প্রকাশ করেন। সেই প্রথম লালন ভদ্র সমাজের কাছে পরিচিত হন।[৩২]

গীতপ্রেমী বঙ্কিমের পক্ষেও অসম্ভব ছিল না লালনের সাধনপীঠ যশোহর থেকে লালন বাউলের গান সংগ্রহ করা। সহজিয়া মানুষবাদী বাউলের প্রতীকধর্মী দেহতাত্ত্বিক গান যে বঙ্কিমকে আকৃষ্ট করেছিল তার প্রমাণ 'বিষবৃক্ষে' (বঙ্গদর্শন ১২৭৯, ভাদ্র) দেবেন্দ্রর একটি গান। গানটি পরে সমস্ত সংস্করণে বর্জিত। মাতাল দেবেন্দ্র মদের ঝোঁকে গানটি গেয়েছে—

আমার আঁটা ঘরে সিঁদ মেরেছে,
কোন্ ডাকাতের এ ডাকাতি।
যৌবনের জেলখানাতে
রাখবো তারে দিবারাতি।
মন বাক্‌শ তার লজ্জা তালা,
কল কোরে তার ভাঙ্গলে ডালা,
লুটে নিলে প্রেম নিধি তার
ভাঙ্গা বাক্‌শে মেরে নাতি।

এ গানে ব্যবহৃত 'আঁটা ঘর' 'সিঁদ' 'ডাকাত' 'যৌবনের জেলখানা' 'মন বাক্‌শ' 'লজ্জা তালা' 'ভাঙ্গা বাক্‌শ' ইত্যাদি প্রতীক, উপমা ও শব্দ বাঁধনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বাউলের শব্দধ্বনি। পবন, তালাচাবি, মেঘ, চাতক, নৌকা, কান্ডারী, তরঙ্গ ইত্যাদি শব্দ বাউল গানে বহুল ব্যবহৃত।

প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখযোগ্য লালনের কিছু পদাংশ—'সামাল···তরী, আর কভু হব না কান্ডারী'।

'পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আর'।
'দেখ্‌রে আমার রসুল যার কান্ডারী'।
'ভাব দিয়ে খোল্ ভাবের তালা'।
'বিষামৃতে আছেরে মাখা চোকা'।
'পাখী কখন যেন উড়ে যায়'।
'কি এক অচিন্ পাখী পোষলাম খাঁচায়'।

'মৃণালিনী'র নানা অধ্যায় নাম লালনের ধ্বনি বয়ে আনে। যেমন—

'ফাঁদ'। 'বিহঙ্গী পিঞ্জরে'। 'পিঞ্জর ভাঙ্গিল'। লক্ষণীয় শব্দ ব্যবহার 'শিকলি কাটা পাখী'।

'মনের মানুষ' ও 'পীরিতি অমূল্য নিধি'র (লালন গীতিকা—গীতিসংখ্যা ১১৯ দ্রষ্টব্য) জন্যে লালনের যত আকুলতা। তিনি গেয়েছেন—

মানুষ তত্ত্ব ঠিক যার মনে
সে কি আর অন্য তত্ত্ব মানে।[৩৩]

'অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী' কমলাকান্ত-বেশী বঙ্কিমের কাছেও 'ঈশ্বরই প্রীতি' 'প্রেম নিধি'। তাঁরও দৃপ্ত ঘোষণা—'মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না।'

সত্যিই কি বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেই পেয়েছেন অচিন ফকির

লালনের মুলুক সন্ধান।

বলা হয়, ইউরোপের সেসিল সার্পের মতো ভারতে রবীন্দ্রনাথ লোক-সঙ্গীতের ঐতিহ্যের দিকে প্রথম শিক্ষিত সমাজের মন ফেরান। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগে বঙ্কিম নীরবে তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন। আলপনা, পট ও প্রতিমার মতো লোকশিল্পের পাশাপাশি গ্রামীণ লোকসঙ্গীতের পুনরুদ্ধার তাঁরও কাম্য ছিল।

'মৃণালিনী'র প্রথম অপেরাধর্মী মঞ্চরূপ সেকালে রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় হয়েছিল। 'গ্রেট ন্যাশনাল', 'বেঙ্গল' ও 'এমারেল্ড' থিয়েটারে বঙ্কিম তাঁর এ উপন্যাসের সাফল্যমণ্ডিত নাট্যাভিনয় দেখে গেছেন।

জাঁক করে তখন নাটকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হত—

'লোক হাসাইবার জন্য বালক ভুলাইবার জন্য, নীচ প্রবৃত্তি প্রশ্রয় দিবার জন্য কবির মর্যাদা হানি করিয়া অনর্থক চরিত্র সৃষ্টি হয় নাই। অকারণ কুৎসিত রস-পূর্ণ গীতাবলীর অবতারণা করা হয় নাই।' অথচ 'মৃণালিনী' নাটকের শেষে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের নির্দেশে গিরিজায়া দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে গেয়েছে[৩৪]

কেন যে ছোঁড়া কেন রে মুখ পোড়া
তুই আসবি কি গায়ের জোরে?

বলাবাহুল্য বঙ্কিমের সাধের 'মৃণালিনী'র এমন মঞ্চরূপ তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল। প্রায় নাটকে পরিণত করেও এ উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ বঙ্কিম দেননি। তিনি বলেন[৩৫]

'থিয়েটারে আমার বই-এর যে দুর্দশা করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ওরূপ করিতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল।'

'বিকচ নলিনে যমুনা পুলিনে'—গানের সুর মনোমতো না হওয়ায় বঙ্কিম 'সাতিশয় বিরক্তি সহকারে' রঙ্গগৃহ ত্যাগ করেন। পরদিনই 'জয়জয়ন্তী' রাগিণী ঢিমে তেতালায় গানটি বেঁধে নিজের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরকে সুর লয়সহ শিক্ষা দেন।[৩৬]

একটিও লঘু ভাব ভাষার গান 'মৃণালিনী'তে নেই। অথচ প্রায় তৈরী ছিল বাংলা পালাকীর্তনে সুলভ ও জনপ্রিয় 'খণ্ডিতা' ও 'কলহান্তরিতা'র পরিস্থিতি। বঙ্কিম সে গীতসুযোগ নেননি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে রাধার খণ্ডিতা দশা রাধিকার অবমাননা, সেই সঙ্গে 'কাব্যশ্রীও অবমানিত'।[৩৭] বঙ্কিমও মনে করতেন গানের স্খলিত ব্যবহারে তাঁর 'মৃণালিনী'র কাব্যশ্রীও অবমানিত।

উনিশ শতকীয় রুচির অবক্ষয়ের যুগে 'খণ্ডিতা', 'কলহান্তরিতা' ও 'মান-ভঞ্জন' কবি ও যাত্রাওয়ালা এবং তার 'বাবু'দের প্রিয় গীত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সুললিত ভাবদ্যুতি তখন গিয়েছিল সম্পূর্ণ হারিয়ে।

হেম-মৃণালিনীর গানের পালায় বঙ্কিম যেন সমাজকে স্মরণ করালেন, প্রাচীন পদাবলীর সেই প্রণয় যে অকলঙ্ক 'বিকচ নলিন'। সে প্রেমের গানে কাম 'কণ্টক' থাকলেও তাকে অতল জলের গভীরে লুকিয়ে রেখেই তার সৌন্দর্য বিকাশ। তাই গিরিজায়ার গানে আক্ষেপানুরাগের সুর বাজলেও কখনো শুনি না দেহার্তি। 'কাম তিমিঙ্গিলে' 'মৃণালিনী'কে গিলে খায়নি। তার শপথ বঙ্কিম জানিয়েছেন—

'দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন'।

'কি গায়িব'?

—বিষবৃক্ষ।

'মিছার যৌবনের' গান শোনাবেন বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষে'। 'কাঁটা' ও 'কলঙ্ক ফুলের' অনুষঙ্গে সেখানে প্রেমের কথা বয়ন করবেন। দেখাবেন, 'অমিয় গরল ভেল'। প্রেমামৃত কিভাবে স্মর-গরলে বিকার লাভ করে, কি তার বিকার-স্বাদ ও ক্রিয়া।

'মৃণালিনী'র পশুপতি সামান্যতম 'বিকল চিত্তের সিদ্ধান্তে' 'হলাহল কলস পরিপূর্ণ' করেছিল। সেই 'বিকল চিত্ত' প্রসূত হলাহল সর্বসঞ্চারী 'বিষবৃক্ষে'। কণামাত্র অমৃতস্বাদ জোটেনি কারোর। 'আন সখি ভখিব গরলে'র গরল পিয়াসী এ উপন্যাসের নগেন্দ্র, সূর্যমুখী, কুন্দ দেবেন্দ্র হীরা সকলেই।

'মৃণালিনী'র 'গরল'-গন্ধী গানের, মূর্ছনা বেয়েই বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষে' সম্পূর্ণ অন্য আর এক সুরের প্রেমের গানের জগতে প্রবেশ করেছেন। এ জগৎ তাঁরই সমকালের 'বাঙলা' গানেরই জগৎ।

'বিষবৃক্ষে' ও পদাবলীর গীত পরিমণ্ডলে বঙ্কিমের বসবাস। কিন্তু এখানে বাংলার আদি কীর্তনকার জয়দেব তাঁর 'বিদগ্ধ মুখমণ্ডল'। 'মৃণালিনী'র মহাজন পদকর্তা বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর দুস্তর ভেদ।

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'মানস বিকাশ' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' (১২৮১, পৌষ, বঙ্গদর্শন) প্রবন্ধে বঙ্কিম এই দুই গীতিকারের ভেদ নির্ণয় করেছেন। লিখেছেন—

> জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-কথা গীত করেন কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা, বিশেষত চণ্ডীদাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত।... বিদ্যাপতির দল, মনুষ্য হৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য, বিলাসশূন্য পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয়পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। (ব র. ২য় পৃ. ১৯১)

'বিলাসকলায় কুতূহলী' জয়দেবকে তাঁর কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়ে বঙ্কিম বলেছেন—

> জয়দেবপ্রণীত তৃতীয় কৃষ্ণচরিত্রে এই রূপক একেবারে অদৃশ্য। তখন আর্য জাতির জাতীয় জীবন দুর্বল হইয়া আসিয়াছে। রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে—ধর্মের বার্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।
>
> ভারত দুর্বল, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ, ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার স্থানে রাজপুরী সকলে নূপুর নিক্কণ বাজিতেছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক জগতের নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনার পরিবর্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই সময়ের সামাজিক অবতার; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি।...
>
> যে মহাগৌরবের জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া, প্রখর সুখতৃষাতপ্ত আর্য পাঠককে শীতল করিতেছে।
>
> (ব র. ২য়, পৃ. ৯০৫)

'বিষবৃক্ষে' (১৮৭৩) বঙ্কিম অতীতের সমস্ত ধূম্রপদী আড়াল ভেঙে সমকালীন সমাজের কঠিন বাস্তবভূমিতে নেমে এসেছেন এবং অনুভব করেছেন জয়দেবের কালের মতই সেখানে ঘনিয়ে আছে 'ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া'।

'মৃণালিনী'র প্রেক্ষাভূমি গম্ভীর হয়েছিল আসন্ন শত্রু আক্রমণে বিপন্ন দেশের রাজনৈতিক সংকটে। 'বিষবৃক্ষে'র সংকট-কালের সংকট, সামাজিক তথা আত্মিক

সংকট। তাই সেখানে স্বাভাবিক ভাবে ফুটেছে উদ্‌ভ্রান্ত সাংস্কৃতিক সংকটেরও চেহারা।

প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ও নব্য বণিকতন্ত্র মিলে তৈরী হয়েছিল উনিশ শতকের নতুন শহরে 'বাবু কালচার'। এই কালচার দেশজ সংস্কৃতির গভীর ভূমি ফেলেছিল হারিয়ে। বঙ্কিম তাঁর 'বাবু' প্রবন্ধে (ব র ২য়. পৃ ১০) উদ্ভট 'বেঙ্গল কালচারে'র উপজাত শ্রেণীটিকে শ্লেষে ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছিলেন, জানিয়েছিলেন, 'ইঁহাদিগের আলোচিত সঙ্গীতে' 'মদন আগুনে'রই প্রাধান্য। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম 'বাবু' দেবেন্দ্রকে উপস্থাপিত করে তাঁর সমকালের সেই বিশেষ সঙ্গীতেরই পরিচয় তুলে ধরেছেন, সেই সঙ্গে এঁকেছেন তার যোগ্য সামাজিক ও মানসিক প্রেক্ষাপটের ছবি। ঊনবিংশ শতকের 'বাবু' শোভিত বঙ্গ সমাজ বঙ্কিমের চোখে দেখা জয়দেবের কালের মতো উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখ পরায়ণ এক ভ্রষ্ট জাতির সমাজ। এ কালের গানও তাই আদর্শভ্রষ্ট। ভাগবতীয় ভাবব্যঞ্জনামাখা রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও লীলা বিষয়ক কীর্তনের বদলে এ সমাজে খেউড়-লহরে ভরা আখড়াই, কিংবা কবির লড়াই, অবৈধ প্রণয় চাতুর্যে ভরা ঝাঁঝালো রসের যাত্রা, অথবা বারবধূর উদ্দেশ্যে নিবেদিত "কোমলতাপূর্ণ" "অতি সুমধুর" টপ্পা গানেরই বিপুল চাহিদা।

অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ থেকেই দেখা যায়, চৈতন্যের ভাবোদ্দীপিত বৈষ্ণব ধর্মের মূল রসপ্রবাহ ক্রমে বিশীর্ণ ও বিপথগামী হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম দর্শন চর্চার মননকেন্দ্রের পরিবর্তে নদীয়া, শান্তিপুরে তখন ধীরে ধীরে জেঁকে উঠেছে বাবাজী ও সেবাদাসী বোষ্টমীদের আখড়া সংস্কৃতি। প্রাচীন বৈষ্ণবীয় গান 'সখ্য সঙ্গীত' এ কালের বোষ্টম আখড়া বেয়ে ধীরে ধীরে 'আখড়াই' গানে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ক্রমে সে গান থেকে অধ্যাত্মভাব সম্পূর্ণ লোপ পায়। এ গান হয়ে দাঁড়ায় আদিরসাত্মক খেউড় গানের অন্যতম আশ্রয়। 'কবির লড়াই' প্রাচীন সখ্য সঙ্গীত সংগ্রামের বিবর্তিত স্থূল আধুনিক রূপ। হঠাৎ ধনী, শিক্ষা সংস্কৃতির বনেদহীন, রুচিবিহীন এক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী উঠতি সমাজের চাহিদায় এককালের প্রশ্নোত্তরমূলক রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বিষয়ের গান উনিশ শতকের প্রথম দিকে হয়ে দাঁড়ায় কুরুচিপূর্ণ খেউড়ের উতোর চাপানের খেলা। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের মতো নবমুনশীরাই আখড়াই, হাফ আখড়াই 'কবির লড়াই' প্রভৃতি নতুন 'বাঙলা' গানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

যাত্রা এই শতকের প্রথমার্ধের এক জনপ্রিয় প্রমোদ মাধ্যম। গান বাজনা নাচ ও পালার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা লোকরঞ্জক এই শিল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়

ছিল গান ও খেমটা নাচ। জনপ্রিয় পালার গান সেকালে লোকের মুখে মুখে ফিরত। সাধারণ সমাজে যাত্রার গানের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

'বঙ্গদর্শন' যাত্রার ও তার গানের সমালোচনা করেছেন দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধে (যাত্রা—১২৭৯ পৌষ; ১২৮০, কার্তিক)। পেশ করেছেন সেকালের অতি প্রচলিত কৃষ্ণযাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর পালার গানের নমুনা। যেমন কৃষ্ণযাত্রার রাধার গান—

'আমি মরি মরিব তারে বেঁধনা,
হে দূতী তোর পায়ে ধরি, তারে বেঁধনা।
সে আমারি প্রিয়।'

বিদ্যাসুন্দর পালায় বিদ্যার গান—

'এখন উপায় আয়ি,
কর তারে আনিতে।
কামানলে জেবলে ছলে, ভুলে আছে মনেতে।।'

এই সব গানের মান নির্ণয় করে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখপত্র 'বঙ্গদর্শন' জানায়—

'যে কেহ কথার মিল করিতে পারিল, সেই মনে করিল গীত গাঁথিলাম। যাত্রাকর তাহা গান করিয়া ভাবিলেন আমি গীত গাইলাম। শ্রোতারা মনে করিলেন আমরা গীত শুনিলাম।··· আধুনিক যাত্রার দোষে কৃষ্ণ রাধাকে গোয়ালা বলিয়া বোধ হয়, পূর্বে কবির গুণে দেবতা বলিয়া বোধ হইত।'

'দুর্গেশনন্দিনী'তে দিগগজের গান—'বলি ও গোয়ালামাসী কলসী দেব ফেলে'—এবং 'মৃণালিনী'তে গিরিজায়ার গান 'চরণ তলে দিনু হে শ্যাম পরাণ রতন' যেন বঙ্কিমের দেওয়া আধুনিক ও প্রাচীন কৃষ্ণ-বিষয়ক গানের দুটি নিজস্ব নমুনা।

চটুল গান ও খেমটা নাচে আসর মাত করা বিদ্যাসুন্দর পালার সে সময় প্রভূত জনপ্রিয়তা। 'বঙ্গদর্শন' লিখছেন—'এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রা বিদ্যাসুন্দর। ··· বাঙ্গালার রসজ্ঞতা বিষয় বিচার করিতে হইলে, এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।' বিদ্যার কুরুচিপূর্ণ নীতি-বিগর্হিত গান 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা কঠোরভাবে নিন্দিত। কারণ সে সব গান সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

আধুনিক যাত্রার উদ্দেশ্য চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিয়া লোকের পরিতৃপ্তি সাধন করা। যে সকল কবি এক্ষণে গীত বাঁধিতেছেন তাঁহারা ক্রমে সেই সকল চিত্ত ঘৃণিত ও অপবিত্র করিয়াছেন।···

পল্লী গ্রামের যৌবনোম্মুখী সরলা যুবতীগুলি বিদ্যার মুখে নিম্নলিখিত (এখন উপায় কর আয়ি ···ইত্যাদি) বা তদনুরূপ গান শুনিলে তাহাদের শিক্ষা কিরূপ হয়?

বঙ্গদর্শনের (যাত্রা, ১২৭৯ পৌষ) মতে 'নাটক গুণাংশে কৃষ্ণযাত্রা বিদ্যা-সুন্দর যাত্রা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।' তাছাড়া কালীয় দমন যাত্রা অশ্লীলতা-মুক্ত। সেখানে খেমটা নাচ নেই।

যাত্রার গানের সুর সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন' জানান—

'সুরের নাম পৃথক্ পৃথক্ আছে, কিন্তু সে সকল সুর প্রায় এক জাতীয় হইয়াছে।' (যাত্রা—১২৮০ কার্তিক)

কবি ও যাত্রাগান উনিশ শতকের প্রথমার্ধের আধুনিক 'বাঙলা' গানেরই নমুনা।

সেকালের কবি ও যাত্রাগানের পাশাপাশি আর একটি লোকরঞ্জক গানের শাখা পাঁচালী। সাধারণত রামায়ণ মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যের নানা ঘটনা নিয়ে গান ও কথকতার সংমিশ্রণে পাঁচালী গাওয়া হত। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সমসাময়িক নানা সামাজিক ঘটনাকেও পাঁচালী গানের বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। তাতে লৌকিক রসালোচনার অবতারণা করে জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণের চেষ্টা করা হত।

কবিগান, পাঁচালী ও যাত্রার সেকালে সাধারণ ভদ্রেতর সমাজে সমান চাহিদা ছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে রামনিধিগুপ্ত (১৭৪১—১৮৩৮) হিন্দুস্থানী রাগাশ্রিত বাংলা গানের এক বৈঠকী রূপ সৃষ্টি করেন। সে গান 'নিধুর টপ্পা' বা 'বাংলা টপ্পা' নামেই প্রসিদ্ধ। ধনী 'বাবু' সমাজে এ গানের খুব কদর ছিল। 'আখড়াই' গানের ধারা বেয়েই ধীরে ধীরে রূপ নেয় এই বিশেষ বাংলা গান। সঙ্গীত সংগ্রাম নয়, সঙ্গীত সংবেদনা এই বোধের নতুন আত্মোন্মেষ হয় তাঁর গানে। মর্ত্যমুখী মানবিক প্রেমের অনুভূতি রসে রাঙানো নিধুবাবুর টপ্পা, সেকালের রসিক প্রণয়ীজন ও বহু বিদগ্ধ সঙ্গীত প্রেমীর মনোহরণ করেছিল।

উনিশ শতকের এই গানের জগতে ধীরে ধীরে প্রবেশচারী হয়ে দেখা যায় প্রাচীন উচ্চাঙ্গ কীর্তন জনমানসে ব্যাপক আবেদন হারিয়েছে। সে গানের সমৃদ্ধি প্রভৃত প্রসার প্রতিপত্তি আর নেই। বিশুদ্ধ কীর্তনের বদলে তখন মধুকাণ বা মধুসূদন কিন্নরের (১২২৫—৭৫) ঢপ্ কীর্তনের সমাদর বেশি। মধুকাণ কীর্তন সুরের সঙ্গে টপ্পার ভাঁজ ও কথকতার ভঙ্গি মিশিয়ে নতুন ধরনের দেশী

'বাঙলা' গান ঢপ্ কীর্তন সৃষ্টি করেন । মেয়ে কীর্তনীয়া বা বৈষ্ণবীরা সেকালে বাড়ি বাড়ি 'ঢপ্' গেয়ে বেড়াত। ঢপ্ কীর্তন ক্রমে শহুরাঞ্চলের মেয়ে কীর্তনিয়াদের একচেটে হয়ে পড়ে। জগন্মোহিনী নামে এক কাণ জাতীয়া রমণী ঢপের কীর্তনে খুব নাম করেন।[৩৮]

বঙ্কিম তাঁর সমকালের এই গানের জগতের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেছিলেন, ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে উপজাত নাগরিক সভ্যতার সম্প্রসারণে, দেশে হঠাৎ নবাব ও বাবু সম্প্রদায়ের চটুল আমোদের প্রমত্ততায় এবং সংস্কৃতিবান ধনী অভিজাত মহলে বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীত প্রীতির প্রাবল্যে, বাংলার প্রাচীন উচ্চাঙ্গ দেশী গান কীর্তন তার গৌরবভূমি হারিয়েছে। তার বদলে সাধারণ জনমনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নকল রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে গাওয়া সাধারণ ভাব-ভাষার রসালো গান।

শুধু তাই নয়, তিনি দেখেছেন, তখন ভক্তিমান জাত বৈষ্ণবেরাও দুর্লভ। বেশির ভাগই কুলমান খোয়ানো ভেকধারী বোষ্টম বোষ্টমী। তারা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাজন পদগীতির বদলে 'মধো কান' কিংবা যাত্রাওয়ালা 'গোবিন্দ অধিকারী'র গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

'বিষবৃক্ষে'র সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্র দত্তর ঠাকুর বাড়িতে 'অর্কফলা নাচানো বৈরাগী'র দল ও 'বৈরাগিরঞ্জন রসকলি' কাটা বৈষ্ণবীদের সমাবেশ ঘটিয়ে বঙ্কিম আধুনিক কীর্তনিয়ার নমুনা পেশ করেছেন। তবে খাঁটি কীর্তন সাগ্রহে খুঁজলে যে বিশেষ গীত-প্রেমী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর ব্যক্তিগত কণ্ঠ সংগ্রহে পাওয়া যেত তার প্রমাণ তাঁর 'হরিদাসী বৈষ্ণবী'।

'বিষবৃক্ষে'র (১৮৭২) নবম পরিচ্ছেদে খঞ্জনী নিক্বণিত 'হরিদাসী বৈষ্ণবী'র উচ্চ হাঁকডাকে এই তাঁর সময় কালের জানান দিয়ে বঙ্কিম তাঁর আমলের নতুন 'বাঙলা' গানের দৃশ্যপট মেলে ধরলেন। এ উপন্যাসেও বঙ্কিম এক বৈষ্ণবীর ঝুলি ভরে বয়ে এনেছেন তাঁর সমকালের সমস্ত বাংলা গান। কিন্তু গিরিজায়ার কাল থেকে হরিদাসীর কালে পেঁছোবার সময় ব্যবধানে বদলে গেছে যুগ, সমাজ ও সামাজিকের চরিত্র। বদলেছে গায়ক ও শ্রোতার ভোল, ধরন-ধারণ রুচি। গিরিজায়ার গান কদাচ খঞ্জনী অনুষঙ্গী ছিল না। কারণ এতটুকু ধাতব শব্দের কর্কশতায় তার গীত কোমলতার রসব্যাঘাত ঘটাতে বঙ্কিমের মন চায়নি। তিনি নিজেই যে পছন্দ করতেন না কীর্তনের খোল করতাল সঙ্গত। তাঁর মতে 'The effect, however is often marred by the discordant sound of the cymbals and drums by which it accompanied.' (B. R —

P. 104) কীর্তনবোদ্ধা খগেন্দ্রনাথ মিত্রর ধারণা—'কীর্তন কেবল মানবকণ্ঠের স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভরশীল, যন্ত্রের সহকারিতা নির্ভর করে না।'[৩৯] সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস বঙ্কিমেরও।

'মৃণালিনী'র পরহিতময়ী গিরিজায়া বৈষ্ণবীর ক্ষেত্রে তার পরদুঃখে উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের স্পন্দনই গানের লয়, মাত্রা রক্ষা করেছে। কিন্তু হরিদাসী স্বতোচ্ছ্বাসে গায়নি। সে গেয়েছে ফরমায়েশ মতো অপরের রুচি পছন্দ জেনে ও মেনে। 'ফরসা কালো পেড়ে সিমলে ধুতি-পরা নাকে রসকলি মাথায় টেরি কাটা খোঁপা হাতে পিত্তলের বালার উপরে জলতরঙ্গ চুড়ি'—কালিঘাটের পটের বিবির মতো ফিটফাট্ এই বোষ্টমী যেন কোনো মোহন্ত-বাবাজীর আখড়ার সেবাদাসী। সোজা এসে সে হাজির হয়েছে সম্ভ্রান্ত নগেন্দ্রর অন্তঃপুরে, পর্দানশিনীদের চিত্তবিনোদনের জন্যে। গীতোপজীবিনী বৈষ্ণবীরা সেকালের অভিজাত ধনীঘরের অন্তঃপুরিকাদের হৃদয়োৎসব ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন, তাঁর জন্মের আগে বৈষ্ণবীরা রোজ অন্তঃপুরে এসে কথকতা, কীর্তন শোনাতেন।[৪০] অর্থাৎ গানের সূত্রে অন্তঃপুরে গতায়াত তাঁদের স্বাভাবিক ছিল। তাঁরা ছিলেন অন্দরের সঙ্গে সদরের যোজক।

হরিদাসী আসলে ভেকধারী। জাল বোষ্টমী। নগেন্দ্রর অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্যেই দেবেন্দ্র'বাবু' এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। সেই জাল বোষ্টমীর গানের ঝুলিতেই বঙ্কিম আঠার শতকের শেষপাদ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গানের পশরা সাজিয়ে এনেছেন। সম্ভবত তিনি বোঝাতে চান—একালের এই ভেকধারী বোষ্টমীর মতই এ কালের গানও জাল। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথার আড়ালে দেহবাদী বাসনার লালন ও প্রকাশ এখন গীতকারের মূল অভিপ্রায়।

গিরিজায়ার মতো গান গেয়ে সবাইকে উৎকর্ণ করে হরিদাসীর প্রথম আত্মপ্রকাশ নয়। বেশ শোরগোল তুলে আপনাকে জানান দিয়ে তার আবির্ভাব।

'আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। মা ঠাকুরানীরা গান শুনবে।'—এই বলে আত্মপরিচয় দিয়ে সকলের দৃষ্টি ও মনোযোগ সে আকর্ষণ করে।

যেন এই ভেকধারী বোষ্টমী সেই কালেরই প্রতিমা। গান যে এখন হাটে বিকোয়। কবি নয়, কবিওয়ালাদের যুগ এ। ঢোল কাঁসিতে অথবা ফ্লুট, ক্ল্যারিওনেট, ঝাঁঝরের উচ্চরোলে চারদিক সরগরম করে জনতাকে উল্লাসে মাতিয়ে গান শোনাবার কাল এখন।

হরিদাসীর আত্মঘোষণায় আকৃষ্ট হয়ে আসর জমানোর জন্যে ছুটে এসেছে

নগেন্দ্র দত্তর বাড়ির গীতবুভুক্ষু ঠাকুরানীরা। তাই " 'শুনবো গো শুনবো'— এই ধ্বনি চারিদিকে আবাল বৃদ্ধার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল।" তারপর, বৈষ্ণবী শ্রোতাদের চাহিদা জানতে চাইলেন।

"বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি গায়িব।' তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন। কেহ চাহিলেন 'গোবিন্দ অধিকারী' কেহ 'গোপাল উড়ে'। যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা 'সখী-সংবাদ' এবং 'বিরহ' বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন, 'গোষ্ঠ'—কোনো লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, 'নিধুর টপ্পা গাইতে হয় তো গাও—নহিলে শুনিব না।' একটি অস্ফুট-বাচ্য বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, 'তোলা দাসনে দাসনে দুতি'।"

(ব. র. ১ম পৃঃ ২৭৩)

১৮৭০-এ 'A popular literature for Bengal'-এ বঙ্কিম উনিশ শতকের বাংলা গানের ধারা-বিবরণ দিয়ে লিখেছিলেন—

> After the Nuddea poets, we come to the day of the Kabis, Jatras, and Love songs, the only species of literary composition to which the nation confined itself for generations. And fit intellectual food they were for a race who had become incapable of comprehending any other class of conceptions.

(B. R., P. 98)

'বিষবৃক্ষে' মহিলা মহলের অনুরোধের আসর বসিয়ে বঙ্কিম 'গভীর বুদ্ধি-গ্রাহ্য বিষয়ে মনোসংযোগে অক্ষম' এক বিশেষ যুগজাত সাধারণ জনতা-মণ্ডলীরই পরিচয় দিতে চেয়েছেন। খুব দ্রুত জরিপ করিয়ে এনেছেন বাংলা-গানেরই চৌহদ্দি। বয়সের তারতম্যে বুঝিয়েছেন, যুগভেদে বিভিন্ন গানের চাহিদা, জনপ্রিয়তা ও গীতরুচির রকমফের।

কৃষ্ণযাত্রা পালায় খ্যাতিমান 'গোবিন্দ অধিকারী' (১৭৯৪, ৯৫—আঃ ১৮৭০,৭১), বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় প্রসিদ্ধ 'গোপাল উড়ে' (১৮১৯—১৮৫৯) এবং পাঁচালীকার দাশরথি রায় (১৮০৪, ৫—১৮৫৭) উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত ঘরে আপ্যায়িত এবং সাধারণ্যেও অসম্ভব জনপ্রিয়। দাশরথি রায়ের জীবৎকালেই পাঁচখণ্ড পাঁচালী সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, হর-পার্বতীলীলা ইত্যাদি ভক্তিবিষয়ক পালার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

ছিল তাঁর কৃষ্ণলীলার 'কংসকভঞ্জন' পালা। তাঁর বিখ্যাত গান 'দোষ কারো নয় মা—আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা'। সম্ভবত গানটি বঙ্কিমেরও প্রিয় ছিল। যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৪১] হয়েছে 'বিষবৃক্ষে'র শ্রীশচন্দ্রের বাটিতেও (ব. র ১ম, পৃ. ২৮১)। তাঁর সখীবেশে 'যাস্‌নে যাস্‌নে দূতী' সেকালের হিট্‌ সঙ্‌।

এই প্রসঙ্গে বদন অধিকারীর নামও উল্লেখযোগ্য। 'ইন্দিরা'র (১৮৭৫) বাসরঘরের রমণীরা উ-বাবুর কাছে এঁর গান শুনতে চেয়েছিলেন। বদন অধিকারী ছিলেন কালীয়দমন ও কৃষ্ণযাত্রার অন্যতম প্রসিদ্ধ শিল্পী। এঁকে বলা হয় 'পুরাতন রীতির কৃষ্ণযাত্রার শেষ যাত্রাওয়ালা'। 'বঙ্গদর্শন'-এ (১২৮৯, ফাল্গুন) এঁর উল্লেখ আছে।

উনিশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত জাঁকিয়ে ছিলেন কবিওয়ালারা। ১৮৫৪-য় মাসিক 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদের জীবনী সযত্নে সংগ্রহ করেছিলেন। 'বান্ধব' পত্রিকা এঁদের গানকে বলেছিলেন 'রাধা-কৃষ্ণের মাথামুণ্ড নিয়ে লোফালুফি করা'। বঙ্কিমের এঁদের সম্পর্কে মিশ্রিত মনোভাব ছিল। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে তিনি লেখেন, 'কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত এমন সুন্দর যে তত্তুল্য কিছুই নাই।'

কবিগান মূলত পঞ্চাঙ্গ। ভবানী-বিষয় ও সপ্তমী, গোষ্ঠ-গৌরচন্দ্রী, সখী-সংবাদ, বিরহ, খেউড়-লহর।

ভবানী-বিষয়কে বলা হত 'ঠাকরুন বিষয়'। নগেন্দ্রর মামীর অনুরোধে হরিদাসী বৈষ্ণবী একটি অপূর্ব শ্যামাবিষয় বা 'ঠাকরুন বিষয়' গেয়েছিল।
(ব র ১ম, পৃ ২৭৫)

সপ্তমীর অন্তর্ভুক্ত গান আগমনী। এটিও মূলত ভবানী-বিষয়ক। হিমালয়-কন্যা উমাকে কেন্দ্র করে মাতৃহৃদয় সিঞ্চিত করুণ-রসের গান আগমনী। 'সঙ্গীত' প্রবন্ধে বঙ্কিম লেখেন—'প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কাঁদেন।'
(ব. র. ২য়, পৃ ২৮৭)

গোষ্ঠ—কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর লীলা-বিষয়ক গান। এর নমুনা 'বিষবৃক্ষে'র সপ্তম পরিচ্ছেদে ঠাকুরবাড়ির গানে—'কথা কইতে যে পেলাম না—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে'।

সখী-সংবাদ ও বিরহ—রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিষয়ক গান।

খেউড়-লহর—কবি গানের হাস্যরসাত্মক উপাঙ্গ। যখন এক সুরে গাওয়া হয় তখন তাকে বলে 'কবির টপ্পা'। নানা সুরে বিস্তারিত ভাবে গাইলে বলা হয় 'কবির লহর'। খেউড়-লহরই যথার্থ কবির লড়াই। এতে 'অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য' বিষয়েরই আধিক্য।

বঙ্কিমের পুরাঙ্গনারা কবি গানের শ্রেষ্ঠ উপাঙ্গ শুনতেই আগ্রহী। স্বাভাবিক ভাবেই খেউড়-লহরে তাদের রুচি নেই।

বঙ্কিমের বিশেষ প্রশংসা পেয়েছেন কবিয়াল হরু ঠাকুর, নিতাই দাস বৈরাগী ও রাম বসু। Bengali literature-এ তিনি লেখেন—

'—among the songs of Ram Basu Haru Thakur and Netai Das there are some peculiar excellence.' (B. R., P. 105)

হরু ঠাকুরের (১৭৩৮-৩৯—১৮১২। অথবা ১৭৪৯, ৫০—১৮২৪) বিশেষ খ্যাতি ছিল সখী-সংবাদে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর গানকে বলেছেন 'পরমার্থ-পুরিত'। তাঁর 'শ্যাম তিলেকো দাঁড়াও, হেরি চিকন কালো চরণ', 'হরিনাম লইতে অলস কোরো না রসনা', 'আমারে সখি ধরো ধরো'। ইত্যাদি গান সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল।

নিতাই দাস বৈরাগী (১৭৫১, ৫২—১৮২১, ২২) চুঁচড়ায় বৈষ্ণব আখড়া ও চন্দননগরে বৈষ্ণব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সখী-সংবাদ, বিরহ ও মাথুর গানে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর বিখ্যাত গান—

'বঁধুর বাঁশী বুঝি বাজে বিপিনে'।

বৈষ্ণব তত্ত্ব ও ভাবমূলক এবং মার্জিত ভাষার এই কবিগান বোধকরি বঙ্কিমের কাছে মর্যাদা ও সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি পেয়েছে।

রাম বসু (১৭৮৬—১৮২৮)—এঁর সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন—'যেমন সংস্কৃত কবিতার 'কালিদাস' বাঙ্গালা কবিতার রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেই কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু'। রাম বসু 'ভবানী-বিষয়ক' 'সখী সংবাদ' 'বিরহ'·· উত্তম রচিতেন।' রাম বসুর বিখ্যাত গান 'মনে রৈল সই মনেরো বেদনা'। Bengali literature প্রবন্ধে এই গানের কয়েকটি ছত্রের অনুবাদ করে বঙ্কিম কবিওয়ালার উৎকৃষ্ট গানের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। এ গান রবীন্দ্রনাথেরও প্রশস্তি পেয়েছে। ১৯৩৬-এ তাঁর 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' নিবন্ধে[৪২] তিনি লেখেন, 'এ যে অত্যন্ত বাঙালী গান। বাঙালীর ভাবপ্রবণ হৃদয় তৃষিত হয়েই গান চেয়েছিল, তাই সে আপন সহজ গান সৃষ্টি না করে বাঁচে নি।' এ গানের সহজ শ্রোতাদেরও মান্যতা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছেন—'সরল

প্রকৃতির লোকের অশিক্ষিত স্বাদ সম্ভোগের কথাটাও সত্য।'

বঙ্কিমের অশিক্ষিত পুরনারীরা শুনতে চায় সহজ ভক্তিভাবের কবিগান-- গোষ্ঠ বিরহ, সখী-সংবাদ বা 'ঠাকুরুন বিষয়'—বঙ্কিম মর্যাদা দেন সেই শ্রোতার। বঙ্কিমের নিজেরই যে ভাল লাগত কবি গানের এইসব উপাঙ্গ। প্রসঙ্গত বলা যায় মধুসূদনেরও বিশেষ প্রিয় ছিল 'সখী-সংবাদ'।

'বিষবৃক্ষ'তে মহিলা-মহলের গীত ফরমায়েশের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিম দেখালেন প্রবীণাদের রুচি ভক্তি-রসাত্মক গানে, নবীনাদের পছন্দ মানবিক প্রণয়-গীতি। তাদের প্রিয় 'বিদ্যাসুন্দর' খ্যাত 'গোপাল-উড়ে' কিংবা টপ্পায় সিদ্ধ 'নিধুবাবু'। সরাসরি নরনারীর প্রেমের ব্যাখ্যানে জনসাধারণ ক্রমশ প্রমোদের উপকরণ খুঁজে পাচ্ছে।

চাঁপাকলা ফেরিওয়ালা উড়িষ্যাবাসী গোপাল, গুণী অধিকারী রাধামোহন সরকারের হাতে পড়ে ওস্তাদ গাইয়ে ও নটে পরিণত হন। তাঁর নিজের বাঁধা গান গেয়ে 'বিদ্যাসুন্দর' পালার হীরা মালিনীর অভিনয় সেকালে আসর মাত করে রাখত। মালিনীর আড়-খেমটা তালে খাম্বাজ 'কে বিদেশি রূপের শশী বসে আছে বকুল মূলে'—সেকালের খুবই মুখ-ফিরতি গান।

'বঙ্গদর্শনে'র 'যাত্রা' প্রবন্ধে (পৌষ—১২৭৯) 'বিদ্যাসুন্দর' পালার প্রভূত জনপ্রিয়তার ব্যাখ্যা আছে। "ইহাতে হাস্যরস ব্যতীত আর কোন রসের প্রবলতা নাই। যে ভাষায় ইহার গীতগুলি রচিত হইয়াছে তাহা সরল, অনায়াসেই অপর সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে।" আকর্ষণ করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু ও তাঁদের সুহৃদ জগদীশনাথ রায়ের মতো জাঁদরেল রাজ-পুরুষদেরও। তাই তিন বন্ধুর জমাটি আড্ডায় লঘু রঙ্গরসের গানেও কৌতুকে উঁকি মারতেন গোপাল উড়ের 'কালুয়া, ভিস্তিওয়ালা ও তার প্রণয়িনী মেথরানী চরিত্ররা'।[৪৩] কখনো বা সেকালে রঙ্গ ব্যঙ্গের রাজা 'বার্ড কিং' রূপচাদ পক্ষী।[৪৪] তাঁদের আমোদের আসরে সশরীরে হাজির হতেন শান্তিপুরের বিখ্যাত ভাঁড় ও কবিয়াল 'গুরু দুম্বো' ওরফে গুরুচরণ বাঁড়ুজ্জে। হালকা রঙ্গরস, নির্দোষ আমোদ কৌতুকে বালকের মতো হাস্যোচ্ছল হতেন বঙ্কিম। কিন্তু তিনি সইতে পারতেন না অশালীন অশোভন স্থূলরুচির প্রমোদ ব্যসন।

'নিধুবাবুর টপ্পা' বঙ্কিমের সমাদর পায়নি। তাঁর কাছে এ হল "লজ্জাহীনা যুবতী"র গান। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র রচয়িতা, 'বাংলার রাগসঙ্গীত চর্চার ইতিহাস' প্রণেতা ও আধুনিক গীতি সমীক্ষকরা সকলেই এ কারণে ক্ষুণ্ণ।

সঙ্গীত-গবেষক দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের খেদ—

তিনি (নিধুবাবু) একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব ও নতুন পথ কাব্যসঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছিলেন। সেই গ্রাম্যতাদুষ্ট রচনার যুগেও নিধুবাবুর সৃষ্টি যে কতখানি অশ্লীলতা মুক্ত ছিল তার নিদর্শন তাঁর রচনাবলী। তবুও সাহিত্যের বিচারালয়ে তিনি অভিযুক্ত নেতৃস্থানীয় মনীষা বঙ্কিম (বিষবৃক্ষ) ও হরপ্রসাদের মতো ব্যক্তির দ্বারা। (বাংলা সাহিত্য—বঙ্গদর্শন, ১২৮৭-৮৮)[৪৫]

সকলেরই প্রশ্ন কেন বঙ্কিমের স্বীকৃতি নিধুবাবু পেলেন না ! অথচ তাঁর কাছে 'কবি', 'আখ্ড়া', খাঁটি 'বাঙলা'র স্বীকৃতি পেয়েছে। ১২৭৯-র বৈশাখ-এ 'সঙ্গীত' প্রবন্ধে 'বঙ্গদর্শন' লিখেছে—

বাঙ্গালায় বহুকাল হইতে সঙ্গীত চর্চার আদর ও মর্যাদা আছে, এবং বাঙ্গালিদিগের বুদ্ধি ও উৎসাহের প্রবলতায় সঙ্গীতের কয়েক নূতন প্রণালী এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। কবি, আখড়া হাফ্ আখড়া সঙ্কীর্তন, যাত্রা পাঁচালী এবং আড় খেমটা সম্যকরূপে বাঙ্গালিদের সামগ্রী।

বাঙলা গানের এই তালিকায় কেন 'নিধুবাবুর টপ্পা' যুক্ত হল না ?

এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সম্ভবত বলা যায়, যে সীমিত শিক্ষা ও সংস্কারের সামর্থ্য নিয়ে কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালারা সে যুগের জনরুচির চাহিদা মেনে উপজাত হয়েছিলেন—তাঁদের সেই সামান্য সাধ্য অনুযায়ী তাঁদের গীত ক্ষমতার স্বীকৃতি বঙ্কিম নিজে বা 'বঙ্গদর্শন' মারফত দিয়েছেন। প্রকারান্তরে বঙ্কিম অশিক্ষিত ও নিম্নবর্গের মানুষের স্বাদ সম্ভোগের সত্যতার মূল্যও দিতে চেয়েছেন এইসব লোকগানকে বাংলা গান হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে। সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ সঙ্গীত রসিক সমাজে 'নেটিভ মিউজিক' বলে এই নাগরিক লোকগানেরও তো আর মর্যাদা ছিল না। ক্রমে ভদ্রলোকেরাই শিক্ষা সংস্কৃতির অভিমানে ভালো জাতের কবি কিংবা যাত্রাগানকেও অন্ত্যজের গান বলে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। গোবিন্দ অধিকারী তাই শেষে বস্তির গোয়ালাদের দাক্ষিণ্য পেয়েছেন। কথকতা আশ্রয় পেয়েছে অশিক্ষিত দলের স্ত্রী ও নীচ লোকেদের মধ্যে।[৪৬]

বঙ্কিম নগেন্দ্রর অন্তঃপুরে মহিলা মজলিশে ঠাঁই দিয়ে সে সব গানের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। কেবল নিন্দিত হয়েছে 'নিধুবাবুর টপ্পা'।

নিধুবাবু উঠে এসেছিলেন মোটামুটি শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী গানের বনেদ নিয়ে সম্ভ্রান্ত ধনী ঘরে ঘোরাফেরা ছিল তাঁর। অসামান্য কণ্ঠগুণ ও প্রভাব সঞ্চারী গায়ন ব্যক্তিত্ব তাঁর সহজাত ছিল। কিন্তু

তাঁর গান উৎসারিত ও নিবেদিত হয়েছে অন্যের রক্ষিতা (মহারাজ মহানন্দ রায়ের) এক সুন্দরী বারাঙ্গনা শ্রীমতীকে উদ্দেশ্য করে।

'যতনে যাঁহারে সঁপিলাম প্রাণ,
সদাই চাতুরী করে সেই জন'

অথবা

'এই কি তোমার প্রাণ ছিল হে মনে'

ইত্যাদি গানে গভীর ভাবব্যঞ্জনা কিছুই ছিল না। ব্যর্থ প্রণয়ের বঞ্চনা, হতাশা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনাভরা এই প্রেম-সঙ্গীতকে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

আত্ম বিসর্জনে পরাঙ্মুখ, আত্মোৎসর্গে কুণ্ঠিত, ভোগবিলাসে কলুষিত, আত্মসুখান্বেষণে অপবিত্র।[৭৭]

'আত্মসুখান্বেষী' ক্ষুদ্র ভাবের গান, 'মিছার যৌবনে'র গান, ক্ষণস্থায়ী সুখের গান বলে এ গান বঙ্কিমের কাছেও মূল্য পায়নি। সম্ভবত বঙ্কিম তাঁর কাছে বাংলা গান বিষয়ে আরও দায়দায়িত্ব আশা করেছিলেন। তাছাড়া নিধুবাবুর গানের সামাজিক ক্ষতিকর প্রভাব ছিল। দাশু রায়ের গানে রয়েছে প্রমাণ—

'বেশ্যার আলয়ে যাও বঁধু হে
নিধুর টপ্পা গাও।'

সে যুগের সম্ভোগবিলাসী বাবুসমাজের কাছে এ গান "Food of love" বা প্রণয়ীর প্রণয়পোষক গান হিসেবে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। দু-নম্বরী নিধুর টপ্পায় দেশ এমনই ছেয়ে গিয়েছিল যে আসল নিধুবাবুই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। সমাজ সংগঠক বঙ্কিমের সম্ভবত ক্ষোভ ছিল কেন শুধু শ্রীমতী বারবধূর প্রণয় পিপাসা এক সাঙ্গীতিক মনের গীত সৃজনের আবেগ হয়ে রইবে! কেন শুধুই 'মিছার যৌবনে'র গান সেঁধে সমস্ত গীত প্রতিভা নিঃশেষিত করবেন তিনি। বৃহত্তর ভাবব্যঞ্জনায় কেন সে গান উত্তীর্ণ হবে না! মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের বিশৃঙ্খল অগঠিত উদ্‌ভ্রান্ত সময়ে বাংলা গানের উত্তরণের জন্যে বঙ্কিম ব্যাকুল হয়েছিলেন। সঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে শব্দ বাণী সুর ও ভাবাদর্শের সুসমন্বিত রূপ সন্ধানে আগ্রহী হয়েছিলেন। চেয়েছিলেন সে গান হবে ভাগবতের পরিভাষায় 'সর্বদেহমনস্নাপন'। সকল দেহমন সুস্নাত হবে সে গানের ঝরনাতলায়।

প্রসঙ্গত বলা যায়, টপ্পার জন্মস্থান পাঞ্জাবেও টপ্পা সম্পর্কে ছুঁৎমার্গী সতর্কতা নেওয়া হত। টপ্পার আসরে 'জেনানা ও বালবাচ্চা'র প্রবেশ ছিল

নিষিদ্ধ। জনপ্রিয় পাঞ্জাবী লেখক বলদেব সিং তাঁর 'দিল হুয়া প্যারগাম' বই-এ রেখেছেন তার নমুনা।[৪৮] মর্ত্যমুখী প্রণয় বাসনায় রাঙানো টপ্পা গানের শুচি শোভনতায় সন্দিহান ছিলেন টপ্পার জন্মস্থলেরই বাসিন্দারা। সুতরাং টপ্পা শ্লীল কি অশ্লীল এ প্রশ্ন তার জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়েছিল।

তবে টপ্পার গীতি মাধুর্য কি কোনো দিনই সুর সংবেদী বঙ্কিমের মনোহরণ করেনি? 'ধর্মতত্ত্বের' (১৮৮৮) সপ্তম অধ্যায়ে স্থায়ী সুখের সংজ্ঞা আলোচনায় শিষ্যের প্রশ্ন--

আমি একটা টপ্পা শুনিয়া আসিলাম তাহাতে কিছু আনন্দ লাভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক?

গুরুর উত্তর—

'তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল তাহা স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিতে হইবে।' (ব. র. ২য়, পৃ. ৬০৬)

টপ্পায় খাপ্পা বলে যাঁর অখ্যাতি তিনি মানসিক আনন্দের ও স্থায়ী সুখের কারণস্বরূপ আদর্শ গীত হিসেবে টপ্পাকেই গ্রহণ করেছেন। এ তাহলে কোন্ টপ্পা?

'রজনী'তেও (ব র. ১ম, পৃ. ৫২০) তো তিনি টপ্পাকে 'সামান্যা গণিকাগণের কদর্য চরিত্রের গুণগান' বলে নিন্দা করেছেন। সেখানে জানিয়েছেন শুধু 'দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর' তাঁর কাছে।

'ধর্মতত্ত্বে' উল্লিখিত এই টপ্পাও ভক্তিমূলক টপ্পা। 'নিধুবাবুর টপ্পা' নয়। যদিও নিধুবাবুর 'মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন কাহারে কহিব, কারে দোষ দিব, নিলে কোন্ জন' গানটির সূক্ষ্মরেশ বঙ্কিমের 'আমার মন' প্রবন্ধের 'আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই যেখানে ছিল সেখানে তো নাই'। —পংক্তি রচনায় অনুভব না করে পারা যায় না। এবং 'বিষবৃক্ষে'র হীরা ও দেবেন্দ্রর প্রণয়বিলাস দৃশ্যে (ব র ১ম, পৃ ৩২১) টপ্পার আভাসবাহী দেবেন্দ্রর গানকে বলেছেন তিনি 'সুধাময় সঙ্গীত লহরী' 'প্রথম বসন্ত প্রেরিত একমাত্র ভ্রমরঝঙ্কারবৎ', তা সত্ত্বেও বঙ্কিমের চিরস্থায়ী সুখদায়ী টপ্পা হল বঙ্কিমের সমকালের ভক্তিরসবাহী উচ্চাঙ্গের টপ্পা।

কালীমীর্জার (আঃ ১৭৫০-১৮২০) সময় থেকে টপ্পাঙ্গের ভক্তিগীতি বিদগ্ধ সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে। রামমোহন কালীমির্জার টপ্পার ভক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে টপ্পাবাজ মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৫) ভক্তিমূলক গানে খ্যাতি অর্জন করেন।

সম্ভবত এঁদের টপ্পাই বঙ্কিমের কাছে আনন্দদায়ক গান।

মহেশচন্দ্র ছিলেন বারাণসীর প্রসন্দ ও মনোহর মিশ্রের ঘরাণার কলাবৎ প্রখ্যাত টপ্পাগায়ক রামকুমার মিশ্রের শিষ্য। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর ভ্রাতৃবৃন্দ ছিলেন মহেশচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক। যতীন্দ্রমোহনের 'উভয় সংকট' নাটকে ১৮৬৩তে মহেশচন্দ্র গানও গেয়েছেন। 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে' সে নাটক হয়েছিল। সিন্ধুড়ার টপ্পায় সিদ্ধি ছিল তাঁর। শৌরীন্দ্রমোহনের সূত্রে এঁর গান শোনার সৌভাগ্য সম্ভবত বঙ্কিমের হয়েছিল।

'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম গানের অনঙ্গদীপন সামর্থ্যের কথাই বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন। দেখাতে চেয়েছেন তার কলঙ্কভাগী রূপ। এই প্রসঙ্গেই ভাগবতের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক ভাবে জয়দেবের কথা তাঁর বারবার মনে হয়েছে। 'বিষবৃক্ষে'র প্রণয়কথা রচনাকালে এই দুই কাব্যের ভিন্নমুখী প্রেমচিত্রের বিষয় তাঁর স্মরণে ছিল। 'হরদেব ঘোষালের পত্রে' (ব. র. ১ম, পৃ. ৩১৩) প্রেমের আদর্শের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের কবি 'আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জনের কবি' ; অন্য পক্ষে জয়দেব 'রূপজমোহের কবি'।

এই 'আত্মবিস্মৃতি'র গানের বিপরীতেই 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম শুনিয়েছেন 'রূপজমোহে'র গান। 'আত্মসুখান্বেষী' কামীজনের গান। 'ভোগবিলাসে কলুষিত অপবিত্র গান'।

বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসশাস্ত্র 'উজ্জ্বল নীলমণি' 'রাগ'-এর সংজ্ঞা নির্ণয়ে বলেছিলেন—

'সুখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥'

যা সুখের আধিক্যে মন রাঙিয়ে আনন্দ দেয়, যা অন্তরে প্রীতির উৎকর্ষ ঘটায় তাই রাগ।

ভাগবতে গীতিসুরকে বলাই হয়েছে 'অনঙ্গবর্ধন'। 'নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসা'। (ভা। ১০। ২৭। ৪) কৃষ্ণের প্রেমবর্ধক গীত শুনে ব্রজস্ত্রীরা কৃষ্ণকেই মন প্রাণ সঁপে ছিলেন।

টীকাকারেরা বুঝিয়েছেন এই 'অনঙ্গ' 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' - কাম নয়। এ হল "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা"—প্রেম। অর্থাৎ এই প্রেম হল হৃদয়স্ফীত করে আত্মগণ্ডী অতিক্রম করে যাওয়ার এক তীব্র অনুভূতি। অন্যের সুখ বাঞ্ছাই এই প্রেমের উদ্দেশ্য।

বঙ্কিমের কাছেও গান আত্মেন্দ্রিয় সম্ভোগের উপকরণ নয়। তাঁর আকাঙ্ক্ষা

সুর, ভাব ও বাণীর মূর্ছনায় কৃষ্ণের 'মুরলী ধ্বনি'র মতো তা আকর্ষণ করবে 'এসো এসো বঁধু এসো'র মতো অসীম টানে। সেই যে তাঁর সাধ, 'নীলাকাশ তলে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই'। বৃহতের ব্যাপ্তির মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিক ব্যষ্টিকে ভাসিয়ে দিয়ে গান গাওয়া ও শোনার সাধ তাঁর। ভাগবতীয় প্রণয়লীলার রূপকার্থ তিনি জানেন। তাই 'কমলাকান্তে'র নির্জন সংলাপে তাঁর স্পষ্ট ভাষণ—

> লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী, বুঝিতে পারি না, যে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য পর সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী সে যেন কমলাকান্ত শর্মার দপ্তর মুক্তাবলী না পড়ে। আমি বিলাস প্রিয়ের মুখে 'এসো এসো বঁধু এসো' বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য জীবনের সুখ'। (ব. র. ২য়, পৃ ৮২)
> দপ্তরের 'একা', 'বসন্তের কোকিল' ও 'এসো এসো বঁধু এসো' প্রবন্ধ—ত্রয়ীতে বঙ্কিম এই মিলনসুখপিয়াসী।

বঙ্কিমের হৃদয়নন্দিনী কুন্দ। মৃণালিনীর মতোই আত্মসুখে উদাসী সেও। বঙ্কিম জানিয়েছেন, 'নগেন্দ্রর মঙ্গলার্থ', সূর্যমুখীর মঙ্গলার্থ', 'কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গল মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল'। 'কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না'।

তাই, এই পরসুখান্বেষী কুন্দের প্রিয় গান 'কীর্তন'। বঙ্গসংস্কৃতির নাগরিক লোকরঞ্জন শাখার কোনো গানেই তার রুচি নেই।—তার শুদ্ধান্তঃকরণের রাগ পিপাসা মেটাতে পারে শুধু ভাগবতী ভাবের ব্যঞ্জনামাখা উচ্চাঙ্গ গান। মহিলা মহলের অনুরোধের আসরে তাই 'লজ্জাবনতমুখী' হয়ে সে হরিদাসী বৈষ্ণবীকে কীর্তন গাইতে অনুরোধ করে মৃদু কণ্ঠে। বোধকরি তার লজ্জা, সে যে চলতি হাওয়ার পন্থী নয়। অথবা সেই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গৌরবের যুগে উচ্চকণ্ঠে কীর্তন গীত ফরমাশে ফরমাশকারীরই জাত যাবে তাই স্বয়ং বঙ্কিমই লজ্জাবনত।

অকলঙ্ক কুন্দের জীবনে মিথ্যা কলঙ্ক ও বিষাক্ত কাঁটার জ্বালা নিয়ে দুর্গ্রহের মতো হাজির হয়েছে দেবেন্দ্র। 'রমণীকুলদুর্লভ' রূপসী মোহিনী বৈষ্ণবীর বেশে গানের ঝুলিতে লুকিয়ে সে বয়ে এনেছে 'বিষবৃক্ষে'র বিষের ভাঁড়। অনাথা বিধবা কুন্দকে কোনো ছলে, কৌশলে ফুসলে দত্তবাড়ির কড়া

প্রহরার আওতার বাইরে বের করে এনে তাকে তার বাগানবাড়ির বিলাসসঙ্গিনী করাই এই দেবেন্দ্র 'বাবু'র গোপন অভিপ্রায়।

সঙ্গীতে কৃতবিদ্য, দৈবকণ্ঠ দেবেন্দ্র তাই গীতমুখরা বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশ ধারণ করে হয়েছে 'হরিদাসী বৈষ্ণবী'। এই জাল সাজে সে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করেছে দত্তবাড়ির অন্দর মহলে, গান শোনাবার লোভ দেখিয়ে কুন্দসহ সমবেত অন্তঃপুরিকাকে দত্তবাড়ির প্রাঙ্গণে টেনে এনেছে সে সহজে।

'কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া সে তাহার আর একটু সন্নিকটে আসিল।'—যেন তার নিয়তি তাকে আকর্ষণ করল এই গানের ফাঁদ পেতে।

ভাগবত গানকে বলেছে 'সর্বভূত মনোহর' 'শ্রবণমঙ্গল ভুবনমঙ্গল'। আবার সেই ভাগবতেই গীতপারঙ্গম ব্যাধের উপমায় প্রকারান্তরে বলা আছে সর্বনাশা গীতের কথা। 'কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ'। (১০।৪৭।১৯) 'কৃষ্ণসার বধূরা যেমন ব্যাধের গীত আজ্ঞায় এসেছিল' (সর্বস্বত্যাগ করে কৃষ্ণমাত্র সার করে বেরিয়ে এসেছিল ব্রজবধূরা)। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমও জানাতে চান গান মাত্রই কিন্তু সর্বথা শ্রবণমঙ্গল নয়। কখনো সে হতে পারে কুহকীর মায়াপাশ। ডেকে আনতে পারে সর্বনাশা পরিণতি।

দেবেন্দ্রর গানে আকৃষ্ট হয়েছিল কুন্দ, তার গীতশরে বিদ্ধ হল হীরা।

দেবেন্দ্রর 'অপ্সরো নিন্দিত কণ্ঠগীতি ধ্বনি'ই তার চূড়ান্ত আয়ুধ। এই আয়ুধ হাতে নিয়েই কুন্দের রূপোন্মাদনায় সে বারে বারে হাজির হয়েছে দত্তগৃহে। এই আয়ুধেই সে বশ করেছে কামনার দাসী করেছে হীরাকে।

ছদ্মবেশী দেবেন্দ্র সুশিক্ষিত গায়ক। তার গীত সংগ্রহ প্রচুর ও বিচিত্র। কুন্দকে অভিভূত করার জন্যেই সে কেবল তারই অনুরোধ মেনে প্রথমে গায় উচ্চাঙ্গ কীর্তন। তার 'ক্ষুদ্রপ্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্য বিশারদের অঙ্গুলিজনিত শব্দের ন্যায় মেঘ গম্ভীর শব্দ বাহির হইল'। যেমন ধ্রুপদ আসরে হয় ওস্তাদ পাখোয়াজীর যোগ্য সঙ্গত ঠিক তেমনি তালমানলয়ের বিশুদ্ধ ঠেকা এই উচ্চাঙ্গ গানে হয়েছে অপরিহার্য। ধ্রুপদের মতো স্বরালাপ উচ্চাঙ্গ কীর্তনের বিশেষত্ব।

'আলাপে গমক মন্দ্র মধ্য তার স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কেবা ধৈর্য ধরে॥'

খেতুরী উৎসবে গাওয়া গোকুলানন্দের কীর্তন সম্পর্কে 'ভক্তিরত্নাকর' বলেছেন এ কথা।

কোনো পদাবলীর উল্লেখ দেবেন্দ্রর প্রথম গানে নেই। প্রথমে রাগালাপের

বিস্তারে চিত্তভ্রমি ইন্দ্রজাল রচনা গায়কের প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফলও। 'সর্বাঙ্গীণ তাললয় স্বর পরিশুদ্ধ' সেই গানে 'রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বিমোহিত চিত্ত'। 'শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত।' এবং তারা বৈষ্ণবীকে 'পুনশ্চ গায়িবার জন্য অনুরোধ করিল।' আর—

'তখন হরিদাসী সতৃষ্ণ বিলোল নেত্রে কুন্দনন্দিনীর পানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্তন আরম্ভ করিল।'

কুন্দের মনোরঞ্জন হরিদাসীর একমাত্র লক্ষ্য। তাই এবার সে স্বেচ্ছায় কুন্দের প্রিয় গান কীর্তন শুরু করে। এ গান রূপানুরাগের গান। পদবাণীর আড়ালে সুচতুর দেবেন্দ্র মেলে ধরেছে নিজের গোপন বাসনার কথা।

"শ্রীমুখ পঙ্কজ দেখবো বলে হে
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধা কথা কোয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে॥"

এ হল লঘুরীতির কীর্তন। লয় ও ছন্দ সংক্ষিপ্ত, সুর তরল। পাঁচালী-কথকতা ও যাত্রার গানের সংমিশ্রণে গড়া ঢপ্ কীর্তনের একটি নমুনা।

কিন্তু এ গানেই রয়েছে জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দের' পদবাণীর আভাস। 'প্রিয়ে, চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মান নিদানম্' (গী ১০।৩) এবং 'দেহি পদ পল্লবমুদারম্'—(গী ১০।৯) পদ পংক্তির ছায়াপাত ঘটিয়ে বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষে'-র প্রথম গানেই 'রূপজ মোহের' কবির প্রতিষ্ঠা সূচনা করেছেন। এই পদ দুটির পরবর্তী পংক্তি 'সপদি মদনানলো দহতি মম মানসম্' (গী ১০।৩) এবং 'জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন কদনানলো' (গী ১০।৯) ইত্যাদির স্পষ্ট অনুসরণে কোনো বাণী বঙ্কিম রচনা করেননি। কিন্তু নিগূঢ় সংকেতে তার ব্যঞ্জনা রেখে গেছেন। চতুর দেবেন্দ্রর অনুনয়—'এখন বাঁচাও রাধা কথা কোয়ে'। অর্থাৎ ইঙ্গিতে সে কুন্দকে জানাতে চায় এই সুন্দরীর রূপ মোহের আগুনে সে জ্বলে মরছে। মানের গরব ত্যাগ করে কুন্দ, বৈষ্ণবীর ওপর একটু সদয় হলেই সে বাঁচে। এ আসলে রূপমোহের গান। এই মোহই 'বিষবৃক্ষে'র আসল বীজ। এই 'মোহ' ক্রমে 'স্মর' ও 'গরলে' বিকার লাভ করবে।

পরের খেমটা চালের গানে দেবেন্দ্র স্পষ্টত কুন্দর সঙ্গ কামনা করেছে।

তাই এবার সে প্রলোভনের গান শোনায় :

'আয়রে চাঁদের কণা,
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু,
পরতে দিব সোনা।
আতর দিব শিশি ভোরে,
গোলাপ দিব কার্বা করে,
আর আপনি সেজে বাটা ভোরে,
দিব পানের দোনা।'

দেবেন্দ্রের 'অতৃপ্ত বিলাস-তৃষ্ণা'। (ব. র. ১ম. পৃ. ২৭৬) সে কুন্দকে তার বাগানবাড়ির বিলাসসঙ্গিনী করতে চায়। এই বাগানবাড়িমার্কা গানে রয়েছে সেই ইঙ্গিত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে 'হরিদাসী বৈষ্ণবী'র পুনরাগমন 'কলঙ্কের-ফুলের' গান মুখে নিয়ে। দেবেন্দ্রর প্রণয়বিলাস ভোগ-কলঙ্কিত। এবং তার পরিণামে আছে সর্বনাশা মৃত্যু। তবুও তীব্র কামবশে অগ্নিমুখী পতঙ্গের মতো সে কুন্দ-লোভে বার বার দত্তবাড়ি ছুটে এসেছে, সূর্যমুখীর কড়া প্রহরার কাঁটার বাধা পার হয়েছে গীতমুখরা বৈষ্ণবীর বেশে ; গেয়েছে—

'কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল,
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পরলেম মালা গেঁথে, কানে পরলেম দুল।
সখি কলঙ্কেরি ফুল।
মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।'

বিধবা কুন্দের প্রতি তার এই স্মরজ আকর্ষণ সমাজে নিন্দিত। কিন্তু নিন্দাকে ভূষণ করেও তার বাসনা দেবেন্দ্র চরিতার্থ করতে চায়। সূর্যমুখী এ গান শুনে বলেছিলেন, 'ও সব গান আমার ভাল লাগে না। গৃহস্থ বাড়ি ভাল গান গাও।' অর্থাৎ এ গানও 'বাগানবাড়ি'র গান। সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের রুচিকর নয়।

বঙ্কিম ক্রমশ একটু একটু করে জাল বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশ খসিয়ে প্রকট করেছেন তার আসল নগ্ন কামুক রূপ। তাই উচ্চাঙ্গ কীর্তনের পরেই—'টপ্' ও

তারপরেই 'বাগানবাড়ি' মার্কা খেমটা শোনায় দেবেন্দ্র।

এরপর সপ্তদশ পরিচ্ছেদে পানোন্মত্ত দেবেন্দ্র 'ঝিমকিনি মারিয়া' গোপাল উড়ের টপ্পার ধাঁচ টুস্‌কি চালে গান গায় আপন মনে, চিত্তবিকার বশে। অসংলগ্ন উদ্ভট এই মাতালের গান :

'আমার নাম হীরামালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে,
কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলি,
তুমি আমার কমলকলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ,
উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।'

গোপাল উড়ের-'হীরে-মালিনীর' বিখ্যাত গানটি হল :

'এস যাদু আমার বাড়ি,
তোমায় দিব ভালোবাসা,
যে আশায় এসেছ যাদু,
পূর্ণ হবে মন আশা।
আমার নাম হীরে মালিনী,
কড়ে রাঁড়ী নাইকো স্বামী,
ভালোবাসেন রাজনন্দিনী,
করি রাজমহলে যাওয়া-আসা।'

বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষে'র 'হীরে-মালিনী'কে দিয়ে দেবেন্দ্রর মন-আশা পূর্ণ করিয়েছেন। দেবেন্দ্র তার কন্দর্পকান্তি রূপ ও মন-মজান গানে হীরাকে বশ করে ভেবেছে, 'যেদিন মনে করিব, সেই দিন তোমার দ্বারা কার্যোদ্ধার করিব।'

হীরার সুপ্ত দেহ-বাসনার পরিচয় রয়েছে তারই মুখের একটি খেমটা গানে। ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে সে গেয়েছে—

"মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়
সাগর ছেঁচে তুলবো নাগর পতন করে কায়।"

দেবেন্দ্রর গানে মুগ্ধ হয়ে হীরা সুনীতির সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে পাপে আকণ্ঠ ডুবেছিল। দেহমনের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিয়েছিল। শেষে বিকৃত কামের বিষে জর্জরিত হয়ে সর্বনাশা পরিণতির মুখে ঠেলে দিয়েছিল নিষ্পাপ কুন্দনন্দিনীকে। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে 'অবতরণ'-এ রয়েছে গীতিমুগ্ধা-হীরার

পাপের পথে প্রথম অবতরণের বর্ণনা। এই প্রথম বঙ্কিম গানের অনঙ্গজনন কলঙ্কভাগী রূপ দেখালেন।

সুর-আসক্ত গায়ক গীতোপকরণ দেখামাত্রই সহজে গীতব্যাকুল হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্র কুন্দ-সন্ধানে হীরার ঘরে প্রথম প্রবেশ করে একখানি বেহালা দেখেই উৎসুক হয়। তারপর—

"দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া একপ্রকার চলনসই করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া মধুর স্বরে ভাবযুক্ত মধুর পদ মধুর ভাবে গায়িলেন।" কি গান গাইছিল দেবেন্দ্র! জয়দেবের গীতিপদ অথবা প্রণয়সঙ্গীত টপ্পা! সে গান নিঃসন্দেহে প্রেমের গান—এবং তা 'কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতি প্রণয়ের শেষ পরিচয়'। (বিদ্যাপতি ও জয়দেব)

হীরার প্রতিক্রিয়াই সে কথা জানায়। 'তোমার দিব্য চক্ষু' বলে হীরার মন কিছু আগেই ভিজিয়েছিলেন দেবেন্দ্র। এখন এই গান শুনে :

> হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্ষণকাল জন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এ-ই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী—আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুইজনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। (ব. র. ১ম. পৃ. ৩০৩)

এই মোহই হীরার কাল হয়েছে। মোহ বশেই কপট দেবেন্দ্রর ফাঁদে পড়েছে সে। "হীরা মক্ষিকা সহজেই জালে পড়িল" (ব. র. ১ম. পৃ. ৩২০)। এবং দেবেন্দ্রর 'গীতলহরীতে' 'হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত' হল। 'বিষবৃক্ষে'র ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ প্রেমাকুলা হীরার পাপের বর্ণনা। সুর ও সুরায় দেহ বিবশ করা পাপ-প্রমোদের বর্ণনা।

জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দে' (৮/১১) গোবিন্দর গীতরব সম্পর্কে বলেছিলেন—'অন্তর্মোহন মৌলিঘূর্ণন' 'স্তম্ভাকর্ষণ দৃষ্টিহর্ষণ মহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম'। সে গান গীতিমুগ্ধা মৃগনয়নাদের মন মোহিত করে, মাথা ঘুরিয়ে দেয়, স্তম্ভন, আকর্ষণ ও বশীকরণের মহামন্ত্রে অভিভূত করে। 'দৈবকণ্ঠ' দেবেন্দ্রর 'সঙ্গীত লহরী' হীরার মনেও সেইরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই সে দেবেন্দ্রর গীত 'শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া একেবারে বিমোহিতা হইল। তখন তাহার হৃদয় চঞ্চল, মন দেবেন্দ্র প্রেমে বিদ্রাবিত হইল। এখন তাহার চক্ষে দেবেন্দ্র সর্ব-সংসারসুন্দর, সর্বার্থসার, রমণীর সর্বাদরণীয় বোধ হইল।' তারপর দেখা যায়

'সুরাপানোদ্দীপ্ত' দেবেন্দ্র যখন 'প্রথম বসন্ত প্রেরিত একমাত্র ভ্রমর ঝঙ্কারবৎ গুন্ গুন্ স্বরে, সঙ্গীতোদ্যম করিলেন,' তখন—

হীরা দুর্দমনীয় প্রণয়স্ফূর্তি প্রযুক্ত সেই সুরের সঙ্গে আপনার কামিনী-সুলভ কলকণ্ঠধ্বনি মিলাইতে লাগিল।··· হীরা যাহা গাহিল, তাহা প্রেম-বাক্য, প্রেম-ভিক্ষায় পরিপূর্ণ। (ব. র. ১ম. পৃ. ৩২১)

হীরার এই গান 'আত্ম' অতিক্রম করা প্রণয় গীত নয়। তা হল 'কামাতুরের চিত্ত চাঞ্চল্যে'র গান। (ব. র ১ম পৃ. ৩১৩) 'মিছার যৌবন' সর্বস্ব গান।

সুর, সুরা ও কামিনী সেবিত পাপদৃশ্য বঙ্কিম এমন খুঁটিয়ে 'বিষবৃক্ষে' কেন আঁকলেন? আঁকলেন, কামী চরিত্রের সঙ্গেও যে গান বিজড়িত, গানও যে চরিত্র ভ্রষ্টতার সহায়ক, স্খলিত চরিত্র এবং প্রতারকের কুকার্যের সাধনোপায় সেটি দেখাবেন বলে। সুর-সুরা-নারী, সেই উনিশ শতকীয় অবক্ষয়ের যুগে বাবু সংস্কৃতির অঙ্গ। সুরকে অবলম্বন করে, পারিবারিক ও সামাজিক, ব্যক্তিক ও সামগ্রিক ক্ষতিসাধন কি ভাবে ঘটে, ঘটা সম্ভব তার দৃষ্টান্ত দেওয়া বঙ্কিমের পক্ষে জরুরী। তিনি জানাতে চান আত্মার হিতসাধক গানও যেমন আছে তেমনি আছে সর্বনাশা অধঃপতন সঙ্গীত। গোবিন্দলাল রোহিণীর ব্যাভিচারী প্রমোদবিহারে গীতিবাদ্য বিলাসপূর্ণ ছবি এঁকে (১৮৭৮), 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮১, অগ্রহায়ণ) অধঃপতন 'সঙ্গীত' নামে এক দীর্ঘ কবিতাকে স্থান দিয়ে সে যুগের 'বাগানবাড়ি' কালচার বঙ্কিম ফুটিয়ে তুলেছেন।

'অধঃপতন সঙ্গীতে'র একটু নমুনা—

'বাগানে যাবিরে ভাই? চল সবে মিলে যাই
যথা হর্ম্য সুশোভন সরোবর তীরে।
··· ···· ····
চল যথা কুঞ্জবনে নাচিবে নাগরী গণে
রাঙ্গা সাজ পেশোয়াজ পরশিবে অঙ্গে।
তম্বুরা তবলা চাঁটি, আবেশে কাঁপিবে মাটি।
সারঙ্গ তরঙ্গ তুলি, সুর দিবে সঙ্গে॥
··· ···· ····
ঘরে আছে পদ্মমুখী, কভু না করিল সুখী।
শুধু ভালোবাসা নিয়ে কি হবে সংসারে।
নাহি জানে নৃত্যগীত, ইয়ারকিতে নাহি চিত
একা বসি ভালবাসা, ভাল লাগে কারে?'

বার বার সুর-সেবিত অবৈধ সম্ভোগ বিলাসের বর্ণনায়, বঙ্কিম নেতি-নেতিভাবে ঘোষণা করেছেন, ভোগ লোলুপের সুরার সঙ্গে সুরের এই মত্তমদির মিলনও সর্বথা অবৈধ। সংগীত নয় লৌকিক শৃঙ্গারের উদ্দাম উন্মার্গগামিতার চিত্তবিকারের উপকরণ। সঙ্গীত চিত্তপীড়া বা ভাগবতের পরিভাষায় 'হৃদরুজঃ' অর্থাৎ কামবৃদ্ধির উপায়ও নয় বরং তা ছেদনেরই উপায়।

একদা এই বাংলায়, রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রণয় কথা অবলম্বন করে, মহাজন গীতিকবিরা অলৌকিক ভাবের অধ্যাত্ম-লোকে বিহার করেছিলেন। তাঁদের সে গান ছিল আত্মার অশন। শ্রীমদ্ভাগবত নিঃসৃত ভক্তিব্যঞ্জনায় সে গান ছিল রসামৃত বিশেষ। সে গানকে বলা হত 'শ্রবণমঙ্গল' 'কল্মষাপহা'—পাপনাশন 'কীর্তন'। (ভাঃ ১০/২৯/৯)। কিন্তু বঙ্কিমের সমকালের 'বাগান-বাড়িমার্কা' প্রেমের গান পাবনী আদর্শভ্রষ্ট কলঙ্কিত গান। বাবু-শোভিত নগর বাংলার সেই সমাজও বঙ্কিমের চোখে এক কাঁটার বন। পানোন্মত্ত দেবেন্দ্রর ঝুমুনি কেটে বিকৃত 'বিদ্যাসুন্দরী'-ভাঁজা, কাম-বিকৃত হীরার জয়দেবের 'স্মরগরল' পদ গাওয়া, এ সবই অধঃপতিত বাবু-সমাজের স্খলিত মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গানেরও উদ্‌ভ্রান্ত দশার ছবি ফুটিয়ে তোলা।

প্রসঙ্গত কৌতূহলী মনে প্রশ্ন জাগে, দেবেন্দ্রর সঙ্গীত-কুশল সত্তায় কোনো ভাবে কি পড়েছে সুর ও সুরাপ্রেমী রহস্যময় চরিত্র যদুভট্টের সাঙ্গীতিক প্রতিভার তির্যক ছায়া! বঙ্কিম 'সুরা-পান সমুৎসাহিত' 'দৈবকণ্ঠ' 'কৃতবিদ্য' দেবেন্দ্রর গীতপটুত্বের বর্ণনায় বেশ সপ্রশংস। 'হরিদাসী বৈষ্ণবী'র 'অপ্সরো-নিন্দিত কণ্ঠগীতি-ধ্বনি'র প্রশংসা করেও লিখেছিলেন, 'সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিতা এবং অল্পবয়সে তাহার পারদর্শী।' (ব র. ১ম. পৃ. ২৭৩)

তার গান কখনো 'সুধাময় সঙ্গীত লহরী' কখনো বা 'প্রথম বসন্ত প্রেরিত একমাত্র ভ্রমর ঝঙ্কারবৎ'। বিচিত্র তার গীত সংগ্রহ। 'কীর্তন' থেকে 'টপ্পা' তার কণ্ঠায়ত্ত।

বঙ্কিমের গুরু যদুভট্ট সিদ্ধ-ধ্রুপদীয়া হিসেবে প্রখ্যাত। কিন্তু সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'যদুভট্টের গানের খাতা'[৭৯] থেকে জানা যায় 'টপ্পা খিয়াল' প্রভৃতি রঙীন গানেও তিনি ওস্তাদ ছিলেন। তাই তাঁর খেতাব ছিল 'রঙ্গনাথ।'

মেদিনীপুরের পাঁচেটগড় থেকে পাওয়া সেই 'খাতার আবিষ্কারক অজয় বিশ্বাস যদুনাথ রচিত বিচিত্র গানের উদাহরণ তুলে ধরে ধ্রুপদীয়া যদুভট্টের অন্য এক রূপের পরিচয় দিয়েছেন। এই গানের তালিকায় আছে 'ঠুংরি'—

'মেরে পিয়াকি সন্দেষও-আ কেয়সে পাঙুরে'।

মধ্যমান খ্যাল—

'জোবনা মদভরিরি কেসে রহুঙ্গ
যেকেলী সখি রে।'

"লুম্ জংলা মধ্যমানে' বাঁধা 'বাংলা গান'—

'সদত হৃদি মাঝারে জারে রাখি
সে কেন য়েমন হল প্রাণ সখি।
জারে মন প্রাণধন কোরিয়াছি সমাপন
তথাপি তাহারি মন না পেয়ে মোজেছে আঁখি'।

এমন কি আছে 'রামপ্রসাদী সুরে'র ও 'বাউলাঙ্গের' বেশ কয়েকটি গান।

১২৭২ সাল থেকে ১২৮০ সালের মধ্যে লেখা চারশো হিন্দুস্থানী ও বাংলা গানের ভাণ্ডার এই খাতা। বহু গানের আর্তিতে ধরা পড়ে কোনো অতৃপ্ত প্রেমের হুতাশ। বঙ্কিম তাঁর গুরুর কত গান শুনেছিলেন তা জানার উপায় নেই। তবে যদুভট্টের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বিচিত্র গান শোনার সৌভাগ্য তাঁর অবশ্যই হয়েছে।

অনুমান করতে পারি, দেবেন্দ্র হীরাকে উপলক্ষ্য করে নিজের প্রণয়ী জীবনের হাহাশ্বাস উজাড় করেছিল। কুন্দের জন্যে বিরহী প্রেমের আকুতি নিবেদন করেছিল। তাই সেই সঙ্গীতে ছিল 'মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ'। সে গান হয়েছিল 'সুধাময় সঙ্গীতলহরী'।

দেবেন্দ্র যত পাপিষ্ঠই হোক না কেন, তার প্রতি কোথায় যেন বঙ্কিমের দুর্বলতা ছিল। দাম্পত্য-জীবনে অসুখী, গৃহসংসার হারা, নিঃসঙ্গ, হতভাগ্য, সুরাসক্ত অথচ অসামান্য সঙ্গীত কুশল এই কলঙ্কিত নায়ককে বঙ্কিম কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় বেঁধে পাপিষ্ঠ করেছেন। শেষে মৃত্যুকালে ভয়, অনুশোচনা ও ঈশ্বরের 'পদপল্লবমুদারম্'-এর কৃপাকণালাভের মধ্যে দিয়ে তার মুক্তিও ঘটিয়েছেন। (ব র. ১ম. পৃ. ৩৪২)

কিন্তু কোনো কৃপা, করুণা পাননি নগেন্দ্র ও হীরা। দেবেন্দ্রর 'কাঁটার বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল' গান এবং তার পরের 'স্মৃতিশাস্ত্র পড়বো আমি ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধোরে' (ব. র. ১ম. পৃ. ২৮৫) গীতিপদের শ্লেষ নগেন্দ্রকেও স্পর্শ করে।

সূর্যমুখীর মতো প্রেমময়ী সাধ্বী পত্নী থাকা সত্ত্বেও নগেন্দ্র 'নবীন মুকুল' কুন্দের রূপ মোহে মজে তাকে পাবার জন্যে লোভী হয়েছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বহুবিবাহ প্রথার আশ্রয় নিয়ে কুন্দকে বিবাহ করে সুখের সংসারে

অশান্তির আগুনে জ্বালিয়েছিলেন। শাস্ত্র, যুক্তি, আইন, যা কিছু মেনে বিধবা বিবাহ করে কুন্দের প্রতি তাঁর প্রেম বৈধ করুন না কেন প্রকৃতপক্ষে কাম-ই ছিল সেই বিবাহের তাগিদ। 'আত্ম-সুখার্থে' এই বিবাহ। তাই সেই 'কাম' তাঁর জীবনেও বয়ে এনেছে গরল-জ্বালা। বিষ-পানে কুন্দ জীবন-জ্বালা জুড়িয়েছে। শুধু স্মরগরলের মন্থর ক্রিয়ার জ্বালা থেকে অব্যাহতি পাননি নগেন্দ্র। স্মরগরলে জর্জরিত পাগলিনী হীরার বুকভাঙা গান 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্' (ব র, ১ম. পৃ ৩৪২) গভীর রাত্রির বুক চিরে নগেন্দ্রর বুকে বিঁধবে—তাঁকে স্বস্তি দেবে না, বোধ করি এই 'জীয়ত মরত কি বিধান'—জীয়ন্তে মরণরূপ এই শাস্তি বঙ্কিম তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করেছিলেন।

'প্রাচীন গীত' ও 'মল বাজানর গান'।

—ইন্দিরা।

'স্মরগরলে' আবিল 'বিষবৃক্ষে'র শ্বাসরোধকরা সমাজ ও গীত-জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছেন বঙ্কিম তাঁর 'ইন্দিরা'য় (১৮৭৫)।

এখন লঘু সরস রঙ্গকৌতুকে ভরা রম্য জীবন ও গানের জগতে তিনি বিচরণ করেছেন। মুক্ত প্রকৃতির বক্ষে অবাধে বয়ে যাওয়া 'পুণ্যময়ী গঙ্গা'র মতো নির্মল স্বচ্ছন্দ লোকগানের গ্রামীণ ধারায় গা ভাসিয়ে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। 'প্রাচীন গীত' বৈষ্ণব পদগান ও সহজ লোকগীত 'মল-বাজান'র গানে তাঁর চিত্ত ক্ষণিকের বিশ্রাম পেয়েছে। নায়িকা ইন্দিরার মতো তিনিও এই গানের জগতে ফিরে এসে বুঝি বর্তমান জীবন ও সংসারের 'এত দুঃখ' 'মুহূর্তের জন্যে সব' ভুলেছেন।

গ্রাম-বাংলার শান্ত সরল নির্মল-সুখদায়ী প্রকৃতি মনে যে অমল আনন্দের গুঞ্জরণ তোলে গ্রামীণ লোক প্রায় অকপট সুরে, ভাবে ও ভাষায় তা প্রকাশ করে এসেছে প্রাচীন কাল থেকেই।

জয়দেব ও পদাবলীর পরিশীলিত প্রবন্ধ-সঙ্গীত এবং ভক্তিগীতির পাশা-পাশি বয়ে চলেছে এই বাংলাদেশে অনাড়ম্বর লোকসঙ্গীতের সাবলীল অনায়াস ধারা। বিদগ্ধচিত্ত বঙ্কিম মুগ্ধ হন সুখী হন অতি সহজ সরল এই লোক-

গানের আবেদনে। তাঁর কাছে এ যে 'মা'র প্রসাদ'।

> জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মা-র প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিসগুলি মা-র প্রসাদ।
>
> (ব র ২য়, পৃ ৮৩৬)

লোকগানের মতো সহজ সরল ভাবে লেখা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেছিলেন এই কথা। এই কবিতার আস্বাদ্য রস বিচার করতে গিয়ে তুলনা দিয়েছিলেন তাঁর লোকগীতি শোনার এক বিশেষ অভিজ্ঞতার—

> একবার বর্ষার এক সন্ধ্যায় প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ তরঙ্গ-চঞ্চলা ভাগীরথীর আলো-আঁধারি মায়ায় ঘেরা উদাস সৌন্দর্য বঙ্কিমের সামনে যেন কাব্যের রাজ্য উপস্থিত করেছিল। তাঁর মন তখন চাইছিল তারই সুর সামঞ্জস্যে কাব্য পাঠ করে 'তৃপ্তি সাধন' করতে। কিন্তু তিনি জানান, "সেদিন শেক্‌স্‌পীয়র, কালিদাস, ভবভূতি এমন কি মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম।
>
> এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—
>
> 'সাধো আছে মা মনে।
> দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
> জাহ্নবী জীবনে।'
>
> তখন প্রাণ জুড়াইল, মনের সুর মিলিল, বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এই জাহ্নবী জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় জগৎ, সকলেই আপনার বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"
>
> (ব র ২য়, পৃ. ৮৩৬)

বিশেষ প্রাকৃতিক ও মানসিক মুহূর্তে বিশেষ গানের বিশেষ সুরই কেবল পাবে প্রকৃতি-প্রাণের সঙ্গে মানবমনের সুরে সুরে সুর মেলাতে।

তাই 'বিষবৃক্ষে'র স্নায়বিক চাপের পর যখন অলস-শিথিল অবসর কামনায় বঙ্কিমের মন 'ইন্দিরা'র মতো হালকা চালের রম্য কথায় নির্ভার হতে চাইল তখন সেই সহজ সুরে মেলানো 'মল-বাজানর গান' এল তাঁর মনে।

'প্রশস্ত-হৃদয়' গঙ্গার তীর-শোভায় মুগ্ধ হয়েছিল নৌকা-বক্ষে ভেসে চলা ইন্দিরা। প্রকৃতির সহজ সুধায় স্নিগ্ধ হয়েছিল তার মন। ইন্দিরার আত্মকথায় ফুটে উঠেছিল সেই কথা। নদীতে জল ভরার খেলায় আমোদ আহ্লাদে উথলে-

পড়া বঙ্গবধূ দেখে মনে পড়ে তার বসু রামানন্দের প্রাচীন কীর্তন

'একা কাঁখে কুম্ভ করি,
কলসীতে জল ভরি
জলের ভিতরে শ্যামরায় !
কলসীতে দিতে ঢেউ, আর না দেখিলাম কেউ,
পুন কানু জলেতে লুকায়। (ব র. ১ম, পৃ. ৩৪৯)

আকস্মিক ঘটনায় ইন্দিরা স্বামী বিচ্ছিন্না। তার বিরহী মনের গোপন আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যথার পরিচয় গানের ছলেই দিয়েছেন বঙ্কিম। আবার সেই ব্যথা জুড়িয়েছেনও ঘাটের রাণায় জল নিতে নামা দুই বালিকার 'মল বাজানর গানে'। কচি-কণ্ঠের সেই জুড়ি গান ইন্দিরার বড়ো 'মিষ্ট' লাগে। বালিকাদের 'একজন একপদ গায়, আর একজন দ্বিতীয় পদ গায়।' নাম তাদের 'অমলা' ও 'নির্ম্মলা'। পুরো গানটি বঙ্কিম শোনাতে চান। বুঝি 'জোয়ারের জলের গানে'র এই নমুনা ধরে রাখতে চান তাঁর উপন্যাসের পাতায়।

প্রথমে গায়িল—

অমলা

ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে
বাঁশ তলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥

নির্ম্মলা

ঘাটটি জুড়ে, গাছটি বেড়ে
ফুটল ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥

অমলা

বিনোদ বেশে মুচকি হেসে,
খুলব হাসির কল
কলসী ধরে গরব করে
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই জল আনিগে
জল আনিগে চল ॥

নির্মলা

গহনা গায়ে, আলতা পায়ে,
কল্কাদার আঁচল।
ঢিমে চালে তালে তালে
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই জল আনিগে,
জল আনিগে চল ॥

অমলা

যত ছেলে, খেলা ফেলে,
ফিরচে দলে দল।
কত বুড়ী, জুজুবুড়ী
ধরবে কত জল,
আমরা মুচ্‌কে হেসে, বিনোদ বেশে
বাজিয়ে যাব মল।
আমরা বাজিয়ে যাব মল,
সই, বাজিয়ে যাব মল ॥

দুইজনে

আয় আয় সই, জল আনিগে
জল আনিগে চল। (ব. র. ১ম, পৃ. ৩৪৯-৫০)

বঙ্কিম বোঝেন, মল-বাজানর গান 'ষোল বছরের মেয়ের মুখে ভাল শুনাইত না বটে, সাত বছরের মেয়ের মুখে বেশ শুনায়।' ইন্দিরা কিন্তু এ গান 'মনোযোগ পূর্বক' শুনেছে। বলেছে, 'বালিকা-সিঞ্চিত রসে, এ জীবন কিছু শীতল হইল।' একতালা ঝুমুর সুরের সারল্য মনে তার শান্তির পরশ বুলোয়। সংসারের কড়া আঁচে মধ্য দিনের তপ্ত জীবন এই রকম সরল সুর বেয়েই যে শৈশবের অম্লান নির্ভার সময়ের সুখে উজিয়ে গিয়ে শান্তি পেতে চায়। তাই বুঝি বালিকা দুটির নাম রেখেছেন বঙ্কিম 'অমলা' ও নির্মলা'।

এই 'ইন্দিরা' উপন্যাসেই বঙ্কিম ছড়িয়ে রেখেছেন লোক-গানের আর এক নমুনা, গ্রামীণ সংস্কৃতির ফুল্‌কি—'মেয়েলি ছড়ার গান।' ঝুমুর বা মল-বাজানর গানের মতো ছড়া-গান 'নারীদের লোক-সঙ্গীত'। লোকগীতি সংগ্রাহক ও 'হারামণি'র লেখক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন লিখেছেন, 'নারীদের লোক-সঙ্গীতে একটু কোমলতা একটু স্নিগ্ধতা পাওয়া যায়।' বঙ্কিম তাঁর 'ইন্দিরা'য় 'কোমলতা'

ও 'স্নিগ্ধতা' প্রত্যাশী। তাই তাঁর মন এখন ঘুরে বেড়ায় মেয়েলি সংস্কৃতির লোকগানের জগতে।

'কপালকুণ্ডলা'য় শ্যামাসুন্দরীর কথায় কথায় 'শৈশবাভ্যস্ত কবিতা' আওড়ানো স্বভাবের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম সেকালের ঘরোয়া মেয়েদের সাহিত্য রস তৃষ্ণা ও অশিক্ষিতপটুত্বের সামর্থ্যের ইঙ্গিত প্রথম দিয়েছিলেন।

(ব র ১ম, পৃ ১০৮)

'ইন্দিরা'তে এক পাঁচ বছরের বালিকার কোমল কচিকণ্ঠে শোনালেন বেশ কিছু সুরে বাঁধা শোলোক। যেমন—

'রাঁধ বেশ, বাঁধ কেশ
বকুল ফুলের মালা
রাঙ্গা শাড়ি, হাতে হাঁড়ী
রাঁধছে গোয়ালার বালা॥
এমন সময়, বাজল বাঁশী,
কদম্বের তলে।
কাঁদিয়ে ছেলে, রান্না ফেলে,
রাঁধুনি ছোটে জলে॥' (ব. র ১ম, পৃ ৩৫৫)

'চলে বুড়ি, শোণের নুড়ি,
খোঁপায় ঘেঁটু ফুল।
হাতে নড়ি, গলায় দড়ী,
কানে জোড়া দুল।' (ব. র. ১ম., পৃ. ৩৫৯)

'যম বলেছে সোনার চাঁদ
এস আমার ঘরে।
তাই ঘাটের সজ্জা, সাজিয়ে দিলে
সিঁদুরে গোবরে।
যে ডাকে যমে
তার পরমাই কমে।
তার মুখে পড়ুক ছাই।
বুড়ি মরে যা না ভাই।' (ব. র. ১ম., পৃ ৩৬১)

এর আগে 'বিষবৃক্ষ'তে বালকদের সরল আমোদ কৌতুক প্রসঙ্গে কিছু ছেলে-ভুলানো ছড়ার ব্যবহার বঙ্কিম করেছিলেন—

'হীরার আয়ি বুড়ি।

গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে গুড়ি গুড়ি।
দাঁতে ভাঙে নুড়ি।
কাঁঠাল খায় দেড় বুড়ি।'
"লাল চাঁদ সিং
নাচে তিড়িং মিড়িং,
ডাল রুটির যম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।"

(ব. র. ১ম পৃ. ৩২৯)

'রামচরণ দোবে, সন্ধ্যাবেলা শোবে,
চোর এলে কোথায় পালাবে ?' (ঐ)

'ছেলে ভুলানো ছড়া : ২—ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে একটি আদিম সৌকুমার্য আছে ; সেই মাধুর্য-টিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পাবে ···তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস। শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলা দেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদবশত সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য। ··কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে ; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃ মাতামহীগণের স্নেহ সংগীত স্বর জড়িত হইয়া আছে।'

(র. র. জন্মশত সং ১৩, পৃ. ৬৮৯-৯০)

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছিলেন—

এই গ্রাম্য ছড়াগুলি গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের ও সাহিত্য রস-তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য ভিখারিণী ও পিতামহীদের মুখে মুখে ঘরে ঘরে প্রচারিত হইত। (র. র. জন্মশত সং ১৩ খণ্ড, পৃ. ৭১৮)

বাড়ির বালকবালিকারা সে ছড়া শুনে শুনে মনে মনে গেঁথেও নিত। যেমন নিয়েছিল বঙ্কিমের 'ইন্দিরা'র সুভাষিণীর পাঁচবছরের শোলোক-পড়া মেয়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের বৃহৎ অন্দরমহলে বসেই এই 'জাতীয় সম্পত্তি' ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন এবং ছড়া সংগ্রাহক রবীন্দ্রনাথের আগেই নিজের উপন্যাসের ডালিতে তার কিছু নমুনা সাজিয়ে একটি প্রধান 'কর্তব্য' সম্পাদনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন তাঁর 'হারামণি'র (৮ম) ভূমিকায় লিখেছিলেন (পৃ. ৬৬)—

বিশ্বের সব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার লোকসাহিত্য। বাংলা সাহিত্যের বেলাতেও সেই একই কথা। আমাদের গ্রাম বাংলার মাটির মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই হারামণি।...

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবার আগে এই হারামণি খুঁজতে শুরু করেন। 'মৃণালিনী'র গিরিজায়ার গানেই 'হারামণি' খুঁজে ফেরা বঙ্কিমের খবর পাই। 'ইন্দিরা'য় বঙ্কিম আবার প্রমাণ করেন 'হারামণি'র সন্ধানে তিনিই প্রথম পথিক।

'বিষবৃক্ষে'র আগে 'মৃণালিনী'তে বাংলার উঁচু মানের গান কীর্তন ও বাউলের দৃষ্টান্ত সাজিয়ে এবং পরে 'ইন্দিরা'য় অনাবিল সাদা সুরের লোক-গানের উদাহরণ দিয়ে বঙ্কিম বোঝালেন, তাঁর সমকালের নাগরিক সমাজের গান বাঙালীর স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ লোকজীবনপ্রবাহ থেকে সরে আসা সমাজজীবনের মতোই উদ্‌ভ্রান্ত।

এ কালের সমাজের ধর্মধ্বজাধারী ও আইনবিদেরাই ধর্মাধর্ম ও কৃত্যাকৃত্য সম্পর্কে ধ্রুব সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এক ধরনের জোড়াতাপ্পি মারা নিষ্পত্তিতে পৌঁছন। এ সমাজে একদিকে রয়েছে আমদানি করা শিক্ষা-সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিমানে নাক-উঁচু বিদগ্ধ সমাজ, অন্য দিকে আছে শিক্ষা-সংস্কৃতির বনেদহীন ও হঠাৎ পয়সাওয়ালা ভুঁইফোঁড় শ্রেণী। তাই সেখানে দেশজ শিল্প সংস্কৃতি কোন মৌল পথ বেছে নেবে এক চোরা-গতি ছাড়া?

এ সমাজে মিল ছিল না তথাকথিত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাবুদের সদর মহলের সঙ্গে অন্দরের, বাইরের ঠাটের সঙ্গে অন্তরের। জট পাকিয়েছিল ব্যক্তি চরিত্রে, জীবনে সংসারে। সেই জটপাকানো ধাঁধার খেলা খেলেছিলেন বঙ্কিম 'ইন্দিরা'য়। দেখিয়েছিলেন, 'উ-বাবু'রা যখন পশ্চিমাঞ্চলে কালোয়াতী শিক্ষা পেয়ে ভাল 'সনদী খিয়াল' গান তাঁর রসবতী অন্দরবাসিনীরা রস গ্রহণ করে না তার। তাদের রুচি বদন অধিকারীর যাত্রা কিংবা দাশুরায়ের পাঁচালী গানে। উ-বাবুর সেসব গানে কৌতূহলও নেই। এই রুচি ফারাকেই দুই মহলে ঘনিয়েছে জমাট অন্ধকার। বাবু আসক্ত বাগানবাড়ির রুদ্ধদ্বার জলসাঘরের কালোয়াতী খিয়াল টপ্পা ঠুংরি গানে, ও ওড়না পেশোয়াজের সাজ চাপানো নাচে। আর পুরবধূরা মত্ত খিল আঁটা বাসরঘরের 'অশ্লীল' 'নির্লজ্জ', 'দুর্নীতিপূর্ণ' ভাঁড়ামোভরা রঙ্গ-রসে।

কিন্তু উ-বাবুর মতো নব্যশিক্ষিত নববাবু বরেরা প্রশ্রয় দেন এই বাসর

ঘরের মহিলা মজলিশের। এ কি তাঁদের অন্তরের অবতলের অন্ধকারের সঙ্গে অবহেলিত অশিক্ষিত অবদমিত অন্তরালবাসিনীদের অন্ধকার একাকার হয়ে যায় বলে ?

'অধঃপতন সঙ্গীতে'র বাগানবাড়িবিলাসী 'বাবু' যিনি খেদভরে শোনান—

'ঘরে আছে পদ্মমুখী, কভু না করিল সুখী
শুধু ভালোবাসা নিয়ে কি হবে সংসারে।
নাহি জানে নৃত্য গীত ইয়ারকিতে নাহি চিত,
একা বসি ভালবাসা, ভাল লাগে কারে ?'

তাঁর সঙ্গে বাসর মজলিশের উ বাবুর সমীকরণ বঙ্কিম অবশ্যই 'মুচকে হেসে বিনোদ বেশে' 'ইন্দিরা'য় কষেছেন। (ব. র. ১ম., পৃ. ৩৮২-৩৮৬)

এখানে 'মল বাজানর গান' ও 'ছড়া গানে'র সহজ সুন্দর মেয়েলি সংস্কৃতির পাশে ইচ্ছে করেই বঙ্কিম বাসরঘরের 'ঠাকরুন'দের সং-সাজার বিবরণ দিয়েছেন। বাগানবাড়ির মোহিনীদের ছলাকলার গান নাচ আর 'ঠাকরুন'দের এই সং-সাজের উদ্দেশ্য তো এক। কেন্দ্রীয় পুরুষটির মন ভোলানো আর নজর টানা। জোয়ারের জলের গানের মতো হঠাৎ খুশীতে মেতে অকারণ গান গাইবার নির্মল পরিবেশ যে 'বাবু'দের সংসার হারিয়েছে। বাবুরা এখন নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রী ও পরস্ত্রীকে নিজের স্ত্রী ভেবে সুখ পান। তাই আবিলতা এসেছে কুল-স্ত্রীদের প্রমোদ, বিনোদনেও। নিষ্পাপ ইন্দিরা স্বামীর মন পাবার জন্যেই 'অমলা' থাকতে পারেন না আর। 'বিদ্যেধরী'র জাল সাজে সাজতে হয় তাঁকেও ; অভিনয় করতে হয় কুলটা উপপত্নীর ভূমিকায়। জাত মান খোয়ানোর ভয়ে ধর্মপত্নীর খোঁজ নেন না উ বাবু। কিন্তু 'বিদ্যেধরী'র মোহিনী মায়ার ফাঁদে ধরা দেন এককথায় এবং নির্বিকার চিত্তে।

সাহেবের কমিসরিয়েটে কাজ করে ধনে মানে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' (ব. র. ১ম., পৃ. ৩৪৩) উ বাবুদের যে চিত্ত ছিল নিঃস্ব। 'মহিলা মজলিশে'র 'অশোভন আচরণ' বা শ্যালিকার 'নাচ' উপভোগ করার বেলায় তাঁদের 'ইংরেজ রুচি'। (ব. র. ১ম., পৃ. ৩৮৪) 'সনদী খিয়াল' শিক্ষা করেন তাঁরা কুণ্টিবান হিসেবে নাম কিনে সমাজের উঁচু জাতে উঠবেন বলে। মনে রাখতে হবে রাম-মোহনের মতো অভিজাত 'রাজা' কালোয়াতী নাচ-গানের দিকে বাঙালীর রুচি ফিরিয়েছিলেন। সাহেবদের কাছেও হিন্দুস্থানী গানের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাঁদের মতে—'Indian music···possessing intrinsic claim to beauty. কিন্তু লোকসঙ্গীত বা দিশি গান 'melody of confusion and noise.'[৫০]

কিন্তু এই তালগোল পাকানো সমাজ ও তার ডামাডোলের কৃষ্টি তো সাহেবদের তৈরী। তাঁদেরই গড়া কৃত্রিম ও আজব শহর কলকাতা আর আজব 'বাবু' (ব. র. ২য়, পৃ. ১০) সমাজ। তা বাংলার আদি অকৃত্রিম সহজ জীবনের ধারা-ভ্রষ্ট বলেই এমন অন্তঃসারশূন্য।

'কমলাকান্তের দপ্তরে' কার্টুনিস্ট কমলাকান্ত সাহেব-রাজের কৃপা ছিটানোর ফলাফল 'নেটিভ'দের চিত্ত নিঃস্বতা তাঁর 'যথার্থ' পে-বিলে'র একটি আঁচড়েই বুঝিয়েছিলেন।

তবে 'ইন্দিরা'য় বঙ্কিম অবসর বিনোদনের বিনোদ বেশে রয়েছেন। এখন তাঁর মেজাজ একটু স্নিগ্ধ একটু কোমল। ইন্দিরা যেমন বাসরঘরের মজলিশের বাইরে বেরিয়ে এসে চুপি চুপি উঁকি মেরে দোরবন্ধ ঘরের রঙ্গভঙ্গি উপভোগ করেছিল, যেন বঙ্কিম ঠিক সেইভাবে তাঁর সমাজ থেকে তটস্থ হয়ে তার ছেলেমানুষী কান্ডকারখানা কৌতুক-ভরে দেখে গেছেন। তাঁর আধুনিক সময়ের অসঙ্গতির রূঢ় সুরটিকে সূক্ষ্ম শ্লেষের নিপুণ-মীড়ের চকিত চমকে ছুঁয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সহজ জীবনসুখের শমে এসেই বিরাম নিয়েছেন। ছেলেমানুষী খেলার ঢং-এ জীবনজট ছাড়িয়ে নায়ক-নায়িকার মিলনে এ কাহিনীর মধুর সমাপন। হালকা খুশীর 'মল বাজানর গান' তাই 'ইন্দিরা'র যথার্থ আবহসঙ্গীত।

'শিখো হো ছল ভালা'।

—চন্দ্রশেখর।

উনিশ শতকীয় বাংলার জটপাকানো সমাজ ও তার melody of confusion-এ ভরা জীবনরঙ্গের নাটের গুরু হিসেবে বঙ্কিম দুটি শক্তিকে দায়ী করেছিলেন। এই দুই শক্তি হল স্বদেশী ধর্মধ্বজাধারী স্মৃতিশাস্ত্রবিদদের অনুশাসন এবং বিদেশী বণিক রাজের শাসনপ্রভাবে গড়ে ওঠা নব্য সংস্কৃতির আকর্ষণ। বঙ্কিম লক্ষ্য করেছিলেন, সে সময় একদিকে বর্ণাশ্রমের বলয়ে বাঁধা হিন্দুসমাজ জাতি-কুলমান সম্পর্কে স্মার্তপন্ডিতদের বিধিনিষেধের তর্জনী সংকেতে জীবনের সহজ সুখের সুধায় বঞ্চিত হয়েছিল, এবং তার ফলে হয় চোরাপথ ধরেছিল নতুবা হয়েছিল বিকারগ্রস্ত। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের কারসাজিতে গড়ে ওঠা নতুন রুচি ও চাহিদার মোহে সমগ্র সমাজ সহজ ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিল এবং

স্বাভাবিকতা হারিয়ে হয়েছিল উদ্‌ভ্রান্ত।

অতৃপ্তি আর আকাঙ্ক্ষার টানাপোড়েন এ যুগের সামাজিকের জীবন ও মনের ওলটপালট জটের খেলার কারণ। তার রূপের মধ্যে আর এক রূপ, মনের মধ্যে আর এক মনের বসত। তার গানও নয় আর ছেলেবেলার 'মল বাজানর গানে'র মতো সহজ সরল। ধন্দলাগা গানের ভাষায় এখন উন্মোচিত হয় গভীর গোপন কত 'মরম-কথা'।

গানের ছলেই এই গভীর ও নিবিড় অনুভবের সত্যকে বঙ্কিম প্রকাশ করেছেন তাঁর 'চন্দ্রশেখরে' (১৮৭৫)। গান 'চন্দ্রশেখরে' জটিল চরিত্রের মনো-বিকলনের প্রধান উপকরণ।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদের শুরু মীরকাশেমের স্ত্রী দলনী বেগমের গানের দৃশ্যে দিয়ে। এই খণ্ড ও পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'পাপীয়সী'। যদিও কোনো পাপ ক্রিয়ার অবতারণা এখানে নেই। শুধু গীতোদ্যমের পূর্ব মুহূর্তে দলনীর স্বগত উক্তি, 'যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায় তাকে সে চায় কেন?' এই 'চাওয়া পাওয়া'র দ্বন্দ্ব, অতৃপ্তি আর আকাঙ্ক্ষা বুঝি তার মনে জাগায় নিষিদ্ধ ভাবনা। সে অন্যের অশ্রুত স্বরে গায় কি বাল্যপ্রণয়ের গান? অথচ সে প্রতীক্ষা করে স্বামী মীরকাশেমের। এই দ্বিচারিতাই কি পাপ? নিষ্পাপ দলনীর এই গানেই ঘনিয়েছিল ধন্দ। কেন সহসা স্বামীকে কাছে পেয়ে সে হয় গীতস্তব্ধ! সুরহারা! সুরে বাজে না তার হাতে অন্য কোনো বাজনা। বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুরে বাঁধে না। দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরো বলিতে লাগিল।

এখন দলনীর দুর্ভাগ্যক্রমে নবাব বলিলেন, 'তুমি যাহা গায়িতেছিলে, গাও আমি শুনিব'। দলনী প্রথমে বেসুরো বাজনার ছুতো করেছে ; শেষে 'ইংরেজী বাজনা'র বাহানা তুলে বলেছে, 'আমি গায়িব না'। গায়নি সে। যে গান সে নির্জনে ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে, শ্রোতার ভয়ে ভীত হয়ে শুরু করেছিল সে গান তার স্বামীকে শোনাতে চায় না। কারণ সে গান তার গোপন কথার গান। তার ব্যর্থ প্রণয়ের গান। লজ্জায় নয়, স্বামী মীরকাশেমের আবির্ভাবে, বর্তমান সত্তার রূঢ় বাস্তবে ফিরে আসার আকস্মিকতায় তার অতীত স্মৃতি রোমন্থনের মধুর সুর কেটে গিয়েছিল। তাই সুরে বাজেনি আর তার কোনো গান।

এই স্মৃতি ও সত্তার সংঘাত বেদনায় গুমরানো কান্নার সুর 'চন্দ্রশেখরে'র নেপথ্য সঙ্গীত। অতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্বে দীর্ণ এক পাগলিনীর অন্তর ভাষা 'চন্দ্রশেখরে'র গান।

এ উপন্যাসের সব গানই শৈবলিনী গেয়েছে। 'ভীমা পুষ্করিণী'তে (১ম খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ) সই-এর সঙ্গে সুখে রঙ্গে সাঁতার কাটতে কাটতে প্রথম গান শোনায় শৈবলিনী। গানের প্রতি তার গোপন ভালবাসা। তাই সই সুন্দরীকে তার অনুরোধ—'কেহ নাই, ভাই চুপি চুপি একটি গান গা না।' কিন্তু সুন্দরীর উত্তর 'দূর হ! পাপ! ঘরে চ।'

দলনীর গীতদৃশ্যে দেখান বঙ্কিম গান বাজনা মুসলিম সমাজে সংস্কৃতির অঙ্গ। বাদশা বেগমের গান শুনতে চান। বেগম অনায়াসে বাদশার কাছে নতুন ইংরেজী বাজনার বায়না ধরেন। কিন্তু গান সম্পর্কে সামাজিক নিষেধ শুধু হিন্দু কুলবতী নারী-সমাজে। নিভৃতে রমণীর গান গাওয়াও 'পাপ'।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় সরলা দেবী চৌধুরাণীর বিবৃতি।[১১]

এমন দিন ছিল যখন এই বাংলায় ভদ্রপরিবারে মেয়েদের মধ্যে সঙ্গীত চর্চা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। যখন নিজের বাড়ির মেয়েদের কণ্ঠেও প্রকাশ্যে গান শোনা নিতান্ত দুর্লভ ছিল।

তখন গান গাইত শুধু 'হরিদাসী'র মতো বৈষ্ণবী ভিখারিনী আর 'হীরা'র মতো 'কুলটা' রমণী। সূর্যমুখী, কুন্দ বা ইন্দিরার মুখে গান শোভা পেত না। তাঁদের গীত-পিপাসা তাই 'বাসর ঘরে'র দোর-আঁটা মহিলা মজলিশে বিকৃত রূপ নিত। এমন কি ফুলশয্যার রাতে নিজের স্বামীকেও ভালবাসার গান শোনাবার অধিকার ছিল না কুলবতী ধর্মপত্নীদের। গঞ্জনা সইতে হত দাশরথি রায়ের মতো নামী গায়কের হুল ফোটানো গানে[১২]—

> 'যিনি মুখ দেখান না কুলের বধূ,
> তিনি সে রাত্রে গান নিধু
> রসের ছড়ায় খই ফুটে যার মুখে।'

একালে, দম্পতী প্রণয়ে সুখী পুরুষের বহুস্ত্রীভাগী হওয়ায় দোষ নেই। এ সমাজে ব্যর্থ প্রণয়িনী নারীর মনে মনে দ্বিচারিতাও 'পাপ'। বাগান-বাড়ি আসক্তি এ যুগের পুরুষের সম্ভ্রান্ত বিলাস। কিন্তু সুরের মধ্যে দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মোন্মোচন নারীর পক্ষে কলংক।

এই পাপ আর কলঙ্কের ভয়েই শৈবলিনীরা ছল ছুতোর আড়াল নেয়। গাইবার সুযোগ খোঁজে নিরালায় জল-ভরার কিংবা নাইতে নামার ছুতোয়। সরল গানের ছলে উজাড় করতে চায় তাদের গোপন মনের গূঢ় জটিল ভাষা।

সুন্দরীর বারণ মেনে নেয়নি শৈবলিনী। ঝুমুরওয়ালীর গানের ঢঙে সে নিজেই গেয়ে ওঠে রসের গান।

'ঘরে যাব না লো সই,
আমার মদন মোহন আসছে ওই,
ঘরে যাব না লো সই।'

'ঝুমুর' গান সম্পর্কে বলা হয়—'প্রাচীন বাংলায় গ্রামীণ সমাজে আদিরস ঘটিত হালকা ধরনের শিথিল ছন্দের এক প্রকার গান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং কালক্রমে সেই ঝুমুর কখনও কীর্তনে, কখনও বা লোকাভিনয়ে অর্থাৎ যাত্রাগানে অনুপ্রবেশ করেছিল। তখনও ঝুমুর ছিল কৃষ্ণলীলার গান।'[৫৩]

উনিশ শতকের কলকাতায় রাম বসুর প্রণয়িনী যজ্ঞেশ্বরীর ঝুমুর ও কবিগানে খ্যাতি ছিল। কবিগানের সুরও মূলত একতালা ঝুমুর সুর। ঝুমুরই কবিগানের উৎস—কেউ কেউ মনে করেন।[৫৪]

'শৈবলিনী'র ঝুমুর সুরের গানে বঙ্কিম দিতে চান তার স্বভাবের তারল্য ও শৈথিল্যের ইঙ্গিত। তার কৃষ্ণলীলা বিষয়ক 'ঘরে যাব না' গানে রয়েছে 'কুল-মরিয়া'দের কপাট ভাঙার নাটকীয় সংকেত। রয়েছে নিষিদ্ধ প্রেমের গোপন আভাস।

শৈবলিনীর এই প্রথম গানেই বঙ্কিম বুলিয়ে রেখেছেন অস্বাভাবিকতার আবছা পরশ এবং সেই সঙ্গে নাট্যকৌতূহল। ভর সন্ধেবেলা কুলবধূ কেন গাইবে ঘরে-না ফেরার গান! কেন প্রতীক্ষা তার আন্-বঁধূ মদনমোহনের জন্যে!

আমরা জানি, শেক্স্‌পীয়র তাঁর 'হ্যামলেটে'র ওফিলিয়াকে দিয়ে 'Tomorrow is St Valentine's day'[৫৫] গাইয়েছিলেন তার মতিচ্ছন্ন দশায়। সেই গান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত[৫৬]—

> Tragedy is accentuated by Ophelia's ribaldry, a well known feature in female madness, when there is no longer any sound instinct to maintain the guard of modesty so necessary to feminine security.

কিন্তু এখন তো শৈবলিনী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। কেন তবে গায় লজ্জাহীনার গান!

তার 'মদনমোহন' শব্দের উচ্চারণই জানায় শৈবলিনীর চিত্তের ভারসাম্য সুস্থিত নয়। এই শব্দেই রয়েছে আপাতসুখী বিবাহিতা রমণীর অতৃপ্ত দাম্পত্য জীবনের ইঙ্গিত। চন্দ্রশেখর তার মদনমোহন হতে পারেনি। সে-ও নয় তাঁর 'মদনমোহিনী'।

আসলে, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর বিবাহ এক আত্মসমাহিত পুরুষের সঙ্গে

জীবনোচ্ছল প্রকৃতির নারীর বিবাহ। উদাসীনের সঙ্গে উৎকণ্ঠিতের সেই মিলনে সম্ভোগের সিদ্ধি ছিল না। তাই তো 'মদনমোহনে'র জন্য প্রতীক্ষা ফুরোয়নি শৈবলিনীর। ঘোচেনি বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপকে না পাবার বিষম জ্বালা। দলনীর আত্মগত প্রশ্ন তো তারও অন্তর কুরে কুরে খেয়েছে। 'যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন, যাকে না পায় তাকে চায় কেন?'

ব্যর্থ প্রেম, অবদমিত শরীর মন ভেতরে ভেতরে ক্ষইয়ে দিয়েছে শৈবলিনীর সু-নীতির বাঁধ। সামাজিক নিষেধ-নীতির তোয়াক্কা না করেই কলকণ্ঠে তাই গেয়েছে সে অসামাজিক, 'পাপে'র গান। এ গান তো তার বিদ্রোহ। যে সমাজ তাকে বর্ণাশ্রমের নিগড়ে বেঁধে বাল্যপ্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হতে দেয়নি, তার সুখ দুঃখ মোচনের স্বতঃস্ফূর্ত অধিকারটুকুও কেড়ে নিয়ে কণ্ঠরোধ করেছে এ বিদ্রোহ তারই বিরুদ্ধে। সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার তীব্র জেদ তার মনে বাসা বেঁধেছে। তাই সে গায় ঘরে না ফেরার গান। শৈবলিনীর ব্যর্থ যৌবনের বেদনা, অচরিতার্থ জীবনের হদিশ আর তার বেপরোয়া স্বভাবের পরিচয় এই প্রথম গানেই নিহিত।

এ গান শেষ হতে না হতেই, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে, শৈবলিনীর আকাঙ্ক্ষিত 'মদনমোহন' প্রতাপের বদলে তার জীবনে শনির মতো উদিত হল ভিনদেশী ফস্টর। সে এসে ভীমা পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটের নিরাপদ জীবন থেকে শৈবলিনীকে চুরি করে নিয়ে গেল। তাকে ভাসিয়ে দিল এক সর্বনাশা জীবন পরিণামের খরস্রোতে চিরকালের মতো। ঘরে ফেরার সহজ সুখের পথ শৈবলিনীর জীবন আর খুঁজে পেল না।

অনভিপ্রেত ঘটনাপরম্পরার আকস্মিকতার আঘাতে দেহ মনে বিপর্যস্ত সম্পূর্ণ উন্মাদিনী শৈবলিনী এবার গাইল অসংলগ্ন গান। (চতুর্থ খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

'স্বামী আমার সোনার মাছি
বেড়ায় ফুলে ফুলে;
তেকাটাতে এলে সখা, বুঝি পথ ভুলে।'

'হা হা' করে পাগলিনীর হাসি হেসে এই গান গেয়েই স্বামীকে তার প্রশ্ন—'তুমি কি লরেন্স ফস্টর?' (ব. র. ১ম পৃ. ৪৫০)

'A document in madness—thoughts and remembrance fitted.'[৫৭] 'হ্যামলেটে' মন্তব্য শেক্সপীয়রের। শৈবলিনীর মস্তিষ্ককোষে জড়িয়ে আছে লরেন্স ফস্টরের আতঙ্কজনক স্মৃতি। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে তার

প্রায়শ্চিত্ত-পীঠ এক অন্ধকার গুহা থেকে বাইরে বের করে এনে বলেছিলেন—'আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি।' এই 'বাহির' শব্দ ঘর-পালানী শৈবলিনীর অবচেতনে ঘা দিয়ে তার সুপ্ত অপরাধবোধ ও সেই সঙ্গে তার বাইরের জীবনের বিভীষিকাস্মৃতি জাগিয়ে তোলে। তার দুর্বল মস্তিষ্ক ও শরীর তীব্র উত্তেজনার চাপ সইতে পারে না। স্বাভাবিক চৈতন্য সে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আর তখনই ফস্টর ও চন্দ্রশেখর তার কাছে একাকার হয়ে যায়। ফস্টরের স্মৃতি প্রবল হয়ে তার ভাবনা গ্রাস করে। ফস্টরই তাকে ঘর থেকে বাইরে এনে বর্তমান দুর্গতির চরম সীমায় দাঁড় করিয়েছে। সেই স্বর্ণকেশ লম্পট তার দুরদৃষ্টের প্রভু। এই অর্থে, আপাতভাবে এ গান ফস্টরের প্রতি তার তীব্র ক্রোধে, ঘৃণায় ধিক্কারে ও প্রতিহিংসাপিপাসায় শ্লেষভরে ঝরে পড়েছে। গান শৈবলিনীর আত্মমোচনের স্বতঃস্ফূর্ত মাধ্যম। পাগলিনীর স্বতঃস্ফূর্তিতে এখন আর কোনো বিধিনিষেধ নেই।

কিন্তু এই গানের নিগূঢ় স্তরে বঙ্কিম লুকিয়ে রেখেছেন অন্য ব্যঞ্জনা। প্রায়শ্চিত্তব্রতী পাপীয়সী শৈবলিনীর আত্মবিচার ও অপরাধের স্বীকৃতি যেন এই গান।

প্রতীকধর্মী বাউল গানে মনকে বলা হয় 'স্বামী' বা 'সাঁই', 'মনরাজা' 'মনুরায়'। মনই মানুষের প্রবৃত্তিনিবৃত্তি, ধর্মাধর্ম, কৃত্যাকৃত্যের নিয়ন্তা। শৈবলিনীর 'স্বামী' তার স্বেচ্ছাশীল মন। যেন সে-'সোনার মাছি'। সৎ ও শুভ বস্তুতে তার মতি নেই। সে চঞ্চল প্রবৃত্তিপরায়ণ। স্বৈরিণী স্বভাব তার। এই স্বভাববশেই সে প্রতাপের সঙ্গে ডুবে মরতে চেয়েও ভেসে উঠেছে। চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করেছে। কিন্তু মনস্থির করে ঘর বসত করেনি। অতৃপ্তিতে ভুগেছে। প্রতাপ বেঁচে আছে জেনে তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হয়েছে। প্রতাপ-তৃষ্ণায় ফস্টারের কবল থেকেও সে মুক্তি নেয়নি। সুন্দরীর অনুরোধে, সুযোগ পেয়েও ঘরে ফেরেনি সে। তার সর্বনাশা পরিণতির মূল কারণ সে নিজেই। 'তে-কাটা' বা মরণফাঁদে এগিয়ে এসেছে সে নিজেরই ভ্রান্তিতে।

নিজের মূঢ়তায় স্বামীর ভালোবাসাও চিনতে পারেনি সে। সুন্দরী ভর্ৎসনা করেছিল শৈবলিনীকে—'তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালোবাসেন, নারী জন্মে সেরূপ ভালোবাসা দুর্লভ।'

অবশেষে অশেষ দুঃখলাঞ্ছনা ভোগের মধ্য দিয়ে চিনেছে সে তার হৃদয়বান স্বামীকে। উপলব্ধি করেছে 'দুর্লভ ভালবাসা'র স্বরূপ। কিন্তু এই উপলব্ধিই

তার মনে জাগিয়েছে অপরাধবোধ, আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার জ্বালা। এতদিন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তির পক্ষে তার যুক্তি ছিল স্বামী তার প্রতি নিরাসক্ত, অমনোযোগী। তাকে সুখী করার ক্ষমতা বিদ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরের নেই। কিন্তু এখন চন্দ্রশেখরের ক্ষমা, ধৈর্য, মমতামাখা কণ্ঠের আহ্বান তার অন্ধত্ব ঘুচিয়ে তাকে চৈতন্যের আলোয় নিয়ে এল। সেই আলো তার প্রকৃত 'মনোচোর'কে নির্ধারণ করেছে, সেই আলোই সনাক্ত করেছে তার অবচেতনার তলবাসী চোরা মনটির প্রকৃত স্বরূপ। আর তখনই তার অন্তরাত্মা বিবেকের দংশনে পীড়িত হয়ে অসহায় আর্তিতে গানের হাহাশ্বাসে ভেঙে পড়েছে—

'কি করিলে প্রাণসখী মনচোরে ধরিয়ে
ভাসিল পীরিতি নদী দুই কূল ভরিয়ে ॥'

এতদিন শৈবলিনীর বিবেকের উদয় হয়নি। বেশ ছিল সে অন্ধপ্রবৃত্তির বেগে প্রতাপ-মুখী হয়ে। আজ কেন তার 'প্রাণসখী' অন্তরাত্মা আবিষ্কার করল নিদারুণ সত্যকে। যে সত্যকে গ্রহণ করার বা অস্বীকার করার ক্ষমতা তার বিবশ মনের নেই।

তার চেতন মন জানে, চন্দ্রশেখর অনুভূতিপরায়ণ সতত স্নেহশীল উদার স্বামী। ইহজীবনে তিনিই তার একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু তার অবচেতনের চোরামনে যে শিকড় গাঁথা হয়ে রয়েছে বাল্যসাথী প্রতাপের জন্যে কামনা। চন্দ্রশেখর আর প্রতাপ—তার পীরিতি নদী এই দুই কূল ভরেই বহে যায় নিরবধি, সুনীতি আর হৃদয়াবেগের পাড় কাঁপিয়ে। কিছুতেই পতিব্রতা হয় না সে। শত প্রায়শ্চিত্ত যোগবলেও একমুখী করা যায় না তাকে।

সমাজনীতি ও হৃদয়-ধর্মের, বিবেক ও স্বভাবপ্রকৃতির টানাপোড়েনে জট পাকিয়ে যাওয়া দিশেহারা মন তার ফাঁদে পড়া কুরঙ্গিণীর মতো আর্তনাদ করে বুকফাটা গানে। ভাটিয়ালির প্লুত স্বরে ছড়িয়ে যায় তার হুতাশ কোন্ জীবন-নদীর ওপারে—'কি করিলে প্রাণসখী ···।'

ক্ষণিকের উৎক্ষিপ্ত চৈতন্যই শৈবলিনীকে অচেতনার আরও গভীর আঁধারে ঠেলে দেয়। বিকারগ্রস্তা হয় সে।

সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্তা এই শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর যখন বেদগ্রামে নিজের ঘরে ফিরিয়ে আনলেন তখনও সে গীতপিপাসু। যেন তার প্রখর জীবনের দাবদাহে শুষ্ক অন্তর গীতসুধারসে একটু ভিজিয়ে নিলে প্রবল চিত্তপিপাসা কিছুটা মিটবে। তাই, তার এককালের জল-সই সুন্দরীকে দেখেই ভ্রান্ত বুদ্ধিতে তাকে 'পার্বতী' সম্বোধন করে কাতর মিনতি জানায়—'পার্বতী দিদি, একটি গীত গা না'। অনুরোধ শেষে নিজেই গেয়ে ওঠে আপন মনে, ঠিক পুরোনো দিনের

মতোই। কিন্তু এবার আর সুন্দরী নিষেধ করে না তাকে। পাগলিনী তো সব শাসন অনুশাসনের বাইরে।

এখন শৈবলিনী মুক্তকণ্ঠ। অসংকোচে ঝরায় তার মনের কথা।

'আমার মরম কথা তাই লো তাই,
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই।
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ।
মিছে লো পেতেছি পীরিতি ফাঁদ।

ষষ্ঠ খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে পাঠককে আবার 'বেদগ্রামে' ফিরিয়ে এনে বঙ্কিম লিখেছেন—'বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিলেন।' কিন্তু এ কোন্ শৈবলিনী? অনেক দুঃখের মেঘে ম্লান চন্দ্রশেখরের জীবনে তাঁর এ কোন্ স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনলেন। কোথায় তাঁর চাঁদের কিরণবর্ষী শান্ত গৃহদীপ্তি। সুখোদয় এ জীবনে তাঁর হল না। এত যে ভালোবাসাভরা আয়োজন সব বৃথা হল। যেন এই করুণ সত্য এ গানের মর্মবাণী।

কিন্তু এ গানের 'মরম কথা' লুকিয়ে আছে অনুক্ত প্রশ্নে। সে 'রাই' সে 'চাঁদ' নেই কেন? রাই উন্মাদিনীর 'শ্যাম' কে? 'চাঁদ'ই বা কি? কোন্ 'শ্যাম'কে পেলে 'রাই'-এর সব দুঃখ ঘোচে? সে কি চন্দ্রশেখর?

অসংলগ্ন প্রলাপে পাগলিনী প্রথমেই জানিয়েছিল প্রতাপের প্রেমই তাকে গ্রাস করেছে।

'একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল; মেয়েটি ব্যাঙ্ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙ্‌টিকে গিলিয়া ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

(ব. র. ১ম. পৃ. ৪৫০)

এই সাপ কি শৈবলিনীর অবরুদ্ধ কাম বাসনার প্রতীক? অচরিতার্থ বাসনাই তো 'রাই' উন্মাদিনীকে কিছুতেই সুস্থ হতে দেয়নি। তার 'অন্ধত্ব' জীবনেও ঘোচেনি। উজ্জ্বল শান্ত বুদ্ধির উদয় হয়নি কখনো। মন ও জীবনের অন্ধকার ঘোচানো সুখ ও শান্তি এ জনমে পায়নি শৈবলিনী। চন্দ্রশেখরকে ভালোবাসার কত রকম কৌশল—প্রায়শ্চিত্ত, যোগবল, চিত্তশুদ্ধি সবই শেষ পর্যন্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে গেছে।

স্নায়বিক চাপে মস্তিষ্কের বিকারে যুক্তিবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের সুশৃঙ্খল চেতনা যখন ওলট্‌পালট হয়ে অতলে তলিয়ে যায়, তখন ওপরে ভেসে ওঠে লোকলজ্জা ও সমাজনীতির ভয়ে এতদিন কুঁকড়ে থাকা অবচেতনা। রক্তচক্ষু

সমাজের তর্জনী-সংকেত অগ্রাহ্য করে হাহা-হাসি আর অসম্বন্ধ উদ্ভট্ প্রলাপে অতি সহজেই তাই ঝরে পড়ে এতকালের অবদমিত মনের কথা।

শৈবলিনীর প্রলাপ-গীতি তার অন্তরমোচিত সত্য ভাষণ। পাগলিনী কপটতা জানে না।

কিন্তু শৈবলিনীর শেষ গান শুধুই পাগলিনীর মরম কথা নয়। 'আমার' শব্দে মেশানো রয়েছে বঙ্কিমেরও নিজস্ব ভাবুকসত্তা। শৈবলিনীর গানের ভেতর দিয়ে তিনি শোনাতে চান তাঁর নিজেরই মনের কথা।

পরকীয়তত্ত্বের ব্যঞ্জনামাখা 'মদনমোহন' 'মনচোর' 'শ্যাম' 'রাই' শব্দ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বঙ্কিম অকারণে ব্যবহার করেননি। নির্মম স্মৃতিশাসনে বাধ্যতামূলক বিবাহে শৈবলিনী প্রতাপের পরকীয়া। কিন্তু অন্তরের অচ্ছেদ্য বন্ধনে প্রতাপই তো তার স্বকীয়। শৈবলিনীর বিষণ্ণ জীবনে একমাত্র প্রতাপ-চন্দ্রই সুখের আলো। চন্দ্রশেখরকে ভালোবাসার শত চেষ্টা তার যে নিছকই আত্মপ্রতারণা।

ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরের উদ্দেশ্যে যোগবলে সম্মূঢ়া শৈবলীনীর তীক্ষ্ন প্রশ্ন ছিল—

'এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল বনমধ্যে ফুটিয়া ছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক করিলে কেন?' (ব র. ১ম, পৃ. ৪৬৮)

পাগলিনীর জিজ্ঞাসা—'তুমি কি লরেন্স ফস্টর?' ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরকে খাড়া করে ভাটপাড়ার স্মার্ত ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যেই এ সব প্রশ্ন বঙ্কিম তুলেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা—শৈবলিনীকে 'কুলটা' 'পাপিষ্ঠা' পরিণত করার জন্যে প্রকৃত দায়ভাগী কে? কে তার করুণ নাটকের সূত্রধার?

স্মার্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজের উদ্দেশ্যেই বক্তব্য ছিল বঙ্কিমের—যদি বিধি-নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে বাল্যপ্রণয়ীযুগলের প্রার্থিত মিলন ঘটত, তবে কোনোদিন শৈবলিনী গাইত না 'ঘরে যাব না' গান। প্রতাপকে জীবনসাথী করে সহজ স্রোতবহা জীবনে কত স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ হত তার সুখের সাঁতার।

বঙ্কিমের অভিমত—অনড় স্মৃতিশাসনের বল-প্রয়োগেই শৈবলিনী ভ্রষ্ট, উদ্‌ভ্রান্ত, বিকারগ্রস্ত।

মনুস্মৃতির প্রবল চাপে ঘনিয়ে ওঠা কত ট্র্যাজেডির জন্যে যে বেদনা মনে মনে বইতেন বঙ্কিম, শৈবলিনীর করুণ জীবনচ্ছবি এঁকে তারই গানে গানে সব বাধাবন্ধন টুটে সে ব্যথা প্রকাশ করেছেন তিনি। 'বঙ্গদর্শনে'র 'জাতিভেদ প্রথা' স্তম্ভের আর তাঁর প্রয়োজনই হয়নি।

এর আগে 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম সুনীতিবিদ্ স্মৃতিশাস্ত্রাচার্যদের সোজাসুজি

ঠেস্ দিয়ে হরিদাসী বৈষ্ণবীর গান শুনিয়েছিলেন। সেখানে রামপ্রসাদী ঢং-এর 'ঠাকরুন বিষয়'-এর আড়ালে ধর্মাধর্মের সতর্ক প্রহরী ভট্টাচার্যদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ ঠিক্‌রে উঠেছিল। চতুর দেবেন্দ্র মুচকি হেসে সূর্যমুখীকে শুনিয়েছিলেন এই গান —

'স্মৃতিশাস্ত্র পড়ব আমি ভট্টাচার্যের পায়ে ধোরে।
ধর্মাধর্ম শিখে নেব কোন্ বেটি বা নিন্দে করে॥'

ধর্মশাস্ত্রের ধর্মোপদেষ্টা হবার যোগ্যতা আছে কিনা, এবং 'লোকহিত' কথার সংজ্ঞা কি, এই দুই প্রশ্নের বিচার নিয়েই কাঁটালপাড়ার নব্য পণ্ডিত ও ভাটপাড়ার প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মধ্যে ছিল বিতর্ক মতভেদ মনকষাকষি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুপণ্ডিত বঙ্কিম যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে ধর্মশাস্ত্রের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অসারতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। প্রাচীনপন্থী সংস্কারবদ্ধ পণ্ডিতেরা এ কারণেই বঙ্কিমের প্রতি ছিলেন বিশেষ বিরক্ত। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল অনেক পরে—১২৯৯-এ 'জন্মভূমি'র ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের 'বঙ্কিমবাবুর সমুদ্রযাত্রা' প্রবন্ধে।

এই প্রবন্ধ থেকেই ধারণা হয়, ভাটপাড়ার গোঁড়া আচার্যেরা মনে করতেন, বঙ্কিম ধর্ম-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর অল্প এবং প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্রের সন্দিগ্ধ স্থল জিজ্ঞাসা না করার জন্য নরকে পতিত হবার যোগ্য। মহাভারতের একটি শ্লোক উদ্ধার করেই তাঁরা পরোক্ষভাবে বঙ্কিমকে নিন্দা করতেন। শ্লোকটি হল—

যথা চাল্পশ্রুতো মূঢ় ধর্মাণামবিভাগবিৎ।
বৃদ্ধানপৃষ্টবা সন্দেহং মহচ্ছব্ভ্রমিতোঽর্হতি॥ (৬৯৷অঃ৷৫৪)

(শাস্ত্রজ্ঞান যাঁর অল্প, সেই মূঢ়, ধর্ম বিচারে অক্ষম ব্যক্তি বৃদ্ধদের কাছে সন্দিগ্ধস্থল জিজ্ঞাসা না করায় এই সংসার থেকে মহানরকে পতিত হবার যোগ্য।)

বঙ্কিম তাই 'দেবেন্দ্র'র ছদ্মবেশে ভট্টাচার্যদের পায়ে ধরে শাস্ত্র পড়ে ধর্মাধর্ম শিখতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—সমাজের হিতের জন্যেই ধর্মশাস্ত্র। কিন্তু নির্বিচারে শাস্ত্রবচন পালন করলেই কি হিত হয়? 'বিষবৃক্ষে'র গোড়া-পত্তন শাস্ত্রাচার্যরাই কি করেননি?

'সদাস্ত্বপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হলে পুনর্বিবাহ করা যায় (দ্রঃ বহু-বিবাহ ব. র. ২য় পৃ. ৩১৬)। শাস্ত্রগত এই সূত্রানুসারে স্ত্রী-সুখ বঞ্চিত হতভাগ্য দেবেন্দ্ররই ন্যায্য অধিকার ছিল বহুবিবাহের এবং সেই সঙ্গেই লোক-

হিতকর বিধবাবিবাহের। কুন্দকে বিবাহ করলে একই সঙ্গে তাঁর এবং সংসারের মঙ্গল হত। 'বিষবৃক্ষ' রচিত হত না আর তাহলে।

কিন্তু 'বন্ধ্যাষ্টমেধিবেদ্যাব্দে'—স্ত্রী বন্ধ্যা হলে অধিবেদন বা অতিরিক্ত বিবাহ গ্রাহ্য—শাস্ত্রনীতির এই কৈফিয়ত দিয়ে কুন্দকে বিবাহ করলেন নগেন্দ্র। লোকহিত হল কি ?

কেবলই কামনার বশে, সূর্যমুখীর মতো পতিপ্রাণা স্ত্রীকে দুঃখী করে শাস্ত্র ও প্রগতির মুখরক্ষা করলেন যিনি সেই নগেন্দ্র কি দেবেন্দ্রর চেয়ে কম কামুক, প্রবঞ্চক ও পাপিষ্ঠ ? দত্ত ঠাকরুন বেচারী সূর্যমুখীকে উপলক্ষ্য করে 'হরিদাসী · বেশী দেবেন্দ্রর শ্লেষশাণিত গান তো বঙ্কিমেরই 'মরম কথা'। বিধবা কুন্দর কুল-মান প্রহরায় সতর্ক ছিলেন সূর্যমুখী। কিন্তু নিজের স্বামীর লাম্পট্য তাঁর কড়া চোখ ফাঁকি দিয়েছিল।

বঙ্কিমের বক্তব্য—ধর্মাধর্ম আইন বা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয় না। মানুষের বিবেকই তার ধর্মাধর্মের প্রকৃত নিয়ামক।

'বিষবৃক্ষে' মাতাল দেবেন্দ্রকে দিয়ে বঙ্কিম গাইয়েছিলেন—

'মন বাক্স তার লজ্জা তালা
কল কোরে তার ভাঙলে ডালা।'

বুকের মধ্যে গুমরোনো বিদ্রোহে, মরচে পড়া মূঢ় শাস্ত্রীয় সংস্কারে আঘাত হানতে চাইছিলেন তিনি। মনের সব সংকোচের আগল ভেঙে কৌশলে বলতে চাইছিলেন রূঢ় সত্যি সব কথা। কিন্তু অবরুদ্ধ ক্রোধের উত্তেজনায় বড় কর্কশ হয়েছিল সে গানের ভাষা—'ভাঙা বাক্সে মেরে নাতি'। সংযত মন এ গান তাই পরে বর্জন করেছিল।

কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে' পাগলিনীর গানে প্রলাপের ভঙ্গিতে বঙ্কিম হয়েছেন অসংকোচ। মুক্ত কণ্ঠে ব্রাহ্মণ স্মার্ত-সমাজের বিরুদ্ধে জানিয়েছেন তাঁর বিক্ষোভ।

গানের ছলে মনের কথা ঝরানোর কৌশল বঙ্কিম ভালোই শিখেছিলেন।

'চন্দ্রশেখরে'র পঞ্চম খন্ড তৃতীয় পরিচ্ছেদ-এর নাম 'নৃত্যগীত'।

এই দৃশ্যে বঙ্কিম দুই শেঠ আহূত উচ্চাঙ্গ নাচ-গানের আসরে মনিয়াবাঈ-এর 'সনদী খিয়াল' শুনিয়েছেন। এ কালের গানের বৈঠকের বিশেষ প্রকৃতি ও সেই সঙ্গে এদেশের বাঈজী সংস্কৃতির পরিচয় পেশ করাই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য।

বঙ্কিম জানতেন বাঈজী সংস্কৃতির কথা না বললে তাঁর বাংলার গানের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে খুঁত থেকে যাবে।

'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম নববাবু-কালচার-এর পাশাপাশি দেশী বাংলাগানের

ধারার ক্রমাবনয়নের রূপরেখা এঁকেছিলেন। দেখিয়েছিলেন গান এ যুগে বারোয়ারী সমাজের মনোরঞ্জনের উপকরণ। 'হরিদাসী বৈষ্ণবী'রা ঝুলি ভরে একালে গান ফিরি করে বেড়ায়। গান এখন পণ্যসামগ্রী এবং চতুর ও অভিসন্ধি-পরায়ণের মতলব সিদ্ধির অন্যতম উপায়।

উনিশ শতকের উত্তরপাদেই দেখা যায় যুগজাত সমাজের চাহিদায় গান তার মৌল চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট। এই স্খলনের ফলেই ভক্ত জয়দেবের থেকেও ভোগের কবি জয়দেবই জনপ্রিয়। বিদ্যাপতি চন্ডীদাস প্রমুখ মহাজন পদকর্তারা ঢপ, কবি, যাত্রা-গানের প্রাবল্যে প্রায় বিস্মৃত। অপ্রাকৃত প্রণয় ও ভক্তিরস একালের 'বিরহ' 'সখী সংবাদের' তারল্যে মিশে সরল বিনোদনবিষয় মাত্র। কৃষ্ণযাত্রা কোণঠাসা হয়েছে 'বিদ্যাসুন্দর পালা'র খেমটা নাচগানের জনপ্রিয়তায়। যাত্রা গানের চাহিদাও শেষে কমে গেছে থিয়েটারের রংদার চটুল সস্তা গানের আকর্ষণে। এক নব্য শহুরে ভুঁইফোঁড় বাবু-কালচার-এর দাপটেই বাংলার দেশী গান তার সহজ শুদ্ধ স্বভাব হারিয়ে 'কলঙ্ক ফুলে'র গানে তখন পরিণত।

'চন্দ্রশেখরে'র 'নৃত্যগীত' দৃশ্যে পাওয়া যায় মার্গসঙ্গীতের ধ্রুব-পদ ভ্রষ্ট হবার কারণ এবং সেই ভ্রষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পটভূমির ও তার গায়ক ও শ্রোতার বিবরণ।

বিলাস বৈভবে মোড়া ধনকুবেরের জলসাঘরের বর্ণনা দিয়ে এই অধ্যায়ের শুরু—

> মুঙ্গেরে প্রশস্ত অট্টালিকা মধ্যে স্বরূপ চন্দ জগৎ শেঠ এবং মাহতাবচন্দ্র জগৎ শেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তথায় শ্বেতমর্মর বিন্যাস শীতল মন্ডপ মধ্যে নর্তকীর রত্নাভরণ হইতে অসংখ্য দীপমালা রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল। ··
>
> দীপ-রশ্মি, উজ্জ্বল প্রস্তরস্তম্ভে উজ্জ্বল স্বর্ণমুক্তা খচিত মসনদে, উজ্জ্বল হীরকাদি খচিত গন্ধপাত্রে, শেঠদিগের কণ্ঠ বিলম্বিত স্থূলোজ্জ্বল মুক্তাহারে, নর্তকীর প্রকোষ্ঠে কণ্ঠ, কেশ, এবং কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল। তাহার সঙ্গে মধুর গীতশব্দ উঠিয়া উজ্জ্বল মধুরে মিশাইতেছিল।
>
> (ব র. ১ম. পৃ ৪৫৫)

ঐশ্বর্যমণ্ডিত সঙ্গীতসভায় নর্তকী মনিয়াবাঈ গাইছিল 'সনদী খিয়াল' —'শিখো হো ছল ভালা'।

মার্গ সঙ্গীতের প্রধান দুই ধারা ধ্রুপদ ও খিয়াল। ধ্রুপদ মূলত ঈশ্বর ও প্রকৃতিবন্দনামূলক ধ্যানগম্ভীর গান। অধ্যাত্ম ভাবসাধনা এ গানের আদর্শ।

'খিয়ালে'র সৃষ্টি বাদশাহ-নবাবদের চিত্তচমৎকৃতি ও মনোরঞ্জনের খাতিরে। মুসলিম গায়ক বা 'কবাল' এ গানের জন্মদাতা।

আলাউদ্দীন খলজীর সভাগায়ক আমীর খসরু (১৪শ শতক), জৌনপুরের শাসক হুসেন শাহ শরকী (১৫শ শতক), ওস্তাদ সদারঙ্গ (১৮শ শতক) এবং মুহম্মদ শাহ (১৭১৯—১৭৪৮) 'খ্যাল্' বা 'খিয়াল' গানের অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, প্রসার প্রতিপত্তির মূলে।

নবাব বাদশাহরা ছিলেন মূলতঃ ত্রৌর্যত্রিক আমোদপ্রিয়। অর্থাৎ নৃত্য গীত ও বাদ্যে সমান আকৃষ্ট। তাঁদেরই আগ্রহ উৎসাহ ও ব্যক্তিত্ব প্রভাবে অথবা প্রতিভায় এদেশে মার্গসঙ্গীত বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি লাভ করে।

'বঙ্গদর্শন' মুসলমানদের সঙ্গীত-সংস্কৃতির প্রশংসা করেন বিশেষভাবে। ১২৭৯ র বৈশাখ সংখ্যায় 'সঙ্গীত' প্রবন্ধের লেখক মন্তব্য করেন—

> মুসলমানের আগমনে ভারতবর্ষের অনেক লাভ হইয়াছে। সঙ্গীত বিষয়েও তাহা দেখা যায়।...
>
> ...মুসলমানেরা হিন্দুদিগের সঙ্গীতশাস্ত্র আদ্যোপান্ত গ্রহণপূর্বক নানা উন্নতি সাধন করিয়াছে। অর্থব্যয় ও উৎসাহের দ্বারা সঙ্গীত অনুশীলন প্রবল রাখিয়াছিল এবং যত্নের দ্বারা তাহার উন্নতি সাধন করিয়াছে।... ধ্রুপদ ব্যতীত খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি ইত্যাদি মুসলমানদের প্রযত্নে প্রকাশ হইয়াছে, রাগরাগিণী অনেক বাড়িয়াছে, এবং তালের নূতন পদ্ধতি ও তাহার চমৎকার পারিপাট্য ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

১২৮০-র ফাল্গুন সংখ্যায় রামদাস সেন তাঁর 'ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র' প্রবন্ধে একই কথার সমর্থনে লেখেন—

> মুসলমানেরা হিন্দুদিগের যেরূপ অন্যান্য কীর্তিকলাপ ধ্বংস করিয়াছিলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে সেমত দুর্ব্যবহার করেন নাই, এমন কি ইঁহারা যদি সঙ্গীতের চর্চা না রাখিতেন তাহা হইলে একালের মধ্যে সঙ্গীতবিদ্যা একেবারে লোপ পাইত। ...মুসলমানেরা সঙ্গীতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন—ত্রৌর্যত্রিক আমোদ পৃথিবীর সার স্থির করিলেন।

প্রমোদবিলাসী মুসলমান সুলতান বাদশাহরাই সঙ্গীতকে সুখসম্ভোগ ও আমোদস্ফূর্তির বিষয় করেন। চিত্তবিনোদনের জন্য ধ্রুপদী মার্গসঙ্গীতের অঙ্গে গায়কের ব্যক্তিত্ব ও মনের রঙ্ লাগিয়ে সৃষ্টি হয় রঙীন গান। 'ধ্রুপদ ব্যতীত খিয়াল, টপ্পা, ঠুংরি' রঙীন গানের পর্যায়ভুক্ত। ভাবানুভূতির রঙ্ লাগিয়ে, তান বিস্তারের মধ্য দিয়ে নানান চমক সৃষ্টি করে, কণ্ঠ কেরামতি

দেখিয়ে শ্রোতার মন রাঙানো এই চিত্তরঞ্জিনী মার্গসঙ্গীতের লক্ষ্য। ধ্রুপদের অধ্যাত্ম ভাবমণ্ডিত ধ্যানগম্ভীরতা খিয়ালে নেই। খিয়ালে আলাপেরও বাহুল্য নেই। তানকর্তবই এর বিশেষত্ব। ধ্রুপদের চার স্তবকের বদলে এর দুই স্তবক বা তুক্।

প্রমোদ বিলাসের প্রয়োজনেই খিয়াল যখন নটীর কণ্ঠলগ্ন হল তখন নর্তকীর চপল নৃত্যছন্দের সঙ্গতে এ গান আরও লঘুস্তরে নেমে এসে রূপ নেয় 'ঠুম্‌রি'র। 'ঠুম্‌রি' এবং 'টপ্পা' উচ্চাঙ্গ গানের লঘুকরণ। খিয়াল প্রভৃতি রঙীন গানের উৎপত্তি ও পোষকতা নবাব বাদশাহর দরবার সভায়। দরবার নটী ও কলাবন্তরাই এ গানের মূল আধার। সঙ্গীতরসিক ও গুণী নবাব বাদশাহদের গৌরব ও আভিজাত্যের সঙ্গেই এঁদের মর্যাদা জড়িত ছিল। যোগ্য সমঝদারের মনোরঞ্জনার্থে বিনোদিনী নটীদেরও তাই উপযুক্ত রিওয়াজ ও তালিমে হতে হত নৃত্যগীত পটীয়সী বিদগ্ধ কলাবতী। শিক্ষা গৌরবে ও দরবারী পৃষ্ঠ-পোষকতার আভিজাত্যে তাঁরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত 'বাঈজী'। তাঁদের রত্নমণ্ডিত মহার্ঘ বেশভূষা দরবারী জীবনভঙ্গিরই সূচক।

'চন্দ্রশেখরে'র 'নৃত্যগীত' দৃশ্যের 'মনিয়াবাঈ'ও নন সাধারণ নাচনেওয়ালী। মীরকাশেমের রাজকীয় সঙ্গীতদরবার তাঁর প্রেক্ষাপট। যদিও আপাতত তাঁর আহ্বায়ক জগৎশেঠ ভ্রাতারা।

রাগরাগিণীর বিস্তারে হিল্লোলিত তানে চমৎকৃতি এনে আন্দোলিত দেহ ভঙ্গিমায় 'মনিয়াবাঈ' শ্রোতাদের মন আকর্ষণের চেষ্টা করছিলেন। কেদারা, হাম্বির, ছায়ানট রাগের কুশলী পেশকারিতে, তিনি তাঁর সঙ্গীত কৃতিত্বের প্রমাণ রাখছিলেন। বঙ্কিমের উল্লেখে মনিয়া তাই 'বাঈজী'।

এই বাঈজী পরিবেশিত গানকে বঙ্কিম বলেছেন 'সনদী খিয়াল'।' সম্ভবতঃ খিয়াল গানের বিশেষ বৈচিত্র্য রূপ 'ছোট খিয়াল'ধর্মী 'ঠুম্‌রি'র কথাই বঙ্কিম এ গানে বোঝাতে চেয়েছেন।

লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ ছিলেন 'ঠুমরির' অন্যতম প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর বিখ্যাত সভাগায়ক সনদপিয়া রচিত খিয়ালধর্মী 'ঠুমরি'ই হয়তো সেকালে 'সনদী খিয়াল' নামে প্রচলিত ছিল। 'শিখো হো ছল ভালা' সেকালের কোন জনপ্রিয় ঠুম্‌রির কলি কিনা জানা যায় না। তবে এই গীতকলি বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষে'র প্রথম সংস্করণে দেবেন্দ্রর মুখেও শুনিয়েছেন।

প্রবন্ধ সঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ কীর্তন ও ধ্রুপদ গান অভিসিঞ্চিত বাংলাদেশে 'খিয়াল' গান ও বাঈজী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ মুসলিম-শাসকদেরই অনুষঙ্গী

হয়ে। একদা তা সম্পূর্ণত দরবারী অবরোধে লালিত হয়েছে। বঙ্কিম তার ইঙ্গিত 'দুর্গেশনন্দিনী'তে কতলু খাঁর নৃত্যসভায় 'কপালকুণ্ডলা'য় 'মতিবিবি' মারফত রেখেছেন। কিন্তু কালক্রমে ধূর্ত বণিক ইংরেজদের আগ্রাসীপণায় যখন নবাবী আমল অস্তোন্মুখ, তখন দরবার-নটীদেরও সম্ভ্রান্ত বনেদে চিড় ধরে। রুজি-রোজগারের তাগিদেই তাঁরা আর দরবারের গুণজ্ঞ পরিমণ্ডলে বাঁধা থাকতে পারেন না। ক্রমে নবাব বাদশাহদের পুরোপুরি পতন হলে কুঠিয়াল বানিয়া ইংরেজদের দৌলতে হঠাৎ-নবাব বৈশ্য সমাজের উৎপত্তি হয়। তাঁরাই নবাবী চাল ও মেকি আভিজাত্যের ঠাট বজায় রাখতে পোষণ করেন বাঈজীদের। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই বাঈজীরা আর নন 'দরবার-নটী'। তাঁরা আসর করেন ধনকুবেরের জলসাঘরে। মুজরো নেন নুন তেলের দরদাম কষা 'শেঠ ভ্রাতা'দের মতো সঙ্গীতবোধহীন কুঠিয়াল বানিয়াদের কাছে। সঙ্গীত সুখ সম্ভোগের জন্যে এই বণিকরা নৃত্যগীতের আয়োজন করেন না। সঙ্গীত সভা আসলে তাঁদের গোপন কারবারি বৈঠকের ছল।

তাই 'চন্দ্রশেখরে'র গুণবতী রূপসী মনিয়াবাঈ যখন রাগরাগিণীর শিল্পায়নে মগ্ন তখন তার সুরমূর্ছনা শ্রোতৃবর্গের শেঠদিগের 'অন্তঃকরণে কিছুই মিশিল না'। 'কাপড়া' ও 'নমকের' ব্যাপারী আর্মেনীয় গুরগণ খাঁ ও শেঠভ্রাতারা 'রূপেয়া, নোকসান দর্শনী', প্রভৃতি ছেঁদো কথায় আপনাদিগের পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন।' (ব. র. ১ম. পৃ. ৪৫৬)

মীরকাশেমের অগোচরে গোপন ষড়যন্ত্রে মিলিত হবার জন্যেই এই সঙ্গীতের আসর।

> বিনা কারণে জগৎশেঠদিগের সঙ্গে গুরগণ খাঁ দেখাসাক্ষাৎ করিলে নবাব সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন এই বিবেচনায় জগৎশেঠরা এই উৎসবের সৃজন করিয়া গুরগণ ও অন্যান্য রাজামাত্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।···
> নৃত্যগীত উপলক্ষ্য মাত্র। জগৎশেঠেরা বা গুরগণ খাঁ কেহই তাহা শুনিতেছিলেন না। সকলে যাহা করে তাঁহারাও তাই করিতেছিলেন। শুনিবার জন্য কে কবে সঙ্গীতের অবতারণা করায়। (ব র. ১ম. পৃ. ৪৫৬)

শেষের এই শ্লেষমন্তব্য বঙ্কিম তাঁর নিজের কালের চরিত্রভ্রষ্ট 'বাঈনাচে'র আসর এবং তার আহ্বায়কদের উদ্দেশ্যেই ছুঁড়েছেন।

বৈষয়িক কাজকর্মের প্রয়োজনে মুন্সী রাজাদের আহূত মিলনসন্ধ্যায় ইংরেজ অভ্যাগতদের সঙ্গে খানাপিনা ও বাঈজী গান নাচ উপভোগের নজির ঊনিশ শতকের গোড়া থেকেই পাওয়া যায়। রামমোহনের বিখ্যাত ভোজসভায়

নিকী বাঈজীর নাচ কিংবা প্রিন্স দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলার পার্টি সে কালের গল্পকথা।

এদেশে বাঈজী সংস্কৃতি ক্রমেই জড়িয়ে যায় ধনাঢ্য বাঙালীর বিলাসব্যসনে নানা উৎসব অনুষ্ঠানে। সামাজিক মর্যাদা ও বৈভবের জাঁক দেখানোই ছিল সেইসব অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। রামমোহনের আমলের প্রাচ্য ক্যাটালনী নিকী বাঈজী থেকে শুরু করে বিশ শতকের গোড়ার জোহরাবাঈ, মালকাজান, গওহর-জানের আমল, এই একশ বছরের বাঈজী প্রতিপত্তির সময় সীমায় এর অজস্র উদাহরণ ছড়ানো। জোড়াসাঁকো অথবা পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ি, কলকাতার বিখ্যাত মল্লিক, শীল, কিংবা বড়াল বাড়ির যে কোনো সামাজিক কাজ যেমন—বিবাহ, অন্নপ্রাশন এমন কি দুর্গোৎসবেও বাঈজী গান আয়োজিত হত। বঙ্কিম নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝেছেন এই সব হুজুগে আসরে প্রকৃত সমঝদারের উপস্থিতি হয় কদাচিত।

১৮৫৭য় ওয়াজিদ আলি শাহ মেটেবুরুজে স্থায়ী হন। তাই বঙ্কিমের সামনেই দরবারী সঙ্গীতসভা ও সংস্কৃতির আসল জগৎ খুলে যায়। নবাবের সঙ্গীত দরবারের সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীতসভার গুণীবিনিময় হত। যদুভট্টও নবাবের দরবারে সম্মানিত হন।

ওয়াজিদ আলির হারেম ও সঙ্গীত দরবার গুণী বাঈজী সমৃদ্ধ ছিল। একশো বাঈজীকে বিবাহ করে তিনি নাকি 'পরীস্তানী হারেম' বানিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত বাঈজী রাজিয়া ছিলেন তাঁর অন্যতম বেগম।[৫৮]

ওয়াজিদ আলির কলকাতায় আগমনের পরে এদেশে বাঈজী সমাগম বাড়ে। সেই সঙ্গে 'ঠুমরি'র প্রচলন ও জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। আগে উচ্চাঙ্গ গান বলতে বোঝাত ধ্রুপদ গানের বৈঠক। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে কালোয়াতী গান বলতে 'খিয়াল' ও 'ঠুমরি'। আর 'ঠুমরি' বলতেই বাঈজী। বঙ্কিমের 'ঢেঁকি'-রূপী কমলাকান্তও স্বর্গে ধান ভেনে পুরস্কার পান 'একঘণ্টার জন্য উর্বশী-বাঈজীর সঙ্গীত। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণে[৫৯] জানান কাশী কিংবা কর্ণাট থেকে নাম করা বাঈজী এলেই তাঁরা ছেলে-ছোকরারা মিলে তাঁদের নাচ গান দেখার জন্য পাগল হতেন। অবনীন্দ্রনাথ বৃদ্ধা শ্রীজানবাঈ-এর অসামান্য সঙ্গীত কৃতিত্বের কথা জানিয়েছেন। এই শ্রীজানবাঈ উনিশ শতকের সত্তরের দশকে জয়পুর থেকে কলকাতায় আসেন। তিনি ছিলেন সেকালের নামকরা বাঈজী। কানাড়া ও ভৈরবীতে সিদ্ধ ছিলেন তিনি।

ওয়াজিদ আলি শাহ নিজে 'অখতর পিয়া'[৬০] নামে 'কহন্ ঠুমরি' লিখতেন।

পেশোয়াজ চাপিয়ে বাঈজীদের মতো নাচতেন গাইতেন। বৃজ্ ভাষায় গাওয়া প্রেম ও বিরহভাব প্রকাশক 'ঠুমরি'কে ভাবপূর্ণ নাট্যগীতিরূপে তিনিই প্রচলন করেন। গানের ভাষাকে সুরের মাধ্যমে বিচিত্র ভঙ্গিতে ব্যাখ্যাত হবার সুযোগ করে দেন তিনি।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়পাদে কলকাতার সঙ্গীত-জগতের বিশেষভাবে হিন্দুস্থানী গানের ক্ষেত্রে ওয়াজিদ আলি শাহ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। 'বঙ্গদর্শন'-এর সঙ্গীত সন্ধানী নজরেও এই সঙ্গীতসর্বস্ব নবাব ধরা পড়েছেন।' ১২৮০-র কার্তিক সংখ্যায় 'যাত্রা' প্রবন্ধে 'বঙ্গদর্শনে' এঁর সম্পর্কে মন্তব্য—

লক্ষ্ণৌউয়ের নবাব বুলবুলি। তাঁহার এক সুর। তিনি বুলবুলি হইয়া এক সূক্ষ্মশাখায় বসিয়া মস্তক হেলাইয়া অর্ধমুদিত নয়নে আদ্ধা গাইতেছিলেন। যখন তাঁহার মর্মকথা আদ্ধায় গাইয়াছিলেন, তাঁহার মানসিক শক্তি তখনই বুঝা গিয়াছিল।

ইংরেজের হাতে এক বাক্যে গদী সঁপে দিয়ে যে নবাবশাহ গানের কলি মুখে নিয়ে নির্বাসনে যান তাঁর সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শনে'র কোনো উচ্চ ধারণা নেই। তাঁকে 'বঙ্গদর্শন' যাত্রাওয়ালার গান শুনতে অভ্যস্ত রোদনপরায়ণ সামান্য চরিত্র বাঙালীর পাশেই এক সারিতে বসান। তাই লেখেন 'সুর স্বভাব ব্যঞ্জক। আমাদের সুর সামান্য। আমরাও সামান্য, লক্ষ্ণৌউয়ের ওয়াজাদালিও সামান্য।' নবাবের গানের মধুর কোমল সুর তাঁর নির্বীর্য মনেরই প্রকাশ।

দুর্বল নিশ্চেষ্ট ভোগাসক্ত গৃহসুখপরায়ণ বাঙালী 'টপ্পার' মতো 'ঠুমরি'কেও সেদিন স্বভাবতই বিশেষ পছন্দ করেছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র খেদ ছিল দেশী বা মার্গ কোনো গানই আর বীর্যভাবে সমাজকে উদ্দীপিত করেনি। বাংলার সমগ্র গানের সুরই তখন 'সামান্য সুর'।

ওয়াজিদ আলি শাহর চরিত্র-ছায়ার প্রক্ষেপেই যেন বঙ্কিম তাঁর মীরকাশেমের কাতরোক্তি শুনিয়েছেন 'চন্দ্রশেখরে'। ইংরেজের আক্রমণে বিপন্ন মীরকাশেমও ক্রোধে, বীর্যে জ্বলে ওঠেনি। দুর্বলোক্তি তাঁর —'আমি চলিলাম—রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব।'

এ যেন 'যব ছোড় চলি লখনেউ নগরী'-র গায়ক গদীচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলিরই হারেমসুখে আত্মগোপন করার পলায়নমুখী মনোভাব।

মীরকাশেমের মতো নবাবের সঙ্গীতপটে তাই 'সনদ খীয়াল'-এর সুরধ্বনি শোনান বঙ্কিম।

মনিয়াবাঈ-এর 'শিখো হো ছল ভালা' এবং 'গোরে গোরে মুখ পরা বেসর

শোহে'—গীতাংশের নাটকীয় ব্যবহারে মনে হয় এই গান 'কহন্ ঠুম্‌রি'। 'কহন্ ঠুম্‌রি'তে বাক্যাংশকে নানা রকম স্বরবিন্যাসে অর্থবহ ও ভাবসমৃদ্ধ করে প্রকাশ করা হয়। কণ্ঠকাজ ও তান প্রয়োগ এ গানের বিশেষত্ব। আধুনিক কালের গায়ক রামকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বীয় অভিজ্ঞতায় বলেন[৬১] —'ঠুম্‌রি গানে 'বোল করা' বা বলার ধরনটাই আসল। ···'বোল' মানে হচ্ছে নাটকীয় ভাবে ভ্যারিয়েশন, মডুলেশনে মনের কথা ঝরিয়ে ঝরিয়ে রূপ নির্মাণ করা।'

'অর্থবহ' 'মনের কথা' বলার নাটকীয় এই 'বোল্'কে বঙ্কিম মনিয়াবাঈ-এর গানে কাজে লাগিয়েছেন। গুরগণ খাঁর ধাপ্পাবাজির মুহূর্তে বাঈজী তার সামনে গীতটুকরা মুখে নিয়ে গায়, 'শিখো হো ছল ভালা'। আবার শেঠরা যখন চিন্তিত, কুঠি খোলা নিয়ে প্রতাপ রায়ের এত মাতামাতি কেন, তখন মনিয়া গায়, 'গোরে গোরে মুখ পরা বেসর শোহে।'

মহতাবের প্রশ্ন—'কার গোরা মুখ'। পাঠক জানেন—শৈবলিনীর। তাকে তোলার জন্যই বিষয়কর্মের জগতে প্রতাপ রায়ের এত মাতামাতি।

'চন্দ্রশেখরে' এই 'নৃত্যগীত' দৃশ্যে বঙ্কিম সূক্ষ্ম কূটচালে শ্রোতার স্বভাব চরিত্রের আভাস দিয়ে যেন প্রশ্ন জাগিয়েছেন—উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি 'সেমত দুর্ব্যবহার করে' তাকে ভ্রষ্টা কুলটা পরিণত করার জন্যে আসলে দায়ী কে। চতুর মুনাফাবাজ বিদেশী বণিকের সঙ্গে এদেশী দুর্নীতিপরায়ণ 'শেঠ'রা মিশে তাদের 'বেণে' প্রবৃত্তি নিয়ে ভণ্ড শ্রোতার ছলে সঙ্গীত সভাকে যখন কারবারি বৈঠকে পরিণত করেছে তখন থেকেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্প হয়েছে অপদস্থ, হয়েছে ছলাকলা প্রিয়।

পাঠক লক্ষ্য করেন, 'চন্দ্রশেখরে'র গান ও নাচ প্রসঙ্গে বঙ্কিম জানিয়েছেন, সে যুগে নৃত্য-গীত গণিকাদেরই সংস্কৃতি এবং জীবনধারণের উপায়। কুলরমণীদের জীবনচর্যায় এই সূক্ষ্ম-শিল্পের স্থান নেই, বরং তাসম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বিষয়। অথচ 'দুর্গেশনন্দিনী'তে মানসিংহ-মহিষী ঊর্মিলা দেবী ও তাঁর সহচরী বিমলার দৃষ্টান্তে জানা যায়, প্রাচীনকালে রাজপরিবারে বা সম্ভ্রান্ত অবরোধে নৃত্যগীত ছিল অনুশীলনযোগ্য বিদ্যা।

'সঙ্গীত' প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন—

> শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। (ব. র. ২য়, পৃ. ২৮৭)

সঙ্গীত অর্থে এখানে নৃত্যগীত ও বাদ্যের সমন্বয় শিল্প বুঝতে হবে।

বঙ্কিমের যুগে ভদ্রমহিলা সমাজে গান গাওয়াই ছিল পাপ। সুতরাং নাচ

আরও গর্হিত কাজ। বাসর ঘরের খিল আঁটা মেয়ে মজলিশের রঙ্গরসের আসর ছাড়া প্রকাশ্যে শরীর আন্দোলনের কোনো উপায় কুলবতী নারীর ছিল না। কিন্তু কামশাস্ত্রে নৃত্য চৌষট্টি কলার এক কলা। সংস্কৃত সাহিত্যে রমণীর নৃত্যানুশীলনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বঙ্কিম ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য—বিশেষ ভাবে কালিদাসের সাহিত্যে ঘনিষ্ঠ। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে[১২] মালবিকার নৃত্যানুশীলনের ছবি আছে। রয়েছে সঙ্গীত ও নৃত্যের যোগ্য বোদ্ধা পরিব্রাজিকা পণ্ডিতকৌশিকীর মতো চরিত্র। এ নাটকে কালিদাস বলেছেন, নাচ হল শরীরের অভিনয়। গানের অর্থ সুন্দরভাবে স্পষ্ট করার জন্যেই শরীরের এই অভিনয় ও প্রকাশভঙ্গী। মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তবুও নৃত্যাভিনয় অনেক রকমে সকলকেই আনন্দ দেয়। মুনি ঋষিরা বলেন, এ হল দেবতাদের চোখে দেখার মতো এক শান্ত যজ্ঞ।

'বিক্রমোর্বশী'তে (চতুর্থ অঙ্ক) নৃত্যগীতির উল্লেখ আছে।

বঙ্কিমও নৃত্যশিল্পকে দেবভোগ্য যজ্ঞ বলেই মনে করতেন। ভাগবতের রাসনৃত্যের ব্যাখ্যায় (ধর্মতত্ত্ব, পৃ. ৬৬৯ ও কৃষ্ণ চরিত্র, পৃ. ৪৫৯) তার প্রমাণ রেখেছেন। তাঁর কাছে নৃত্য-গীত 'অনন্ত সুন্দরের'ই উপাসনা। তা আদৌ চিত্তবিঘূর্ণক বা উচ্ছৃঙ্খলতার সহায়ক আমোদ স্ফূর্তির উপকরণ নয়। বরং নির্মল আনন্দেরই শিল্প। এই কারণেই সে আমলে জনপ্রিয় বাঈ বা খেমটা নাচ এমন কি বাঈজী সংস্কৃতিও তাঁর সমর্থন পায়নি।

আশ্চর্যের বিষয়, সে যুগের সংরক্ষণশীল সমাজে বসবাস করেও বঙ্কিম কিন্তু 'যুবক যুবতীর একত্র নৃত্য' অনুমোদন করেন।

'কৃষ্ণ চরিত্র' প্রবন্ধে (ব র. ২য়. প. ৪৫৮) রাসনৃত্যের শ্রীধর স্বামীকৃত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—'রাসের অর্থ কি।'

> স্ত্রী-পুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্য করে তাহার নাম রাস। বালক বালিকায় এরূপ নৃত্য করে আমরা দেখিয়াছি। এবং যাহারা বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশ বিশেষে এরূপ নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদি রসের নামগন্ধ নাই।

গুজরাতের গরবা, হোলি এবং আসামের রাসঝুমুরা মণ্ডলনৃত্য ও যৌথ নৃত্যের উদাহরণ। উপজাতি জীবনে ও লোকসংস্কৃতিতে যৌথনৃত্যের প্রচলন আছে। সম্ভবত বঙ্কিম জানতেন এসব কথা। তিনি লেখেন—

> ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক যুবতী একত্র হইয়া নৃত্যগীত

করা আমাদিগের আধুনিক সমাজে নিন্দনীয়। অন্যান্য সমাজে যথা ইউরোপে নিন্দনীয় নহে। বোধহয় যখন বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপে অবস্থা ছিল এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল—যে কার্যটা নিন্দনীয়। সেইজন্যই তিনি লিখিয়া থাকিবেন যে 'তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা'। (তাঁরা পতি পিতা ও ভ্রাতাদের দ্বারা বারিত হলেন)

. .. ...

যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় ধর্মতঃ কোন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে। (ব র. ২য়. পৃ. ৪৫৯)

বঙ্কিমের আকাঙ্ক্ষা ছিল নৃত্যগীত এ সমাজে নির্মল আনন্দের শিল্পরূপেই জীবনে স্ফূর্ত হোক। 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' প্রবন্ধে বড়ো দুঃখেই তিনি লিখেছিলেন—

'নৃত্যগীত সে সকল বুঝি বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গেল।'

(ব. র. ২য়, পৃ. ১৯৪)

'গান করেন কেন ?'

—রজনী।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার বিদগ্ধ সমাজে একমাত্র ধ্রুপদ গানেরই সম্মান ছিল। অধ্যাত্মভাববাহী সেই মার্গসঙ্গীত তখন এদেশে স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। উত্তর ভারতীয় ও বিষ্ণুপুর ঘরাণার ধ্রুপদীয়াবৃন্দ সে সময় কলকাতার উচ্চাঙ্গ সংগীত রসিকদের চিত্ত বিশেষভাবে অধিকার করে রেখেছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি থেকেই দেখা যায় ধ্রুপদের সেই মানমর্যাদা অস্তমিত। রঙীন গান খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরিরই বিশেষ সমাদর। নব্য ভোগবাদী এবং ঈশ্বরবিমুখ ইহসর্বস্ব সভ্যতার ক্রমপ্রসারণই যে এর কারণ বঙ্কিম সে কথা স্পষ্ট অনুভব করছিলেন। তাঁর মনে গানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল।

'রজনী'-র (১৮৭৭) তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ঈশ্বর অবিশ্বাসী, পজিটিভিষ্ট শচীন্দ্রর সঙ্গে বেদমন্ত্র গায়ক সন্ন্যাসীর একটি তর্কালাপ আছে।

এই আলাপ আসলে যুক্তিবাদী ইহমুখী যুবসমাজের গীতমতির সঙ্গে অধ্যাত্ম-বাদী বঙ্কিমের সাংগীতিক রুচির বিতর্ক। বঙ্কিম নব্যসমাজের কাছে স্পষ্ট জবাব চেয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন—'গান করেন কেন' ?

প্রথমে নব্যপন্থী শিক্ষিত শচীন্দ্রের প্রশ্ন বেদ গায়ক সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্যে—
'আপনি বেদগান করেন কেন ?'

সন্ন্যাসী—আপনিও তো পণ্ডিত, আপনিই বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান করে কেন ?

শ—গাইয়াই কোকিলের সুখ।

স—গাইয়াই আমার সুখ।

শ—তবে টপ্পা, খিয়াল থাকিতে বেদগান করেন কেন ?

স—কোন কথাগুলি সুখকর—সামান্যা গণিকাগণের কদর্য চরিত্রের গুণগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমা গান সুখকর ?

.. .. .

শ—কোকিল গায়, কোকিল পত্নীকে মোহিত করিবার জন্য। মোহনার্থ যে শারীরিক স্ফূর্তি তাহাতে জীবের সুখ। কণ্ঠস্বরো স্ফূর্তি সেই শারীরিক স্ফূর্তির অন্তর্গত। আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন ?

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার মনকে। মন আত্মার অনুরাগী নহে আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য গাই।'

(ব. র. ১ম, পৃ ৫২০)

বেদমন্ত্র গায়ক সন্ন্যাসীর কাছে প্রত্যাশিত জবাব ছিল, তিনি দেবতার প্রীতি উৎপাদনের জন্যই গান করেন। কিন্তু সেই যুগ ঈশ্বরবিরোধী 'পজিটিভিস্ট'দের যুগ। সে সময় 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। তৎপ্রমাণাভবাৎ'। প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ—এই সাংখ্যযুক্তি বুদ্ধিজীবী তার্কিক মহলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই সন্ন্যাসী মৃদু হেসে ঈশ্বর প্রসঙ্গ এড়িয়েছেন। কিন্তু স্পষ্ট যুক্তিসংগত সপ্রতিভ জবাবে শচীন্দ্রকে নিরস্ত করেছেন এবং প্রকারান্তরে ভারতীয় সংগীতের মূল ঐতিহ্য, তার উৎসভূমি এবং সেই সংগীতের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন।

ভারতীয় মার্গসংগীতের আদিরূপ সামগান। সামগীতির পূর্বরূপ উচ্চারণ প্রকৃতিযুক্ত স্তোত্র এবং স্বরসংযুক্ত মন্ত্রের আবৃত্তি। অতএব ভারতীয় সংগীতের প্রাচীনতম রূপে স্তোত্র ও মন্ত্রগান। 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে মন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলা হয়েছে—'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ।' (তন্ত্রসার ৯৮)। যা মনন করলে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক

বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়া যায় তাই মন্ত্র। প্রাচীন ভারতীয় গান তাই মূলত দেহ ও মনের হিত কামনায় উচ্চারিত প্রার্থনা সঙ্গীত। বঙ্কিমও সঙ্গীতের এই মাঙ্গলিকী ধর্মে শ্রদ্ধান্বিত। যে গান চিত্তে বিকার জন্মায়, শরীর মন নিশ্চেষ্ট ও বিলাসী করে সে গানে বঙ্কিমের রুচি নেই।

দরবারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভের অনেক আগে থেকেই ভারতীয় মার্গসংগীত মঠে, মন্দিরে, আশ্রমে অথবা অধ্যাত্ম সাধকের নির্জন ভাবসাধনায় গুহাহিত সুরব্রহ্মের উপাসনারূপে বহমান ছিল। তানসেনের গুরু বৈষ্ণব সাধক হরিদাস স্বামী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী, স্বামী সত্যানন্দ, যুগরাজ সুরদাস সঙ্গীত সাধনার মধ্য দিয়ে ইষ্টভজনা করেছেন। শোনা যায়, পরিব্রাজক সন্ন্যাসী স্বামী সত্যানন্দ নাকি বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ গানের প্রবর্তন করেন।[১১] বিষ্ণুপুরের জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তিনি নায়ক গোপাল ও বৈজুবাওরা রচিত ধ্রুপদ শিক্ষা দেন। বিনিময়ে শেখেন সেকালে প্রচলিত রাগাশ্রয়ী বৈদিক স্তোত্র ও সংস্কৃত গান। বিষ্ণুপুর ঘরাণায় এমন কাহিনী প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমের 'রজনী'র বেদমন্ত্র গায়ক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী সারঙ্গ রাগে, আর্যাজাতি ছন্দে বেদগান করেন। অর্থাৎ তিনি ভারতীয় মার্গসংগীতের শুদ্ধ উৎসের ধারক। সংগীত তাঁর উপাসনার সহায়। 'ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সম্মিলন' এবং সেই সঙ্গে মনন সাধনারও এক মনোরম উপায়। সতত বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিকে একাগ্রভাবে অন্তর্মুখী করার জন্যেই তিনি গান করেন।

বঙ্কিমের বক্তব্য, টপ্পা খিয়াল প্রভৃতি বাঈজী সংস্কৃতিগত গান চিত্ত-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সে গান ব্যক্তিজীবনে সংসারে ও সমাজে হিতের বদলে অহিত টেনে আনে। শারীরিক স্ফূর্তিজনিত মানসিক স্ফূর্তি স্থায়ী সুখ দান করে না। বরং পরিণামে ডেকে আনে দুঃখ। আধি, অথবা ব্যাধি। তাই 'মিছার যৌবন'-সুখের সঙ্গীতে বঙ্কিমের প্রশ্রয় নেই। তাঁর আকাঙ্ক্ষা সেই গানের জন্য যা চিত্তকে অবনয়নের হাত থেকে রক্ষা করে, অধিলোকে 'আত্মা'র উন্নয়ন ঘটায় এবং দান করে চিরস্থায়ী সুখ।

'তারের মেও মেও তবলার খ্যান্ খ্যান্'

—কৃষ্ণকান্তের উইল।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর (১৮৭৮) দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদে রয়েছে ব্যভিচারে মগ্ন গোবিন্দলালের নিরালা প্রমোদ ভবনের সঙ্গীত আসরের ছবি। স্বেচ্ছাচারী নবযুবক গোবিন্দলালের কাছে সঙ্গীত শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্তির উপকরণ। তাই তাঁর অবৈধ জীবন যাপনের সঙ্গী খেয়াল গান। বঙ্কিম স্পষ্টত উল্লেখ না করলেও ওস্তাদ দানেশ খাঁর গায়ন ভঙ্গির ছবি এঁকে বুঝিয়েছেন, সুরতানের মারপ্যাঁচে গলদঘর্ম এই ওস্তাদজী একজন গীতমল্ল খেয়াল-গায়ক। এই দৃশ্যে ধনী বিলাসীর বাগানবাড়ির গানের আসরের একটি স্পষ্ট আলোকচিত্র তুলে ধরেছেন বঙ্কিম—

> নির্মল সুকোমল আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান একটা তম্বুরার কান মুচড়াইতেছে ! কাছে বসিয়া এক যুবতী ঠিং ঠিং করিয়া একটি তবলায় ঘা দিতেছে। তম্বুরার কান মুচড়াইতে মুচড়াইতে দাড়িধারী তাহার তারে অঙ্গুলি দিতেছিল। যখন তারের মেও মেও তবলার খ্যান্ খ্যান্ ওস্তাদজীর বিবেচনায় এক হইয়া মিলিল তখন তিনি সেই গুম্ফ শ্মশ্রুর অন্ধকার মধ্য হইতে কতকগুলি তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া বৃষভ দুর্লভ কণ্ঠস্বর বাহির করিতে লাগিলেন। রব নির্গত করিতে করিতে সেই তুষার ধবল দন্তগুলি বহুবিধ খিচুনিতে পরিণত হইতে লাগিল : এবং ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাশি তাহার অনুবর্তন করিয়া নানারূপ রঙ্গ করিতে লাগিল। তখন যুবতী খিচুনি সন্তাড়িত হইয়া সেই বৃষভদুর্লভ রবের সঙ্গে আপনার কোমল কণ্ঠ মিলাইয়া গীত আরম্ভ করিল—তাহাতে সবু মোটা আওয়াজে সোনালি, রূপালি একপ্রকার গীত হইতে লাগিল।
>
> (ব. র ১ম., পৃঃ ৫৮৮)

এই 'যুবতী' রোহিণী। গোবিন্দলালের প্ররোচনায় কুলভ্রষ্টা হয়ে রক্ষিতা বাঈজীতে পরিণত। তাকে গীতশিক্ষা দেবার জন্যে ওস্তাদজী বহাল হয়েছেন।

বঙ্কিম চিত্রিত করেছেন গোবিন্দলাল রোহিণীর রুচি বিগর্হিত অবৈধ জীবনদৃশ্য। তাই এই গীতচিত্রেও প্রতিফলিত অরুচিকর গায়ন দোষ। কোথাও

কোনো কোমল মধুরতা বা নন্দন-স্বাদ উপভোগের বর্ণনা নেই। দৃশ্যটি যে নন্দিত সুরে বাঁধা নয়। তানসেনের নির্দেশ—'শুধ্ মুদ্রা, শুধ্ বাণী সাঁচি সুরণ আলাপ করো।' শুদ্ধ মুদ্রা অর্থাৎ ভঙ্গি, শুদ্ধ বাণী ও বিশুদ্ধ সুরেই গীতালাপ করা উচিত ; কিন্তু এই দৃশ্যে বঙ্কিম 'যাহা অপবিত্র যাহা অদর্শনীয়' তাই দেখাতে চান। তাই গায়কের মুদ্রাদোষ এত প্রকটভাবে এঁকেছেন।

গানের আসরের দুটি ব্যাপার বঙ্কিমের কাছে বরাবর বিরক্তি সৃষ্টি করত। এক, গায়কের হাস্যকর মুখব্যাদান ও অঙ্গভঙ্গি ; দ্বিতীয়, গায়ক ও তবলিয়ার তান বাঁধা ও সুর মেলানোর ধৈর্যচ্যুতিকর উদ্যোগ।

বঙ্কিম প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণে পূর্ণচন্দ্র জানান, ছেলেবেলায় বঙ্কিম ও পূর্ণচন্দ্র দুই ভাই মিলে কানে আঙুল গুঁজে বেতালা বেসুরো কথকঠাকুরের মুখভঙ্গি উপভোগ করতেন। পরিণত বয়সেও এই দুষ্টুমি বঙ্কিমের যায়নি।—পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন—

'যদি একজন বধির কোনো মুদ্রাদোষবিশিষ্ট গায়কের গান শুনিতে বসেন, তিনি গান শুনিতে পাইবেন না, কেবল গায়কের হাত মুখ নাড়া, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী ও দন্তের নানারূপ বিকাশ দেখিয়া হাসিয়া উঠিবেন। বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে ঐরূপে দুষ্টামী করিতেন। যদি কোনো গায়কের গান ভাল না লাগিত, আপনি আপনার কান টিপিয়া গায়কের মুখ প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, এবং অপরকেও ঐরূপ করাইতেন।[৬২]

তানপুরা-তবলার সুর বাঁধার বিরক্তিকর সময়ক্ষেপে বঙ্কিমের ধৈর্যচ্যুতির পরিচয় যদুভট্টের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপের ঘটনায় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমের অপছন্দকর গায়কের দুটি দোষই 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ওস্তাদ দানেশ খাঁর গানের আসরে প্রযুক্ত। 'কবাল' বা মুসলিম ওস্তাদরা খেয়াল গানের আকর। দানেশ খাঁও একজন 'কবাল'। কিন্তু তাঁর কণ্ঠসাধ্য গীতোদ্যম বঙ্কিম মতে, 'বৃষভ দুর্লভ কণ্ঠস্বর নির্গত', 'খিচুনি সন্তাড়িত' 'রব' মাত্র। সম্ভবত দানেশ খাঁ নীচুমানের কালোয়াত 'আতাই'-এর উদাহরণ।

এই দানেশ খাঁর মাধ্যমে বঙ্কিম বোঝাতে চান, 'খিয়াল' গান প্রমোদবিলাসী সম্ভোগ পরায়ণের মনোরঞ্জক সঙ্গীত এবং মূলতঃ সে গান হল কণ্ঠসাধ্য কণ্ঠ-কসরৎ। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, রবীন্দ্রনাথও গীতমল্ল খিয়ালিয়ার ছবি এঁকেছেন নানা মন্তব্যে। যেমন—

'আজকাল ওস্তাদবর্গ ভীষণ মুখশ্রী বিকাশ করিয়া গলদঘর্ম হইয়া গান করেন…' (র. ব জন্মশত ১৪, পৃঃ ৮৭৭)।

'ভারতে বৈঠকী সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছাড়িয়া অসুরের কুস্তির আখড়ায় নামিয়াছে' ইত্যাদি (ঐ, পৃঃ ৮৯৪)।

খিয়াল গান সুর ও রূপ প্রমত্ত স্বেচ্ছাচারী ধনীর চিত্তবিলাস, শুধু এই ধারণায় রুচিবাগীশ মহলে এ গান সম্পর্কে যে ছুঁৎমার্গ ছিল ঠিক তা নয়। এই গানের গায়ন পদ্ধতিও সেকালে নান্দনিক আবেদন সৃষ্টি করতে পারত না। কারণ, তখনকার খিয়ালিয়াদের সাধারণত ঝোঁক ছিল কত কঠিন তানকর্তব করে দুরূহ চক্করের মধ্যে দিয়ে সমে স্থিতি লাভ করবেন এবং দর্শকদের বিস্মিত করে বাহবা কুড়োবেন। লয় ও ছন্দের কারুকাজ নিয়ে নানারকম ক্রিয়া করে ওস্তাদ তবলিয়াকে কে কত বেতালা করতে পারেন তার ওপরেই যেন তাঁদের সমস্ত কৃতিত্ব নির্ভর করত। তাই সুর মূর্ছনা সঞ্চারের বদলে তাঁদের গান হয়ে পড়ত 'গিটকিরি মার প্যাঁচ'। কষ্টসাধ্য কণ্ঠ কসরৎ সৃষ্টি করতে গিয়েই ওস্তাদেরা হতেন হাস্যকর মুখভঙ্গি ও মুদ্রাদোষের শিকার।

দানেশ খাঁর সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেছেন রোহিণী। ধ্রুপদের সঙ্গে যেমন পাখোয়াজ তেমন খেয়ালের সঙ্গত-বাদ্য তবলা। বাঈজীদের নাচগান ও বাদ্যে সমান কুশলী হতে হত—রোহিণীর তবলা বাদনে বোধহয় তারই ইঙ্গিত।

খিয়াল বিরূপতার জন্যে শুধু বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথকে দোষ দিলে ভুল হবে। সত্যি কথা বলতে কি 'খিয়াল' গানের আদিকাল থেকেই গোঁড়া সংগীত-সাধক মহলে এ গানের সমাদর ছিল না।

সঙ্গীত গবেষক দিলীপ মুখোপাধ্যায় জানান—

' আজকাল কাওয়ালি প্রভৃতি চটুল ভাবাপন্ন গানকে আমরা যে মর্যাদা দিই, সে যুগে খেয়ালের মর্যাদা তার চাইতে বেশি ছিল না।'

ঊনিশ শতকেও ধ্রুপদনিষ্ঠ সাংগীতিক সমাজের কাছে খিয়াল আদৃত হয়-নি। অনেকেই এ গান 'যাবনী মিশাল' বলে গ্রহণ করেনি। শেষ পর্যন্ত টপ্পারও যে জনপ্রিয়তা ও প্রসার প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায় খিয়ালের তা হয়নি। অবশ্য শেষের দিকে কেনা কালী মীর্জার আমল থেকেই টপ্পাঙ্গে ভক্তি-গীতি গাওয়া হত। অধ্যাত্ম বিষয় নিয়ে খাম্বাজ, বেহাগ, ঝিঁঝিট রাগে টপ্পা গাওয়ার রেওয়াজ ছিল।

এদেশে ধ্রুপদের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার কারণ নির্ণয় করে দিলীপ মুখোপাধ্যায় বলেন—'ধ্রুপদ পদ্ধতির মাধ্যমেই রাগসঙ্গীত বাঙালীর জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাই ধ্রুপদের ছিল অন্য সম্মান অন্য কদর।'

বিষ্ণুপুর ঘরাণার গায়ক শিল্পী সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা—

'তখনকার মানুষের রুচি ও আগ্রহ আধ্যাত্মিক ভাবধারার উপরই সমধিক ছিল বলে ধ্রুপদের মধ্যে সেই বস্তু থাকায় এই গানের চর্চাই প্রধানতম হয়েছিল এবং সৃষ্টি করেছিল বহু বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক।'[৬৬]

তবে স্ফূর্তিবাজ 'বাবু'দের উদ্যোগে বাঈজী কিংবা মুসলিম-ওস্তাদ 'কবাল'-রা ছাড়া খিয়ালচর্চা যে উনিশ শতকে আর কেউ করতেন না তা কিন্তু নয়। এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার একটি ধারা কৃষ্ণনগরের দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬), মাধব মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র খাজাঞ্চী ও তাঁদের শিষ্য দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের মাধ্যমে লক্ষ্য করা করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক গৃহে কাঁটালপাড়ার রথের সময় একবার গীত বৈঠক করেছিলেন। কার্তিকেয় চন্দ্রের আত্মচরিতে জানা যায়—

> বঙ্কিমবাবুরা চারি ভ্রাতাই তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের বাটিতে সে সময় যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল, তথাপি যে পর্যন্ত গান গাইলাম সেই পর্যন্ত কোনো ভ্রাতাই যাত্রার নিকট গমন করিলেন না। বোধ হইল যেন সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন।

কার্তিকেয়চন্দ্র কি গান গেয়েছিলেন তা অবশ্য জানাননি। খেয়াল ছাড়া তিনি নিজে প্রণয় ও ভক্তিগীতি পদ রচনা করে গাইতেন।[৬৭]

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই লক্ষ্য করা যায় নামকরা ধ্রুপদীয়ারাও খেয়াল টপ্পা গানে খ্যাতি অর্জন করেছেন। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী বা নুলো গোপাল ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা তিন গানেই সিদ্ধ ছিলেন। সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য জানায়—

> যাঁরা ধ্রুপদ শিক্ষার পর অন্য একটি উচ্চ বস্তুকে সাধনায় প্রধান করে নিয়ে সুনামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তাঁরাও বিষ্ণুপুর ঘরাণার গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিরূপে পরিগণিত—যেমন রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।[৬৮]

গোবিন্দলালের সঙ্গীত-আসরের অস্বচ্ছন্দকর দৃশ্যে বঙ্কিম আভাসিত করেছেন একটি গভীর জীবনসত্য। মনের সুর যদি স্বাভাবিক জীবনাকর্ষণের আনন্দতানে সুসামঞ্জস্যে বাঁধা না থাকে তবে সুরের বাহ্য আয়োজনেও গভীর এবং স্থায়ী সুখ মেলে না। ক্ষণিক সুখের সেই জীবনের ছন্দ তাল লয় যায় সহজেই কেটে। গুণী শিল্পী হয়েও কোনো যন্ত্রে সুর তোলা যায় না তখন। মন-পসন্দ্ রাগের গানের জন্যেও আগ্রহ জাগে না আর।

ভ্রষ্ট গোবিন্দলালের আপাতস্বচ্ছন্দ ভোগ-সুখী আয়েসী জীবনে ছন্দ-পতনের মতো আবির্ভাব নিশাকরের, ভ্রমরের স্মৃতি বয়ে। বিস্মৃত সাধ্বী পত্নীর এই স্মৃতিই গোবিন্দলালের ব্যভিচারী জীবনে অনধিকার প্রবেশ করে তাঁর চিত্তে ভ্রমর গুঞ্জনের মতো অবিরত তাড়না সৃষ্টি করেছিল। তারপর আর তাঁর গীতনেশামগ্ন সম্ভোগী জীবন ও মন সুরে বাজল না। অস্বস্থ এই জীবনের উৎকট বে-সুর যে তখন বিবেকী মনে স্পষ্ট।

দুঃসহ স্মৃতির তাড়না থেকে রেহাই পাবার জন্যে গোবিন্দলাল সুরের নেশায় ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন। দানেশ খাঁকে তাঁর আজ্ঞা : 'কিছু গাও।' তানপুরায় সুর বেঁধে নিয়ে ওস্তাদজীর প্রশ্ন, 'কি গাইব?' আনমনা থাকাই গোবিন্দলালের উদ্দেশ্য। তাই রাগ ফরমাশ করেননি তিনি।

যা খুসি' বলিয়া গোবিন্দলাল তবলা লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্বেই কিছু কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন : কিন্তু আজি দানেশ খাঁর সঙ্গে তাঁহার সঙ্গত হইল না, সকল তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দানেশ খাঁ বিরক্ত হইয়া তম্বুরা ফেলিয়া গীত বন্ধ করিয়া বলিল, 'আজ আমি ক্লান্ত হইয়াছি।' তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গৎ সব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। (ব. র. ১ম, পৃঃ ৫৯১)

সমকালীন সমাজের অভিজ্ঞতা থেকে বঙ্কিমের উপলব্ধি, খেয়াল টপ্পা ঠুমরির আকর বাঈজীরাই গীতাকর্ষণে নববাবু ও অসংযমী সুর পাগলদের আত্মহারা করে। গৃহ সুখ থেকে জীবনের শৃঙ্খলা থেকে বিচ্যুত হয়ে এই সুর-মত্তেরাই ঘনিয়ে তোলে নিজের, পরিবারের ও সেই সঙ্গে সমাজেরও সংকট। গান সে যুগের এক সর্বনাশা নেশা। বাগানবাড়ির বিলাসে কত ধন মান জীবন নিঃস্ব হয়ে গেছে সে সময়। রোহিণীর মতো কুলভ্রষ্টারা উচ্ছৃঙ্খল ধনী যুবকের প্ররোচনায় অবৈধ বিলাসসঙ্গিনী বা রক্ষিতা বাঈজীতে পরিণত হয়েছেন এমন ঘটনা সেকালে অবিরল। গানের জন্যেই বাঈজী অথবা বাঈজীর জন্যেই গান — যেন এই ছিল সেকালের নববাবুদের জিগির। তাই বঙ্কিমের ব্যঙ্গোক্তি—

'যিনি বারযোষিতের চীৎকার মাত্রকেই সঙ্গীত মনে করেন তিনিই 'বাবু'।'

(ব র. ২য়, পৃঃ ১১)

'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেখর' 'রজনী' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' পর পর খেয়াল প্রসঙ্গের অবতারণা করে বঙ্কিম তাঁর সঙ্গীত-উৎসুক সমাজকে বুঝিয়েছেন, ধ্রুপদের অসপত্ন আধিপত্য উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই আর নেই। খেয়াল-

যুগের আগমন আসন্ন। এবং এই বস্তুবাদী স্বেচ্ছাচারী ভোগমুখী সমাজেই তার অভ্যর্থনামও সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে আছে আর এক ভিন্ন গীত পরিস্থিতি।

নিশাকর গভীর রাত্রে রোহিণীর সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের ছলনায় চিত্রানদীর ঘাটের সিঁড়িতে অপেক্ষা করছেন। উদ্দেশ্য গোবিন্দলালের 'চোখ ফুটান'। রোহিণীর নতুন অভিসার দেখাবার জন্যে গোবিন্দলালকে তিনি খবরও পাঠিয়ে দিয়েছেন। নবম পরিচ্ছেদে এই ঘটনারই পরিণতি রোহিণী হত্যা। অচিরেই ঘটবে সেই বজ্রপাত। অষ্টম পরিচ্ছেদের এই মুহূর্তে রয়েছে অশনি সংকেত। তারই কূট ষড়যন্ত্র। রোহিণীর পক্ষে এই কাল রাত্রি। সমস্ত চরাচর গাঢ় অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে শ্বাসরোধ করে নিঃশব্দে চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসা কুকুর ও শৃগালের রব ভয়ঙ্কর নিঃস্তব্ধতা আর উৎকণ্ঠা দ্বিগুণিত করছে। এই রকম চরম উৎকণ্ঠার মুহূর্তে শোনা যায়—"কোথাও দূরবর্তী নৌকার উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈঃস্বরে শ্যামা বিষয় গাহিতেছে।"

এই গান যেন নাটকীয় স্বস্তি। সেই নির্মম পরিস্থিতিকে সহনীয় করে তোলে। ষড়যন্ত্রের নায়ক নিশাকরের মনে ঘা দিয়ে জাগিয়ে তোলে তার বিবেক। 'নিশাকর সেই গান শুনিতেছেন' আর 'মনে মনে ভাবিতেছেন—আমি কি নৃশংস, একজন স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি।' —(ব র. ১ম., পৃঃ ৫৯৪) ক্ষণিকের এই ভাবনাই অকরুণ ব্যাপারটিতে করুণ কোমল ও মানবিক ছায়া ফেলে। অন্যের হাতের পুতুল নিশাকরের এই পাপভাগী ভূমিকার জন্যে সহানুভূতিও জাগায়।

এই উপন্যাসে বঙ্কিম স্বেচ্ছাচারীর সঙ্গীত বিলাসের পাশেই সহজ লোক-জীবনের সরল পরিবেশনার গান শুনিয়ে বাংলার বহমান খাঁটি গান সম্পর্কে আর একবার পাঠককে সচেতন করেন। বোঝান, ডিঙি বাওয়া জেলের সামান্য প্রাণের আকুতিভরা গান 'গীতবাদ্যের অনুশীলন' করা (ব র. ২য়., পৃঃ ৫৮৮) বাবু নিশাকরেরও মন আকৃষ্ট করে, জাগিয়ে তোলে তাঁর সু-চেতনা।

আর এইভাবেই বঙ্কিমের সুকৌশল জিজ্ঞাসা—কোন গান সার্থক ? যে গান কুমতির ইন্ধন যোগায়, পাপের পথে নিয়ে যায়—সেই গান ? না, যে গান আত্মবশ হবার শিক্ষা দেয়, বিবেকবোধ জাগায় সেই গান ?

"বিহারত রাহ তুমারি"

—রাজসিংহ

গান বঙ্কিমের কাছে এক আশ্চর্য সব-খোলা চাবি কাঠি—master key. এই জাদুকাঠি দিয়ে খোলেন তাঁর নিজের ভাবনারাজিভরা মঞ্জুষা। খোলেন কাহিনীর বিভিন্নমুখী চরিত্রের মন-পাতালের রহস্যঘর।

'রাজসিংহে'র (১২৮৪-৮৫, ১৮৯৩ ৪র্থ সং) জেবউন্নিসা রূপগরবিনী প্রেম-বিলাসিনী বাদশাহজাদী। কিন্তু তাঁর চিত্ত-নিঃস্বতা, সাধারণ রমণীসুলভ হীনমন্যরূপ বঙ্কিম ধরে ফেলেছেন গানেরই ফাঁদ পেতে। জেবউন্নিসার প্রণয়প্রার্থী মবারকের উপেক্ষিত পত্নী নিঃসম্বল দরিয়াবেগমের দীনপ্রতিযোগিনী করেছেন এই বাদশাহজাদীকে বঙ্কিম গানেরই মানদণ্ডে।

স্বামীসুখবঞ্চিতা হতভাগিনী দরিয়া 'অতিশয় সুকণ্ঠ ; সঙ্গীতে বড় পটু।' (ব. র. ১ম, পৃঃ ৬২১)। দরিয়াকে ঐশ্বর্যময়ী করেছেন বঙ্কিম কণ্ঠসম্পদে। গানই তার একমাত্র সম্বল, নির্ধনের ধন। উৎকোচলোলুপ হারেম প্রহরীকে সে বশ করে গান শুনিয়ে। তার গানে আকৃষ্ট অভিভূত স্বয়ং বাদশাহজাদী। জেবউন্নিসা তাকে কাছে ডেকে বসিয়ে গান শুনেছেন।

'গা। ঐ বীণ আছে।'

বীণ লইয়া দরিয়া গায়িল। গায়িল অতি মধুর। বাদশাহজাদী অনেক অপ্সরোনিন্দিত, সঙ্গীতবিদ্যাপটু গায়ক গায়িকার গান শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এমন গান কখন শুনেন নাই। (ব. র ১ম, পৃঃ ৬২১)

এই অভিজ্ঞতা তাঁর মনে জাগালো উদ্বেগ ও পরাজয় চিন্তা। মবারককে ঘিরে দরিয়া ও তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছে যে সূক্ষ্ম ত্রিভুজ, জেবউন্নিসা উপলব্ধি করেছেন তার বিপরীত বাহুর আসল জোর কিসে। রূপের জোর প্রেমের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী হয় না ; হয় গুণের। সেই গুণেই দরিয়ার জিত। বাদশাহজাদীর ভয় দ্বিগুণিত হয় যখন জানতে পারেন মবারক একদিন দরিয়ার এই গুণে মুগ্ধ হয়েই তাকে বিবাহ করেছিল। হীনমন্যতায় ঈর্ষায় ক্রোধে জ্বলে উঠে জেবউন্নিসা দরিয়াকে প্রহার করেন, তাকে রঙমহালে আর আসতে নিষেধ করেন। কিন্তু তখনই দরিয়া আত্মশক্তির উৎস খুঁজে পায়। শপথ করে—'আবার আসিব, আবার

জ্বালাইব, আবার মার খাইব।…তোমার সর্বনাশ করিব।'

'রাজসিংহে'র দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে মোগল বাদশাহী হারেমের গীতবাদ্য সংস্কৃতির ছবি। মোগলের জাঁকজমক ভোগবিলাসপরিপূর্ণ জীবনের ইঙ্গিত দেওয়া বঙ্কিমের উদ্দেশ্য। 'রঙ-মহালে গীতবাদ্যের বড় ধুম।' 'রঙমহালে রাত্রিতে সুর লাগিয়াই থাকিত।' হারেমের তাতারী প্রহরী থেকে শুরু করে বাদশাহজাদী সকলেই গীতলোলুপ। এই প্রসঙ্গে বলা যায়—গোঁড়া মুসলমান ঔরঙ্গজেবের দরবারে সঙ্গীত সমাদর ছিল না। কিন্তু রঙমহালের নৈশ আসরে ছিল গান বাজনার ঠাঁই।

বঙ্কিমের মন্তব্য—ঔরঙ্গজেব 'কপটাচারী সম্রাট্ জিতেন্দ্রিয়তার ভান করিতেন'। (ব. র ১ম, পৃঃ ৬২২)। তাই প্রকাশ্যে গান বাজনা পছন্দ না করলেও নিজের অন্তঃপুরে, এমন কি রণস্থলের সেনাশিবিরেও নাচগান নিষিদ্ধ করেননি তিনি। নির্মলকুমারী নর্তকী বেশেই মোগল সেনাশিবিরে নিজের স্থান করে নেয়।

সঙ্গীত গবেষকরা জানান—ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম দিকে তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর নাতি খুশহাল খাঁ ও বিশ্রাম খাঁ খিয়ালধারাকে বহন করে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঔরঙ্গজেব এঁদের অর্থসাহায্য করতেন।[১৯]

'রাজসিংহে'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ 'নন্দনে নরক' অধ্যায়ে বঙ্কিম দেখিয়েছেন নৃত্যগীত স্বাভাবিক, বিলাসী দিল্লীনগরীর সাধারণ নাগরিক জীবনেও—'গৃহে গৃহে সঙ্গীতধ্বনি বহুজাতীয় বাদ্যের নিক্কণ।' 'নর্তকী রাস্তায়, লোক জমাইয়া সারঙ্গের সুরে নাচিতেছে।'

'বীণ' 'সারঙ্গ' প্রভৃতি যুগোপযোগী বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখে বঙ্কিম মনোযোগী। স্থানকালপাত্রোচিত মর্যাদায় সঙ্গীত সৃষ্টিতেও তিনি বিশেষ সচেতন।

'রাজসিংহে'র পটভূমি, এই বঙ্গদেশ থেকে বহুদূরের রাজস্থানের এক ক্ষুদ্র পার্বত্যনগরী থেকে দিল্লী পর্যন্ত প্রসারিত মধ্য উত্তর ভারতের অরণ্য পর্বতে বন্ধুর এক বিস্তীর্ণ প্রদেশ। তাই বাংলার কোনো গানের ধারার তির্যক্ প্রতিফলন এ উপন্যাসে কাম্য নয়। এ উপন্যাসের গানের ভাষা ও শৈলী ভিন্ন। দিল্লীর দরবারী ও নাগরিক জীবন সংস্কৃতির অঙ্গীভূত সঙ্গীতপ্রসঙ্গ এখানে জরুরী। আবার রাজস্থানের দেশজ সঙ্গীতও প্রয়োজনীয়। শুনিয়েছেন এখানে বঙ্কিম রাজস্থানের সম্ভ্রান্ত অবরোধের অন্তঃপুরিকাদের পদগাথা ও দোঁহা সংস্কৃতির কথাও। সংগত সঙ্গীতই তো বিশেষ পটভূমির আবহসুর রচনা করে।

'রাজসিংহে' দিল্লীর রঙ-মহালের সঙ্গীত সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বার বার গণিকা-নর্তকী বা বাঈজীদের নাচগানের উল্লেখ ছিল। কারণ মোগল বাদশাহী জীবনে

নাচগান স্ফূর্তি ও প্রমোদবিলাসের উপকরণ। কিন্তু রূপনগরের রাজ-অন্তঃপুরের সঙ্গীত বা নৃত্যবিলাসের কোনো ছবি নেই। কেবল চঞ্চলকুমারী ও নির্মলকুমারীর মুখে বঙ্কিম শুনিয়েছেন পদ এবং দোঁহা।

এ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে চঞ্চলকুমারীর বীরপূজক চরিত্রের পরিচয় রয়েছে তাঁর মুখের পদ-আবৃত্তিতে। এটি একটি অষ্টপদী।

গৌরী সমঝে ভসমভার।
পিয়ারী সমঝে কালা
শচী সমঝে সহস্রলোচন,
বীর সমঝে বীরবালা॥
গঙ্গাগর্জন শম্ভু-জটপর,
ধরণী বৈঠত বাসুকী ফণমে।
পবন হোয়ত আগুনসখা,
বীর ভজন যুবতী মনমে॥

নির্মলকুমারীর রঙ্গরসেভরা স্বভাবের প্রতিফলন তার আওড়ানো তে-পাই বা ত্রিপদীতে—

সোনে কি পিঁজিরা. সোনে কি চিড়িয়া,
সোনে কি জিঞ্জির পয়ের মে,
সোনে কি চানা, সোনে কি দানা,
মট্টি কেঁও সেরেফ্ খয়ের মে।'

(শব. র. ১ম, পৃঃ ৬৭৭)

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে মোগল-সেনাবেশী মানিকলালের কণ্ঠেও বঙ্কিম শোনান উত্তর-মধ্য ভারতীয় লোকভাষার গান। এটি ষট্‌পদী।

'শরম ভরমসে পিয়ারী,
সোমরত বংশীধারী,
ঝুরত লোচনসে বারি।
ন সমঝে গোপকুমারী,
যোহিন্ বৈঠত মুরারি,
বিহারত রাহ তুমারি॥

১২৮৫-এর আষাঢ় সংখ্যার বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম রাজসিংহের এই দৃশ্যে প্রথমে একটি বাংলা গান রচনা করেন।

মানিকলালের সেই গানটি ছিল—

যারে ভাবি দূরে সে যে সতত নিকটে।
প্রাণ গেলে তবু সে যে রাখিবে সঙ্কটে ॥

এ গান পরে সম্পূর্ণ বর্জিত। স্থান-কাল-পাত্র-সাযুজ্যে বিশেষ আবহ সৃষ্টির জন্যে শেষে বঙ্কিম ব্রজ-ভাষায় রাধা কৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক পদ বেঁধেছেন ও মানিকলালের কণ্ঠে যোজনা করেছেন। ষোড়শ সপ্তদশ শতকের সমৃদ্ধ হিন্দীসাহিত্য ও সমগ্র উত্তর ভারতের সম্ভ্রান্ত ও লোকজীবনে তার প্রভাবের কথা স্মরণ করানো বঙ্কিমের অভিপ্রায় ছিল। অওধী ভাষায় রচিত তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' (১৫৭৪ খ্রীঃ) মাড়ওয়ারী বা রাজস্থানী হিন্দীতে রচিত মীরাবাঈ-এর (১৫০৩—১৫৪৬) ভজনগীতি পদাবলী, অওধী ভাষায় রচিত মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত 'পদ্মাবতী' ১৫২০-১৫৪০) কাব্য মোগল যুগের ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দী সাহিত্যের উদাহরণ। এ ছাড়া ব্রজভাষা ও প্রাচীন 'খাড়ি বোলি' মিশিয়ে রচিত হয়েছিল রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক ভক্তিগীতি পদ। সন্ত কবীর (মৃত্যু ১৫১৮ -এর অনুসারী দাদু দয়াল (১৫৪৪—১৬০৩)-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'রাজসিংহে' বঙ্কিম হিন্দীপদগানের আদর্শকে স্বকীয় ভঙ্গিতে ব্যবহার করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন দিল্লী যেমন মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিল—সে যুগে রাজস্থান ছিল হিন্দু ভারতের নিজস্ব শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান। গীত ও সাহিত্যচর্চা মুসলিম রমণীর মতো হিন্দুরাজপুত রমণীরও ছিল অন্যতম চর্যা।

মানিকলালের গান আসলে সংকেতগীতি। ঔরঙ্গজেবের হুকুমে জোর করে দিল্লী নিয়ে চলা অশ্রুমুখী চঞ্চলকুমারীর উদ্দেশ্যে এ গান গাওয়া। রাধা-কৃষ্ণের বিরহপদের আড়ালে জানানো হয়েছে গূঢ় সংবাদ। যে পথ বেয়ে মোগল সেনারা 'রূপকোঙারী'র শিবিকা নিয়ে চলেছে সেই পথেই তাঁর দয়িত এবং উদ্ধারকর্তা রাজসিংহ অপেক্ষা করছেন।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, যেমন বাংলাদেশে তেমনি সমগ্র উত্তর ভারতেই কানু-ছাড়া গীত ছিল না। রাধাকৃষ্ণ চিরন্তন প্রেমিক প্রেমিকার প্রতীকরূপে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিমও তাঁর প্রেমের গানে সর্বত্র 'শ্যাম', 'রাই', কিংবা 'মদন-মোহন', 'মুরারী', 'পিয়ারী', 'গোপকুমারী' ইত্যাদি নায়কনায়িকার প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন।

কৌতূহলী মনে প্রশ্ন জাগে, রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারীর প্রণয়কথা রচনাকালে সে-সময়ের ইতিহাস, ছবি ও গাথার নানা স্মৃতিপঞ্জীর পাতা ওলটাতে ওলটাতে

সঙ্গীতপ্রতিভাময়ী রূপমতী ও তাঁর প্রণয়ী বাজবাহাদুরের প্রেমকাহিনীতে কি বঙ্কিম প্রভাবিত হয়েছিলেন? এই গীতবিধুর প্রেমিক দম্পতির করুণ জীবন-ছবি ছড়িয়ে আছে রাজস্থানের ইতিহাসে, গাথায়, অণুচিত্রে। রাজস্থানী গানের আদর্শ খুঁজতে গিয়ে বঙ্কিম কি রূপমতীর গানেরও খোঁজ পেয়েছিলেন?

অসামান্য সঙ্গীতকুশল রূপমতী ছিলেন ধরমপুরের এক সামান্য জায়গীরদারের কন্যা। তাঁর কণ্ঠের গানে আকৃষ্ট হয়ে মাণ্ডুর সুলতান বাজবাহাদুর তাঁকে বিবাহ করে। কিন্তু তাঁর রূপই তাঁর জীবনে করুণ পরিণতি টেনে আনে। আকবর ও তাঁর সেনাপতি আদম খাঁর লোলুপ দৃষ্টির শিকার হন তিনি।

কাফী খাঁ বর্ণিত রূপমতীর[৭১] মতোই বঙ্কিমের 'রূপনগর-কোঙারী'র 'লোকমনোমোহিনী রূপ'। চঞ্চলকুমারীর বীরপূজক দৃঢ় চরিত্রে রয়েছে রূপমতীর ব্যক্তিত্বের আভাস। রাজসিংহের উদ্দেশ্যে রচিত চঞ্চলকুমারীর রক্ষা-পত্রে পাওয়া যায়, আদম খাঁকে লেখা রূপমতীর গীতিপত্রের বাণীচ্ছায়া। আদম খাঁর উদ্দেশে একটি গান বেঁধে চুড়িসহ রক্ষা-পত্র পাঠান রূপমতী—

থোড়ো রাখো মান আলীজা
কই না মাঙ্গু রাজ
না উদয়পুরকো রাজ,
বাই সারু বিরো মাঙ্গু,
চুড়িলারী পত্ রাখ্।'[৭২]

রূপমতী আদম খাঁর কাছে উদয়পুর রাজ্য চাননি, চেয়েছিলেন মান ও বীরত্বপূর্ণ ভ্রাতৃত্ব। উদয়পুর-রাজ রাজসিংহের কাছে মুক্তা-বলয় পাঠিয়ে চঞ্চল-কুমারী প্রার্থনা করেছিলেন নিজের দাসীত্ব অথবা ভগিনীত্ব।

স্মরণযোগ্য রূপমতীর আর একটি গীতাংশ—

'ঝমাঝম গোরে মুখকা ঝমকা,
রঙ্গিনী বেসরকে মোতীকা ঠমক্কা।'

এই পদের তুলনীয় সাদৃশ্যে মনে আসে 'চন্দ্রশেখরে'র মনিয়াবাঈএর গীত-কলি—'গোরে গোরে মুখপরা বেসর শোহে'।

রূপমতীর গানের জগতে সত্যিই কি বঙ্কিম বিহার করেছেন? শেক্সপীয়রের মতো তিনিও তো ভালবাসতেন—'Old and antique song',[৭৩] 'প্রাচীন গীত'।

'আমার নতুন তরী ভাসল সুখে—
মাঝিতে হাল ধরেছে।'

—আনন্দমঠ

'সঙ্গীত' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছিলেন,

> গীতে তাল যেমন মাত্রার সমতামাত্র, শব্দপ্রকম্পে সেই রূপ থাকিলেই সুর জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা সুররূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ 'বে-সুর' অর্থাৎ গন্ডগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতের সার। (ব র. ২য়, পৃঃ ২৮৪)

শুধু সঙ্গীত কেন, বঙ্কিমের বিশ্বাস, মাত্রাজ্ঞান বা তালই জীবনসুখের সার। ধ্রুপদী সঙ্গীতকারের মতো যথোচিত সাধনায় অনুশীলিত আত্মশক্তিমানই পারে জীবনের কড়ি-কোমল, বাদী-বিবাদী সমস্ত সুরকে সমের আকর্ষণে তাল-লয়ে নিয়ন্ত্রিত রেখে বিধি শৃঙ্খলার সুসামঞ্জস্যে এই সত্তা বা অস্তিত্বকে সার্থক শিল্পচ্ছন্দে রূপায়িত করতে। আপন ইচ্ছা-সুখে বে-খেয়ালে মনের বলগা আলগা করলে জীবনে বে-সুরই কেবল প্রাধান্য পায়। কোনো নন্দিত শিল্পের মতো এ জীবন মঞ্জুল, মঙ্গলোজ্জ্বল, এমন কি পর-সুখদায়ী হয়ে ওঠে না।

বঙ্কিমের 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাজসিংহ' দুর্দমনীয় মনবাসনা ও প্রবৃত্তিতাড়িত আত্মসুখকামী অ-সুখী অশান্ত মানব-মানবীর করুণ জীবনচ্ছবি।

জীবন ও সাহিত্যসাধনার শেষপর্যায়ে বঙ্কিম সম্পূর্ণ নতুন সুরে নতুন শৈলীতে নবজীবনের গান বেঁধে এই সংসার-ক্ষুব্ধ নরনারীর নিশ্চিত সুখের উপায় নির্দেশ করেছেন। পরবর্তী 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭) উপন্যাসে তিনি বিশৃঙ্খল উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের সকল বৃত্তির সুসামঞ্জস্যে একটি ধ্রুবপদের 'শমে' স্থিত। ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-গত আত্মমুখী মনকে বৃহৎ, সমষ্টিগত ও পরাভিমুখী করার এবং প্রকৃত ধর্মাচরণ ও লোকহিতের উপায় সাধনের পথ তিনি এখন খুঁজে পেয়েছেন। এ পর্যায়ে তাঁর মনন অনুশীলন তত্ত্বগত—ধর্মতত্ত্বপ্রবণ। আর মন সম্পূর্ণ স্তোত্র ও মন্ত্রনির্ভর।

বঙ্কিমের শেষের ত্রয়ী উপন্যাসে স্তব-স্তোত্র ও মন্ত্রই সঙ্গীত। জীবনের প্রার্থিত, নন্দিত, মঙ্গল ও সুখদায়ী গানের রূপ তিনি এ পর্যায়ে আনন্দমঠেই প্রথম খুঁজে পেয়েছেন। এ উপন্যাসেই দিয়েছেন পথ খুঁজে মরা 'বাঙলা' গানের নবমুক্তি। তাঁর নিজেরই সৃষ্টি 'বন্দেমাতরম্' গান এখানে প্রথম উদ্গীত মন্ত্র রূপে।

'রজনী'তে বঙ্কিম প্রথম সন্ন্যাসীর বেদমন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক উৎসের কথা স্মরণ করেছিলেন। জানিয়েছিলেন, ঈশ্বরের মহিমা গানই মন্ত্র।

এই মন্ত্র-মহিমা ব্যাখ্যানেই বঙ্কিম তাঁর 'আনন্দমঠে' জীবনের শান্তি, মহা কল্যাণ ও সত্য আনন্দের আশ্রয় পেতে চান। মঠ ও মন্ত্র তো অবিচ্ছেদ্য।

যেমন ঈশ্বর অথবা প্রকৃতিই হতে পারে সমস্ত শ্রেণীনির্বিশেষে একমাত্র ধ্যেয়। তেমনি এ দুয়ের একমাত্র বিকল্প 'স্বদেশ'। বিজ্ঞ বঙ্কিম বুঝেছিলেন, উনিশ শতকের বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের যুগে অবতারকল্প ঈশ্বর সর্বজনমান্য ইষ্ট নন, দেশই একেশ্বরী। তাই তিনি 'আনন্দমঠে' সেই দেশরূপী ঈশ্বরীর প্রতিমা প্রতিস্থাপিত করে তাঁরই উদ্দেশ্যে সমস্ত গান সমর্পণ করেছেন।

এই ঈশ্বরীর মৃন্ময়ী রূপ-লাবণ্য তাঁর নিসর্গ সৌন্দর্যবিভায়, তাঁর লোক-কায়া রচিত বসু সন্তানদের নিয়ে, জন্মভূমির রক্ষণাবেক্ষণে যাদের খরকর-বালধৃত বাহু সদা উত্তোলিত। এই ঈশ্বরীর প্রাণ স্বাধীনতা—যার অভাবে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিকাশ ও সমৃদ্ধি অসম্ভব। এই দেশদেবীর আসন দেশভক্তেরই চৈতন্যে। সন্তানদের ভক্তিই তাঁর পুষ্পাঞ্জলি।

'আনন্দমঠে' (১৮৮২) বঙ্কিম মন্ত্রশক্তিবলে সন্তানদের অনাদিবহির্মুখ ইন্দ্রিয়াবলীকে উদ্‌বর্তিত করে দেশমাতৃকার প্রতি একান্ত ভক্তিমুখী করতে চান। তাই এ উপন্যাসের আদ্যন্ত নামজপের মতো আবৃত্ত হয়েছে 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে' মন্ত্র শ্লোক।

এই কলিকল্মষ যুগে বঙ্কিম যেন চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী-বিশ্বাসী। 'হরের্নামৈব কেবলম্, নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'। হরিনাম বিনা জীবের অন্য কোনো গতি নেই নেই নেই। তাই তাঁর 'আনন্দমঠে'র সন্তান দল হরিনাম গেয়েই জগৎ মাতিয়ে বেড়ান।

দেশরক্ষায় ব্রতী, বিষ্ণুর পালনী শক্তি ও শত্রুসংহার মূর্তিতে বিশ্বাসী বৈষ্ণব সন্তানদল বিষ্ণুভক্ত শ্রীচৈতন্যকে স্মরণে রেখেছিলেন। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে, চৈতন্যের ও সন্তান সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্মের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বুঝিয়েছিলেন;

—'চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়', (ব. র. ১ম., পৃঃ ৭৫০) চৈতন্যদেব নামগানের মধ্যে দিয়ে প্রেম বিতরণ করেছিলেন ; সন্তানদল এই হরিনাম গানে আত্মশক্তি সংগ্রহ করেন এবং ভীত বিপন্ন, মুমূর্ষুর জীবনে ও মনে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করেন।

শক্তিদায়ী 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' মন্ত্রগানই 'আনন্দমঠে'র উদ্বোধন সঙ্গীত।

প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে দস্যুভয়ে বিপন্ন ক্ষুধা-তৃষ্ণার অবসাদে কাতর কল্যাণী যখন আচ্ছন্ন চৈতন্য কিন্তু ভক্তিপ্রগাঢ় চিত্তে ঈশ্বরের শরণাগত তখনই তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে 'অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত' 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' স্তবগান। সত্যানন্দের গাওয়া দূরাগত কিন্তু ক্রমশ নিকটবর্তী এই নামগান কল্যাণীর অবসন্ন ও আচ্ছন্ন চৈতন্যে জাগায় এক অভিজ্ঞতা।

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণে শুনিয়াছিলেন যে দেবর্ষি গগনপথে বীণা-যন্ত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন : তাঁহার মনে সেই কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল। মনে মনে দেখিতে লাগিলেন, শুভ্র শরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্র বসন, মহাশরীর মহামুনি বীণাহস্তে চন্দ্রালোক প্রদীপ্ত নীলাকাশ পথে গায়িতেছেন,—

'হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'—ক্রমে গীত নিকটবর্তী হইতে লাগিল। আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'। ক্রমে আরও নিকট আরও স্পষ্ট—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'। শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া গীত বাজিল,—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'। কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন। (ব. র ১ম, পৃঃ ৭২০)

হরিনামগানে মুমূর্ষু কল্যাণী লাভ করেছেন জীবনাশ্বাসী অভয়বাণী। মধুকৈটভ ও মুর দৈত্য বিনাশী হরির নাম উচ্চারণ করে সত্যানন্দ স্বামী দস্যু-ভীতা কল্যাণীর বিপদ বিনাশ করে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। এই বিপন্ন উদ্ধার-চিত্র যেন 'আনন্দমঠ' নাট্য-আখ্যানের নান্দীমুখে প্রতীকোচ্চারণ। হরিনাম-সর্বস্ব সন্তানদলের উদ্যোগেই শত্রুনিপীড়িতা দেশজননী একদিন সমুদ্ধৃতা হবেন।

কল্যাণীর কল্পনায় নারদ প্রসঙ্গের অবতারণা করে এ উপন্যাসের গোড়াতেই বঙ্কিম ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সাংগীতিক ঐতিহ্যের কথা কৌশলে স্মরণ করালেন। বৈদিক কাল থেকেই এদেশের সঙ্গীত ঈশ্বর বন্দনায় ও আত্মার হিতসাধনে উৎসর্গীকৃত। ভারতের গানের মহিমা অতীতকাল থেকেই আধ্যাত্মিক।

দেবর্ষি নারদ সামবেদের উপবেদ গন্ধর্ববেদ বা প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রের,

আদি আচার্য। তাঁর 'নারদীয় শিক্ষা'[৭৩] বৈদিক সঙ্গীত বিধির প্রাচীনতম শাস্ত্র। দেবস্তুতিমূলক প্রাচীনতম এই বৈদিক সামগান গাওয়া হত উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরে, বীণাযন্ত্র সংযোগে। পুরাণোক্ত সঙ্গীতবিদ গন্ধর্বেরা স্বর্গে মর্ত্যে দেবস্তুতি করে বেড়াতেন বীণা বাজিয়ে। তাঁরা ছিলেন দেবতাদের চারণ গায়ক। "দেবানাং গায়না হ্যেতে চারণাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।" 'আনন্দমঠের' সন্তান-দল সেই ঐতিহ্যানুগামী; দেশদেবীর চারণ তাঁরা। কণ্ঠে তাঁদের দেশস্তুতি—'বন্দেমাতরম্'।

রামদাস সেন তাঁর 'ভারতবর্ষের সঙ্গীত শাস্ত্র' প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেন—প্রাচীন ভারতের মনস্বীর উক্তি—

'জপ কোটি গুণং ধ্যানং
ধ্যান কোটি গুণং লয়ঃ।
লয় কোটি গুণং গানং।
গানাৎ পরতরং ন হি॥

(বঙ্গদর্শন, ১২৮০, ফাল্গুন)

কোটি জপ ধ্যান, সমাধির চেয়েও শ্রেষ্ঠ হল গান। গানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই। ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং বলেছিলেন—

'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ'।[৭৪]

ভক্ত যেখানে গান করেন সেখানেই ভগবানের অবস্থান। গানই উপাসকের উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়। বঙ্কিমও তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে' বলেছেন একথা—'ভারতবর্ষে ···সঙ্গীত উপাসনার সহায়।' (ব. র. ২য় পৃ. ৬৬৬) তাই তাঁর সন্তানদলের কণ্ঠে সতত সঙ্গীত।

'হরে মুরারে' নামগান বিষ্ণুর গুণানুবাদ। এ গান কীর্তন। সমবেত কণ্ঠে যখন গীত হয়েছে তখন তা সংকীর্তন।

দেশচৈতন্যবাদী ভক্ত সন্তানসম্প্রদায় এ গান বীজমন্ত্রের মতো ধারণ করে দেশোদ্ধার-সংকল্পকে সুদৃঢ় করেছেন। মধু, কৈটভ ও মুর বিনাশন হরির শত্রু-দমন স্মৃতির সতত আন্দোলনের অভিঘাতে তাঁরা সদাজাগ্রত ও উৎসাহিত। এই গুরু-মন্ত্রের উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়েই তাঁরা ফুল্লচিত্তে দেশমাতৃকার পায়ে বলি-প্রদত্ত।

আবার "হরি তাঁদের কাছে শুধুই অরিমর্দন নন। তিনি 'গোপাল'। সমগ্র পৃথিবীর তিনি পিতা—রক্ষাকর্তা। পালক। দেশব্রতী সন্তানদলের ও ধর্ম-দেশারিনাশ করে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করা এবং নির্ভয় স্থিতি দান করে তাঁকে

পালন করা।

'গোপাল'-হরিরই অন্য নাম গোবিন্দ, শৌর, মুকুন্দ। 'গো' অর্থ পৃথিবী, আবার 'গো' শব্দে জ্ঞানও বোঝায়। হরিই জ্ঞানের আধার। তাঁকে জানলেই পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। তাই তিনি 'গোবিন্দ'। এবং তিনিই বীর্য ও মুক্তি প্রদানকারী শৌর ও মুকুন্দ। ভগবান অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্যময় ঈশ্বরের কাছে সন্তানদল কর্ম, জ্ঞান, বীর্য ও মুক্তি এই চতুর্বিধ ঐশ্বর্যই কামনা করেন।

'আনন্দমঠ' থেকেই বঙ্কিম শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্ত-রঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে পূর্ণ মানুষ গঠনে ব্রতী। দেশরূপী ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে সন্তানসম্প্রদায়ের চতুর্বিধ বৃত্তির অনুশীলন। তাঁদের আছে দেশরক্ষায় সমর্থ শত্রুনিপীড়ন-যোগ্য শারীরিক ক্ষমতা; আছে দেশচৈতন্যরূপ জ্ঞান, আছে কর্মকুশলতা—দেশ রক্ষার কার্যকরী বুদ্ধি এবং দেশরূপী ঈশ্বরে পরানুরক্তি। দেশ প্রেমে এবং দেশদেবীর প্রীতি সাধনে তাঁদের চিত্ত রঞ্জিত। দেশই তাঁদের পরম আনন্দের আশ্রয়, মুক্তিস্বরূপিণী। দেশধর্মাচারী সন্তানদের কাছে দেশই সাধ্য-সাধন তত্ত্ব। এই দেশ সাধনার যথার্থ বীজমন্ত্র তাই 'হরে মুরারে' নাম গান।

রবীন্দ্রনাথ আশৈশব অভ্যস্ত ছিলেন ঔপনিষদিক শ্লোকে। নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রুতি ও কণ্ঠ আবাল্য অভ্যস্ত বিষ্ণু ও চণ্ডীনাম স্তোত্রে। স্তব-স্তোত্র বঙ্কিম মতে 'মুখ্য ভক্তির লক্ষণ' (ব. র. ২য়, পৃ. ৬৪৬)। হরি ও দুর্গানাম মন্ত্রের শক্তিতে বঙ্কিম বার বার তাঁর 'আনন্দমঠে'র সন্তান-দলকে দেশমাতৃকার প্রতি একান্ত ভক্তিমুখী করতে চেয়েছেন।

প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রের যুগ্মকণ্ঠে শোনা যায় দুর্গাস্তব—'সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে'। দুর্গা বিষ্ণুর সহায়িকা—বৈষ্ণবী শক্তি। সকল দুর্গতি মোচন করে সৃষ্টি স্থিতি রক্ষা করা যায় এই শক্তি বলেই। তাই হরিনামসাধক সন্তান-দল কল্যাণীশক্তি দুর্গার চরণেও প্রণাম জানিয়েছেন।

ঋদ্ধি-সিদ্ধিজ্ঞান-বলমণ্ডিত দশভুজা দুর্গা প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমের ধ্যেয়া দেশ-মাতৃকার ইষ্টামূর্তি। সত্যানন্দের দুর্গাস্তব মূলতঃ দেশদেবীরই প্রণাম মন্ত্র।

'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছিলেন—

ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত উপাসনার সহায়'। 'মাইকেল এঞ্জিলো বা ফিদিয়াসের ভাস্কর্য, জার্মানীর বিখ্যাত সঙ্গীত প্রণেতৃগণের সঙ্গীত উপাসনার সহায় (ব. র. ২য়., পৃ. ৬৬৬)।

বঙ্কিমও তাই দেশভক্তির উৎসারহেতু দেশমাতৃকার স্বর্ণময়ী প্রতিমা রচনা করে 'আনন্দমঠে' তা প্রতিস্থাপিত করে ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যার মাধ্যমে সাকার পূজা বিহিত করেছেন এবং স্বদেশ-সঙ্গীত রচনা করে দেশদেবীর প্রীতিসাধন ও সেইসঙ্গে উপাসক হৃদয়ে উৎকৃষ্ট ভক্তিসাধন অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করেছেন। বঙ্কিমের এই মূর্তি ও সঙ্গীত-সৃজনবিদ্যা দেশধর্ম তথা ঈশ্বর উপাসনারই উপকরণ।

স্বপ্নকল্পিত দেশের প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত কবি-সন্তান বঙ্কিমচন্দ্র সত্রামথিত আবেগে রচনা করেছেন যুগান্তকারী দেশবন্দনাগীতি 'বন্দেমাতরম্'। মৃন্ময়ী রূপাঢ্য বঙ্গপ্রকৃতি-বর্ণনা ও চিন্ময়ী দেশবন্দনার সম্মিশ্রণে, চিত্রভাষা ও কবি ভাষার প্রকৃষ্ট বন্ধনে রূপ নিয়েছে এক আশ্চর্য দেশরাগিণী মূর্তি। রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম্' গানে 'দেশ' সুর নির্দেশ করেছিলেন। বঙ্কিম সংযোজিত করেছেন রাগমালা চিত্রে 'দেশ'-এর নবতর সংস্করণ। 'সঙ্গীত' প্রবন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্য—

> হিন্দুদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত কল্পনা-কুতূহলিনী ·· ধ্বনি এবং মূর্তির পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই প্রাচীনেরা রাগরাগিণীকে সাকার কল্পনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন আর্যদিগের আশ্চর্য কবিত্বশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিচয়স্থল।

বঙ্কিমের নিজস্ব দেশধ্যান-চিত্রও তো কবিত্বশক্তি ও কল্পনাশক্তির আশ্চর্য পরিচয়স্থল।

ভবানন্দ প্রথম এ গান গেয়েছেন 'আনন্দমঠে'র প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে। 'ফুল্ল জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী'র রূপে বিমুগ্ধ চিত্তের স্ফূর্তিতে এ গান তাঁর কবি-হৃদয় হতে স্বতোৎসারিত। ভবানন্দের সঙ্গী, স্বজন হারানোর বেদনায় মৌন মহেন্দ্র এই গানের অভিঘাতেই প্রশ্নমুখর হয়েছিলেন—'মাতা কে? এতো দেশ, এতো মা নয়'। ভবানন্দের উত্তর—'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। এবার মহেন্দ্রর অনুরোধ 'তবে আবার গাও'। ভবানন্দ সম্পূর্ণ গীতটি গাইলেন।

"বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্ত কোটি কণ্ঠ-কলকল-নিনাদ করালে,
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈধৃ্তি খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদল বারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অতুলাম্ অমলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।"

(ব. র. ১ম., পৃ. ৭২৬)

কিন্তু এখন 'মহেন্দ্র দেখিল দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতেছে।' তবে এ ক্রন্দন আশাহতের ক্রন্দন নয়। ভক্ত-হৃদয়ের আনন্দে ও বিষাদে মেশানো এ ভাবাশ্রু।

'বন্দেমাতরম্' গান ভাবে রসে রূপে সুসম্বদ্ধ এক আশ্চর্য সঙ্গীত। এ গানে রূপ নিয়েছে ভক্ত সন্তানের আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়া দেশমাতৃকার স্বপ্নমূর্তি। সেই মূর্তি ভক্তহৃদয়েরই অনুভবে বিচিত্র রসের উদ্দীপনাস্বরূপ। এই মূর্তি ধ্যানেই ভক্তের আনন্দ তাঁকে না পাবার কাতরতায় বিষাদ। এ গান যেন নবরসের একীভবন। দেশজননীর নৈসর্গিক রূপে বিমুগ্ধ কবির চিত্তপ্রফুল্লতা সহাস্য আনন্দ এবং প্রেম-মাধুর্য 'বন্দেমাতরম্' গানের প্রথম স্তবক 'সুজলাং সুফলাং ··· সুখদাং বরদাং·····' ইত্যাদি পদে বিকীরিত।

দ্বিতীয় স্তবক 'সপ্তকোটি কণ্ঠ···রিপুদল বারিণীং····' পদপংক্তিতে উচ্ছিত

বীররসের স্থায়ীভাব ক্রোধ। খরকরবাল-ধৃত বসু সন্তান যাঁর কেন তিনি 'অবলা' শব্দ লাঞ্ছিতা ? তাই এই ক্রোধ, আর অপলাপকারীদের প্রতি ধিক্কারে সন্তানের জুগুপ্সা। 'বহুবলধারিণীং রিপুদলবারিণীং' বিশেষণে নিহিত দেশমাতার ভয়ানক ও বীভৎস ভাবরস।

'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম ··তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'—পদরাজি দাস্যভাবে ও ভক্তিরসের নিবিড়তায় গড়া। 'ত্বং হি দুর্গা অতুলাং অমলাম্' স্তবক দেশদেবীমাতৃকার অলৌকিক অপূর্ব গুণময়ী রূপহেতু বিস্ময়ভাবে ও অদ্ভুত রসচমৎকারিত্বে ভরপুর। ষড়ৈশ্বর্যময়ী জননীর 'সুস্মিতা' এই রূপ দর্শনেই ভক্তের পরম আনন্দ ও চরম শান্তি। তাই 'সুজলাং সুফলাং শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং' দেশজননীর পাদবন্দনা করেই 'বন্দেমাতরম্' গান শমে পেঁছেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দেশদেবীর অসমোর্ধরূপ ভক্ত-কবি আস্বাদন বৈচিত্র্যেই উপভোগ করেছেন।

এ গান দেশমাতৃকার স্তবগাথা এবং তা মননযোগ্য বিষয়। এ গান মনন করে সন্তানগণ দুর্গতিময় জীবন থেকে আত্ম ও দেশকে ত্রাণ করতে চান। তাই 'বন্দেমাতরম্'ও আসলে মন্ত্রগান।

এই গীত-মন্ত্রেই বঙ্কিম স্তুতিভবে দেশমাতৃকাকে বলেছেন 'ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে'। দেশই ভক্তের প্রাণস্বরূপা। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেশমূর্তির স্বপ্ন সমবায়ে গড়ে ওঠে জন্মভূমির সন্তানের দেশ-চৈতন্য। এই চৈতন্যই সন্তানকে সর্বদা প্রাণস্পন্দিত ও কর্মচঞ্চল করে রাখে। তাঁর মন কর্ম-বাক্য দেশকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। দেশই প্রাণস্বরূপা—এই সত্যোপলব্ধিই সন্তানের সাধনার ধন। তাই বীজমন্ত্রের মতো এই বাক্য ধারণ করে দেশভক্ত নিজের হৃদয়মূলে দেশদেবীরই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

ভূপ্রকৃতি ও জনসমষ্টি নিয়ে দেশকায় রচিত। 'বন্দেমাতরম্' গানের প্রথম স্তবকে দেশের নৈসর্গিক রূপের ও দ্বিতীয় স্তবকে বসু সন্তানদের বর্ণনা। দেশের প্রাণ সঞ্জীবিত হয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায়। তাই 'ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে'—দেশমাতৃকার স্বাধীনতাস্বরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা মন্ত্রও বলা যায়। প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে নিসর্গপ্রকৃতি যেমন ঋদ্ধি ও শ্রীময়ী হয় তেমনি স্বাধীনতায় দেশের গণশরীরের স্বচ্ছন্দ বিকাশ অভ্যুদয় সৌন্দর্য সমৃদ্ধিও সম্পন্ন হয়। এই স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করতে হয় শারীরিক ও আত্মিক শক্তিবলে। বাহুবল বাহ্য শত্রুর ভয় নিবারণে সমর্থ। কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষণ শক্তিআহৃত দেশচৈতন্যে ; দেশবাসীর প্রেমে, ভক্তিতে ও সেবানিষ্ঠায়।

দেশকে আশ্রয় করেই মানুষের সর্ববৃত্তি—জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী, শারীরিকী ও চিত্তরঞ্জিনী অনুশীলিত। সর্বতত্ত্ব—মানবতাবাদ, পরহিতবাদ ও আত্ম-অতিক্রমী অধ্যাত্মবাদ, কর্ষিত। দেশের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি চিন্তাই মানুষকে সর্বদা প্রাণ ও কর্মচাঞ্চল্যে, চৈতন্য ও আনন্দময়তায় উজ্জীবিত করে রাখে। অতুলা দেশমাতার যথার্থ প্রণামমন্ত্র তাই—

"সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।"

বঙ্কিমের ধ্যেয়া দেশজননীর সাকার বিগ্রহ 'সা রাষ্ট্রীরূপা' "নারায়ণী"—জ্ঞান ঋদ্ধি বল সিদ্ধি এই চতুর্বল সমন্বিতা দশভুজা শিবার পূর্ণাঙ্গ মূর্তি।

এই স্বাধীনা ও শ্রীময়ী দেশজননীর ইষ্টা মূর্তির যে বিরহ বঙ্কিম অহরহ তাঁর চিত্তগভীরে অনুভব করেছেন, সেই বিরহের আকৃতি ও আকুলতাবাহী সুর—'মেঘ-মল্লার' আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' গানের রাগধ্বনি। এই বিরহের রাগে নেই ক্রন্দনের আর্তি। আছে মিলনের আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনা।

'বন্দেমাতরম্' রচিত হয় 'আনন্দমঠে'র অনেক আগেই। গানটিতে সুর দিয়েছিলেন যদুভট্ট। রাগ 'মল্লার'। জলদগম্ভীর অথচ উদ্দীপনা-সঞ্চারী এই বর্ষার রাগ বঙ্কিমের বড়ো প্রিয়।

পরে 'আনন্দমঠে' দেশভক্তের চিত্তরঞ্জিনী ও বীর্যোদ্দীপক সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দেমাতরম্' সন্নিবিষ্ট হল। তখনও দেখা গেল 'উচ্চনিনাদে মেঘমল্লার রাগে' এই গীত ধ্বনিত করে সহস্র সন্তানদল মৃত্যু তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছেন। (ব. র. ১ম., পৃ. ৭৭০)। মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন সে সন্তানদলের ব্রত।

সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ সোমনাথ 'মল্লার'-এর বিরহোল্লাসিত মিলন-তৃষ্ণার ভাবরূপ প্রকাশ করে বলেছেন,—'মৃদুহসিতোঽতিপিপাসিতচাতকপোষ্যেষু মল্লারি'।[৭৫] মৃদুহাসি ও তীব্র চাতক-তৃষ্ণা মল্লারের ভাব। স্বাধীন দেশকে লাভ করবার চাতক তৃষ্ণাই রাগমর্মজ্ঞ যদুনাথ নির্দেশিত 'বন্দেমাতরম্' গানের সুর-'মল্লার'-এর মর্মকথা।

'বন্দেমাতরম্' প্রবন্ধে ললিত মিত্র জানান—

বন্দেমাতরম্ রচিত হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সুকণ্ঠ গায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাতে সুরতাল সংযুক্ত করিয়া প্রথম গাইয়াছিলেন।[৭৬]

পূর্ণচন্দ্রের বিবৃতি—

বহুকাল পরে 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় কোরাসে গাহিবার জন্য মিশ্রসুর

বসাইয়াছিলেন। পরে শ্রীমতি প্রতিভা দেবী আর একটি সুর বসাইয়াছিলেন। বেহাগ সুরে ভাল লাগিলে লাগিতে পারে।[৭৭]

সরলাদেবী চৌধুরাণীর স্মৃতিচারণায় জানা যায়, এই গানের প্রথম দুই পদে সুর দেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁরই নির্দেশে বাকীটুকুতে সুর সংযোজন করেন সরলাদেবী নিজে। সেই সুর 'দেশ'।[৭৮] তিনি জানান—'দুই একটা জাতীয় উৎসবে সমস্বরে বহুকণ্ঠে গাইতেও শেখালুম। সেই থেকে সভাসমিতিতে সমস্তটাই গাওয়া হতে থাকল।'

এ গান তাঁর কাছে 'তেজ ও দীপ্তিরসে ঢলঢল করছে।'

কিন্তু বঙ্কিম এ গানে চাতক-তৃষ্ণার সুরই রাখতে চেয়েছিলেন। তাই 'আনন্দমঠে' স্পষ্ট 'মেঘমল্লার' রাগ নির্দিষ্ট।

এই তৃষ্ণার কথা বঙ্কিম স্পষ্টস্বরে প্রথম শুনিয়েছেন 'মৃণালিনী'তে (১৮৬৮)। 'চন্দ্রমাশালিনী সা মধুযামিনী বহুত পিয়াসা রে'।

বিদ্যাপতির দুঃখ সর্বসঞ্চারী ছিল সেই গানে। কারণ দেশলক্ষ্মীর সৌভাগ্যোদয়ের কোনো আশাপথ বঙ্কিম তখন খুঁজে পাননি। কিন্তু 'আনন্দমঠে'র কোনো গানে নেই নৈরাশ্য, দুঃখের কাতরতা। আছে উৎসাহ, উদ্দীপনা, ইষ্টলাভের তীব্র ব্যাকুলতা। স্বপ্ন সম্ভাবনার অদম্য উল্লাস। 'এ যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে'?—সমস্ত প্রতিকূলতা নস্যাৎ করে ধ্রুবলক্ষ্যমুখে এগিয়ে যাবার এই দুর্নিবার গতিবেগই 'আনন্দমঠে'র গানের বৈশিষ্ট্য। এমন কি নিষ্ফল-যৌবনা শান্তির গানেও নেই আর্তি। 'বাগেশ্রী' রাগিণীতে আড়া তালে গাওয়া তার অভিসার গীত—

দড়বড়ি ঘোড়াচড়ি কোথা তুমি যাও রে

আসলে marching song, রণাভিযান সঙ্গীত।

মিশ্র ভাষায় লেখা 'বন্দেমাতরম্' গান নবীনচন্দ্র সেনের মতো বিদগ্ধ জন পছন্দ করেননি। বলেছিলেন—[৭৯]

এমন ভাল জিনিষটিকে আধ সংস্কৃত আধ বাঙ্গালায় লিখিয়া মাটি করা হইয়াছে, এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মতো। লোকের ভাল লাগে না। অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বঙ্কিম। তাঁর 'ঈষৎ কুপিত' জবাব—[৮০]

'ভাল না লাগে পড়ো না। আমার ভাল লেগেছে তাই ও রকম লিখেছি। লোকের ভাল লাগবে কিনা ভেবে লিখব?'

যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী ভাগবতের অথবা গীতগোবিন্দের সংস্কৃত পদের সঙ্গে বাংলা পদ মিলিয়ে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে গান গাইতেন। তাঁর

গাওয়া—'প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মান নিদানম্' কীর্তন শুনতে বঙ্কিম ভালোবাসতেন।

কিন্তু আধ-সংস্কৃত আধ-বাংলা মিশিয়ে পূর্ণাঙ্গ গান বেঁধেছেন সর্বপ্রথম নিধুবাবু। তাঁর বিখ্যাত আখড়াই—

(ভবানীবিষয়ক)

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরী সদাশিবে শুভঙ্করী
নিরানন্দে আনন্দদায়িনী
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা অজ্ঞানবোধে সাকার।
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্য রূপিনী।
প্রণতে প্রসন্ন ভব ভীমতর ভবার্ণব
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানী
কৃপাবলোকন করি তরিবারে ভববারি
পদ-তরী দেহ গো তারিণী।

দাশরথি রায়ের (১৮০৬-১৮৫৭) একটি মিশ্র গানও উল্লেখযোগ্য।

(ভৈরবী ত্রিতাল মধ্যলয়)

ভবঘোর কর দূর রাধারাণি ওমা।
দীন হীনে সুদিন দেহি পরমপদ,
বাক্-রূপাত্বং ক্ষিতি মতি ধৃতি রতি
বেদ বিধি উমা সতী বাণী মা।
ক্ষমা দিবা নিশা বিধাতা ধাতা লোকমাতা মা,
নিরাকারা পরমেশা যোগমায়া অযোনিজা,
বাক্‌রূপা ত্বং ক্ষিতির্মপি গণ্যা বেদে ধন্যা দেবে মান্যা
ধ্যান জ্ঞান মান প্রাণ রাগ তান মান লয়
কর কৃপা দরশন, কর দয়া মহামায়া,
শ্রীপদং রজসাং ভরসাং মা॥

বঙ্কিমের দেশবন্দনা-স্তোত্র নিধুবাবুর 'ত্বমেকা ভুবনেশ্বরী'র[৮১] অনুকরণে গাঁথা বিচিত্র গানমাত্র নয়। তাঁর সারাজীবনের সঙ্গীত ভাবনার চূড়ান্ত নির্মাণ-শিল্প এই 'বন্দেমাতরম্'। কথায় সুরে ভাবে এ গান কালগত হয়েও কালবিচ্ছিন্ন অথচ কালাতীত।

এই দেশদেবী-মহিম্নস্তোত্র ভক্ত কবি-হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগে উৎসারিত। দেবভাষার শব্দকুসুম উচ্ছল ভাবস্রোতে স্বতঃই ভেসে এসেছে। প্রথমে সর্বৈশ্বর্য-

ময়ী প্রকৃতিরূপা দেশমাতৃকার অন্তরমোহিনী মধুররূপে আত্মহারা হয়েছিলেন কবি। দেশজননীর সন্তান-সৌভাগ্যের গর্বে ফেটে পড়েছিলেন উচ্চ গমকে। গগনধাবী ভুবনপ্লাবী সপ্তস্বরে ধ্বনিত হয়েছিল গভীর প্রত্যয়ী সন্তানের আত্ম-ঘোষণা। তারপর 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ ·· খরকরবালে'র উচ্চ খাম্ভার-বাণী থেকে সহসা সুর ফিরিয়ে 'অবলা কেন মা এত বলে'র প্রাকৃত বাণীর খাদে নেমে এসেছিলেন গীতিকার। কারণ, তিনি বোঝাতে চান, এ দেশ তো শুধু ভক্তের অধরা দেবী নন, তাঁর নাড়িছেঁড়া ধন সন্তানের তিনি জননী জন্মভূমিও। দেশ ও সন্তানের সম্পর্ক যে সহজ। ভক্ত ভগবানের ব্যবধান ঘুচিয়ে যুক্ত করমোচন করে দুই বাহু মেলে সন্তানেরা যে এই দেশকে 'মা' বলে পরম প্রেমে ও নির্ভরতায় জড়িয়ে ধরতে চায়। তাই এই সহজ অন্তরঙ্গ উচ্চারণ। পূজা আর প্রেমেরই গীতাঞ্জলি বঙ্কিমের এই 'বন্দেমাতরম্'।

এ যে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতস্বরে গগন প্রান্তর ব্যেপে সমবেত কণ্ঠে উদ্গীত প্রকৃতিরূপা ঈশ্বরী-বন্দনা—তাই এ 'সামগান'।

ভাবে ভাষায় সুরে তালে লয়ে প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধ তাই এ 'প্রবন্ধ সঙ্গীত'।

উচ্চৈঃস্বরে রাগাশ্রয়ে দেশজননীর রূপ ও গুণগান এ তাই 'কীর্তন'। সমস্বরে গাওয়া বলে 'সংকীর্তন'।

চারতুকে বা স্তবকে নিবদ্ধ ধ্রুবপদগীতি—এ যেন 'ধ্রুপদ'।

এ তো দেশব্রতী বৈষ্ণবের আখড়া-উদ্ভূত ভবানীবিষয়ক এক আশ্চর্য 'আখড়াই'।

এ দেশপ্রেমে মাতোয়ারা, বিদ্রোহী বাতুল ফকির সন্ন্যাসীদের ঘরছাড়া পাগলকরা 'বাউল সঙ্গীত'। আবার, এ পাঞ্চজন্য শঙ্খের মতো উদার আহ্বানে মাতৃমন্দিরপুণ্য-অঙ্গনে সমবেত গণকণ্ঠের উদ্দীপিত ঐকতান—তাই এ অবশ্যই 'গণসঙ্গীত'।

'বন্দেমাতরম্' গান যেন একই আধারে 'মার্গ' ও 'দেশী'। তা সর্বদুঃখ-মুক্তির সাধন, এবং 'সর্বজনমনোরম' সুখধ্বনি।

রামদাস সেন তাঁর 'ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন, ১২৮০) 'সঙ্গীত দর্পণ' নির্ণীত 'মার্গ' ও 'দেশী' সঙ্গীতের সে সংজ্ঞা উধৃত করেন—সেখানে বলা হয়েছে—

'দ্রুহিণেন যদন্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ
মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্।

ততো দেশস্থয়া রীত্যা যৎস্যাল্লোকানুরঞ্জকং
দেশে দেশে তু সংগীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে ॥

মহাদেবের কাছে ব্রহ্মা যা অন্বেষণ করেছেন এবং ভরত যা সাঙ্গোপাঙ্গে তালমান সমন্বিতরূপে প্রয়োগ করেছেন—সেই সঙ্গীতকেই বলা হয়েছে মুক্তিপ্রদ 'মার্গ'। অনন্তর দেশ বিশেষের রীতি অনুযায়ী পরিণামপ্রাপ্ত হয়ে লোকের চিত্তরঞ্জক রূপে তা দেশে দেশে গীত হওয়ায় তাকে বলা হয়েছে 'দেশী'।

এই উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে ভারতীয় সঙ্গীত মূলতঃ শিবরঞ্জনী।

শাস্ত্রমতে সকল চিত্ত রঞ্জিত করাই ভারতীয় রাগের উদ্দেশ্য। 'যস্য শ্রবণমাত্রেণ রঞ্জনে সকলাপ্রজাঃ'। কিন্তু সে রাগ শিবদ, মঙ্গলপ্রদ। 'সিদ্ধান্ত ভাস্কর-'এর একটি উক্তি জানায়—'রাগিণ্যশ্চাথ রাগাশ্চ শিবকণ্ঠে বসন্ত্যমী'। রাগরাগিণীর বাস শিবকণ্ঠে। প্রজাপতি ব্রহ্মা সংসারের মঙ্গলের জন্যেই সুরেশ্বর মহাদেবের কণ্ঠস্থিত গান আহরণ করেন।

মধুর কাতরতামাখা 'বুলবুলির গান'—এ ক্লান্ত যাত্রাওয়ালাদের নাকী-কান্না ভরা একঘেয়ে 'সামান্যসুরে' বিরক্ত 'বঙ্গদর্শন' (যাত্রা, কার্তিক—১২৮০) সঙ্গীতের সংজ্ঞাটি সুস্পষ্ট করে মহাদেবের মহাসুরের কথা প্রথম দেশবাসীকে স্মরণ করিয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে সুরেশ্বর মহাদেবের প্রকৃত স্থানটিও চিনিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'সুর এবং বাক্যে গীত। সুরে ভাব উদ্দীপন করে, বাক্য সংযোগে তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হয়।'

'বঙ্গদর্শনে'র অন্বিষ্ট প্রবল ভাবোদ্দীপক চিরায়ত মহাসুর। সে সুরের বর্ণনা—'মহাদেবের গীত গর্জিল।··· অনন্ত আকাশে মহাদেবের মহাসুর প্রধাবিত চিরকাল প্রধাবিত। সময় অনন্ত, আকাশ অনন্ত, সুর অনন্ত।'

কিন্তু কোথায় সেই সুরেশ্বরের বাস ?—'মহাদেবের স্থান কোথা ? প্রতিভাশালী ব্যক্তির অতলস্পর্শ অন্তরে তাঁহার একমাত্র স্থান।'

প্রতিভাশালী বঙ্কিম মহাভাবে উদ্দীপিত হয়েই গেয়েছেন তাঁর অতলস্পর্শী অন্তরাবগাহী 'মহাগীতি' (ব. র. ১ম, পৃ ৭৮৩) 'বন্দেমাতরম্'। এই সঙ্গীত নিভৃতির, একার ছোট ছোট সুখ দুঃখ শোকের ঢেউ খেলানো তাৎক্ষণিক আবেগের দোলন নয়। এ যে বড়ো শোক বড়ো দুঃখ বড়ো আনন্দে উদ্বেল অনন্ত মনের প্রবল এক ভাবোচ্ছ্বাস। এ গান পত্নী-কন্যাহারা মহেন্দ্রর ব্যক্তিগত বিরহের শোক, ক্ষতি ভুলিয়ে দিয়ে তাঁকে ষড়ৈশ্বর্যময়ী দেশজননীর বিরহ ও ভাবসম্মিলনের জগতে উত্তীর্ণ করেছিল। 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত ভবানন্দের প্রাণ ও কণ্ঠ বেয়ে প্রথমে মহেন্দ্রর ও পরে শত সহস্র সন্তানদের প্রাণে প্রাণে কণ্ঠে

কণ্ঠে সঞ্চারিত হয়ে সমগ্র দেশকাল প্লাবিত করেছিল। এ গান ক্ষুদ্রতা ভোলায়, আত্মসীমা ঘোচায়—তাই তা মঙ্গলপ্রদ, মুক্তিদায়ী। নির্বিশেষের আনন্দস্বরূপ তাই 'সর্বজন মনোরম' (ব. র. ১ম, পৃ. ৭৬৮)। বঙ্কিমের এই 'মহাগীতি' তো যথার্থই 'শিবরঞ্জনী'।

এই তিলোত্তমা গীতির প্রতি বঙ্কিমের যে তাই গভীর মমতা। তিনি জানতেন এ গানের মর্ম অনুধাবন করবার সময় তখনও আসেনি।

সম্ভবতঃ ১৮৭৫-এ বঙ্কিম কাহিনী নিরপেক্ষভাবে স্বয়ংসর্বস্ব এই গানটি প্রথম রচনা করেন। 'বঙ্গদর্শনে'র 'ম্যাটার' কম পড়ায় গানটি তিনি ঐ পত্রিকার প্রেস ম্যানেজারকে ছাপার জন্য দেন। কিন্তু ম্যানেজার রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তুষ্ট হননি। বঙ্কিমকে বলেন—'গান যাহাই হউক 'বন্দেমাতরম্' দ্বারা 'বঙ্গদর্শনে'র পেট ভরিবে না। একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন।'

বুঝি তাই রচিত হয় 'বন্দেমাতরম্' গানের যোগ্য প্রেক্ষিত 'আনন্দমঠ'। 'বঙ্গদর্শন' প্রেসের কার্যাধ্যক্ষ পণ্ডিতের কাছে ভবিষ্যদ্বাণী বঙ্কিমের—'এ গানের মর্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না, যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক, তখন দেখিবে, এ গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।'

'ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'। মন্ত্রের ফলিত সত্যরূপ যিনি দিব্যদৃষ্টি বলে দেখতে পান, তিনিই ঋষি। 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমের বাণীও সত্য হয়েছিল। এই মন্ত্র হুংকারেই একদিন 'যৌবন জলতরঙ্গ' সমস্ত বাঁধ ভেঙে উত্তাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশপ্রেমের বীর্যে অশংকিনী শত শত শান্তিরাও গৃহ সংসার সুখ ভাসিয়ে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর রণসঙ্গিনী হয়েছিলেন এই মন্ত্রবাণীতেই উজ্জীবিত হয়ে।

'মৃণালিনী'তে 'সাধের তরণী'র কাণ্ডারীর জন্য ব্যাকুল আশা বঙ্কিমের পূরণ হয়নি। তখন মেটেনি তাঁর 'জনমসাধ' স্বাধীনতার পিপাসা। জীবনের সেই 'সাধ' সেই তৃষ্ণার শান্তি 'আনন্দমঠে'। পরমপ্রাপ্তির আনন্দে উদ্বেল 'আনন্দমঠ'। শান্তি ও জীবানন্দের দ্বৈত কণ্ঠে সেই উদ্বেলিত আনন্দেরই রণন—

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে। হরে মুরারে।
জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী ভাস্‌ল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে। হরে মুরারে।

ভেঙে বালির বাঁধ, পূরাই মনের সাধ।
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে ?
হরে মুরারে ! হরে মুরারে !"   (ব. র. ১ম, পৃ. ৭৬০)

'আনন্দমঠে'র তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'ঘোরতর যুদ্ধে'র উদ্যোগ মুহূর্তে এই উদ্দীপনা জাগানো গান শোনা যায়।

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রথম শান্তি নবীনানন্দের বেশে দেশব্রতী সন্ন্যাসী স্বামীর সন্ধানে অভিসার যাত্রা শুরু করেন। কণ্ঠে ছিল তাঁর উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক 'অপূর্বগীত'।

"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।"
"সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর-তরঙ্গে,
তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে।
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে।"

২

"পায়ে ধরি প্রাণনাথ, আমা ছেড়ে যেও না।"
"ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা।
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাও রে।"

রঙ্গ ও রহস্যময়ী শান্তির এই গানে ছিল তাঁর নিজের ও তাঁর স্বামীর মনোভাবনার কথা। দেশের মুক্তি-সংগ্রামের জন্যই জীবানন্দ রমণী-ত্যাগী। কিন্তু দেশের জন্য এই ব্রতচারণ ও তাঁর রণসাধ তো অর্ধাঙ্গিনী বিনা নিষ্ফল। তাই পরিহাসের সুর এই গানে। পরে তৃতীয় খন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শান্তি তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুগলকণ্ঠে গান শোনান। তাঁদের উভয়েরই 'মনের সাধ' এখন পূর্ণ। আসন্ন শত্রুসমরে স্বামীর রণসঙ্গিনী হবেন শান্তি। যথার্থ সহধর্মিণী সংজ্ঞা সার্থক করবেন তিনি।

তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে, শান্তির কণ্ঠে শোনা যায় জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র। 'শান্তিদেবী কণ্ঠ নিঃসৃত' সেই 'গোস্বামী বিরচিত মধুর স্তোত্র'-গানে 'অনন্ত কাননের অনন্ত নীরবতা বিদীর্ণ'।

'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিম মদন-ধর্মোৎসবের কবি জয়দেবের প্রতি রূঢ়ভাষী হয়ে তাঁর

'স্মর-গরল' পদের বিকাররূপ দেখিয়েছিলেন। 'আনন্দমঠে' তিনি দিলেন 'হরি-স্মরণে সরসি মনঃ' জয়দেবের শুদ্ধ পরিচয়। যুগে যুগে নিপীড়িত বসুন্ধরার সমুদ্ধারকল্পে লোকস্থিতিপালক বিষ্ণু দশাবতার রূপ ধারণ করে ধরণীকে কৃতার্থ করেছিলেন। সেই কীর্তি স্মরণে জয়সূচক পদ দশাবতার স্তোত্র রচনা করে জয়দেব গোস্বামী 'গীত-গোবিন্দ' কাব্য সূচনা করেন। সন্তান-কণ্ঠে এই গান পরিবেশন করিয়ে বঙ্কিম প্রমাণ করেছেন জয়দেবের আত্মোদ্বোধন সামর্থ্য। 'প্রলয়-পয়োধি জলে' গেয়ে সন্তানেরা বীর্যোদ্দীপন শক্তি অর্জন করেন। এখানে তাঁরা বাংলার আদি কীর্তনকারের চরণে প্রণত হয়ে স্ব-কুশলার্থী। 'তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।' গী ১।২৪। কারণ তাঁরাও যে দুষ্ট বিনাশনের সংগ্রামে অবতীর্ণ বিষ্ণুর মতই।

দশাবতারের মাত্র তিন অবতার রূপ (১।৫।১৩।১৪) সন্তানের স্মরণীয়। মীন, বুদ্ধ ও কল্কিরূপ। কারণ, বঙ্কিম চান, সর্বপ্রথম বেদরূপী নিঃশ্রেয়স জ্ঞানের উদ্ধার, পরে, যুক্তি-বুদ্ধি ভূত দয়া ও পরহিত ব্রতরূপ চৈতন্যের উদ্ধার এবং শেষে দেশ আক্রমণকারী শত্রুর কালস্বরূপ বীর্যবত্তার উদ্ধার।

শান্তি দশাবতার স্তোত্র গেয়েছেন সারঙ্গ বাজিয়ে ; সম্পূর্ণ বাগ তাল লয় বজায় রেখে এবং মীড় মূর্ছনা গমক সঞ্চারিত করে। সে গান 'পূর্ণ জলোচ্ছ্বাসের সময়ে বসন্তানিল তাড়িত তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় মধুর'। সত্যানন্দের গম্ভীর কণ্ঠে যুক্ত হয়ে সে গানের তান 'গম্ভীর মেঘগর্জনবৎ'।

'সারঙ্গ' বাংলাদেশের ফকির, বাউল, বৈষ্ণবদের গীত-অনুষঙ্গী প্রাচীন বাজনা। ১২৭৯র বৈশাখের 'বঙ্গদর্শনে' 'সঙ্গীত' প্রবন্ধকার জানান যে, এই তারযন্ত্রটি মুসলমানদের প্রবর্তিত বাদ্যযন্ত্র। এবং 'সেতার, এসরার, সারঙ্গ ইত্যাদি সকল যন্ত্র নব্য'। কিন্তু রামদাস সেন ১২৮০র ফাল্গুন সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর 'ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র' প্রবন্ধে জানিয়েছেন— সারঙ্গ ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন তত জাতীয় তারের বাজনা 'স্বরমণ্ডলে'র নব্যরূপ।

বঙ্কিম অবশ্য জানতেন, সারঙ্গের ঐতিহ্যগত উৎস যাই হোক না কেন, ভারতে এ যন্ত্রের ব্যবহার প্রাচীন আমল থেকেই। দরবারী ও লোকসঙ্গীতের এটি অন্যতম অনুষঙ্গী বাজনা।

বাংলার আদি রাগাশ্রয়ী প্রবন্ধ সঙ্গীত জয়দেব-গীতি উনিশ শতকে ধ্রুপদাঙ্গে গাওয়া হত। শান্তির গায়নভঙ্গিতে ছিল তার ইঙ্গিত। বিশ শতকের গোড়ায়, ১৯২৮-এ কলকাতায় অশীতিপর বৃদ্ধা বাঈজী মঙ্গুবাঈ লালচাঁদ বড়ালের বাড়িতে বসে আড়াই ঘণ্টা ধরে ধ্রুপদাঙ্গে জয়দেবপদ গেয়েছিলেন।

গোয়ালিয়রের হস্দ খাঁ ও হস্সু খাঁর এই শিষ্যা প্রমাণ করেন উনিশ শতকে উত্তর-ভারতে 'জয়দেব' ধ্রুপদাঙ্গেই প্রচলিত ছিলেন।[৮২]

বাংলায় জয়দেবের 'আদি প্রবন্ধরূপ' হারিয়ে যায় রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝায়। নৃত্যগীত অভিনয়ে 'গীতগোবিন্দ' অনুষ্ঠানের ধারাটি বেঁচে থাকে দাক্ষিণাত্যে। ষোড়শ শতকের শেষপাদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রকীর্ণ কিছু অষ্টপদী বাংলার উচ্চাঙ্গ কীর্তনে প্রচলিত ছিল। 'ধীর সমীরে' (গী।৫।৯), 'বদসি যদি' (গী।১০।২), 'স্মর-গরল খন্ডনং' (গী।১০।৯) বাংলাদেশে জয়দেবের জনপ্রিয় গীতিপদ।

উনিশ শতকে ধ্রুপদাঙ্গে 'জয়দেবে'র পুনরুজ্জীবন সাধন করেন ধ্রুপদাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। তাঁর শিষ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫টি জয়দেবপদগীতির স্বরলিপি সম্বলিত—'গীতগোবিন্দের স্বরলিপি' প্রকাশ করেন।[৮৩] জয়দেব নির্দিষ্ট 'মালব'-রাগের পদ 'প্রলয়পয়োধি জলে'র স্বরলিপিগত সুর—'ঢিমে তেতালা'র ভৈরবী। প্রাচীন 'দেশবড়ারী' রাগে গেয়—স্মর-গরল খন্ডনং' পদটির সুর স্বরলিপিতে—'সারঙ্গ'। প্রাচীন গুর্জরী রাগে নির্দিষ্ট 'ধীর সমীরে যমুনা তীরে' পদের সুর 'বিহঙ্গড়া-আড়া'। 'ধীর সমীরে' গান বঙ্কিমের বিশেষ প্রিয় ছিল। সংকেত-গীত হিসেবে বারে বারে এটি ব্যবহার করেছেন 'আনন্দমঠে'। 'গীতগোবিন্দে'র পদলালিত্য ও ধ্বনি ঝংকার তাঁকেও টানত। রবীন্দ্রনাথকে যেমন টানত 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্'।

'আনন্দমঠে'র পটভূমি সৃষ্টির আদিতে ছিল বীরভূম। অজয়-তীরের জয়দেব-কেঁদুলী, মানকর, ইলামবাজার অঞ্চল জুড়ে সন্তানদের আস্তানা। সম্ভবতঃ কেঁদুলীর জয়দেব-মেলারই প্রক্ষেপ আনন্দমঠে মাঘী পূর্ণিমার বৈষ্ণব মেলায় (পৃ. ৭৮০)। প্রশ্ন জাগে, সহজিয়া ফকির, বাউল, বৈষ্ণবদের পীঠস্থান কেঁদুলীর মেলায় সমবেত সর্বকেশরক্ষাকারী গৈরিক বসনধারী বাউল বৈষ্ণব সম্প্রদায় কি বীরভূমের ভ্রাম্যমাণ ডেপুটি বঙ্কিমের কল্পনাপ্রবণ মনে দেশপ্রেমে ঘরছাড়া বাতুল এক বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়? নইলে, উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ বীরভূমের প্রেক্ষাপটে কল্পনা রঞ্জিত হল কেন? এই সহজিয়া বৈষ্ণব অধ্যুষিত গেরীমাটির দেশে আদি বৈষ্ণব জয়দেবকে সঙ্গীত গুরু হিসেবে বরণ করে হরিস্মরণে ব্রতী সন্তানদল কাহিনীর স্থানমানই রক্ষা করেছেন।

এ উপন্যাসের চতুর্থ খন্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, শান্তি তাঁর নবীনানন্দ বেশ ছেড়ে মোহিনী বৈষ্ণবীর রূপসজ্জা নিয়ে ইংরেজ শিবিরে দর্শন দিলেন। তাঁকে দেখে 'ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুযুক্ত সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ

টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্যামাবিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয় ফরমাস করিয়া শুনিল।"

(ব. র. ১ম, পৃ. ৭৮১)

এখানেও বঙ্কিম বৈষ্ণবী ভিখারিণীর ছদ্মবেশে সাজিয়ে শান্তিকে অনায়াসে শত্রুশিবিরের ভেতরে নিয়ে গেছেন। শান্তির ঘোড়া চুরির অভিসন্ধি সহজেই পূরণ করেছেন। সেই সঙ্গে আবার সমকালীন জনপ্রিয় গানের ধারার তালিকা পেশ করেছেন। তাঁর নবসুরের নতুন ধারার গান স্বদেশসঙ্গীত ও বীর্যোদ্দীপক গানের বিপরীতে তৎকালীন সাংগীতিক প্রেক্ষিতটি স্মরণ করানোই বঙ্কিমের উদ্দেশ্য।

'বীণে কত কি বাজিতেছিল'—

দেবী চৌধুরাণী।

'আনন্দমঠ'-এর গীতোত্তেজনার পরে 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' বঙ্কিম আশ্চর্য সঙ্গীত-কৃপণ।

'দেবী চৌধুরাণী'-তে (১৮৮৪) তিনি সম্পূর্ণই গীতমৌন। শুধু সুরে বাজে বীণা ও বেণু।

যুগোপযোগী গীতানুষঙ্গী যন্ত্রের উল্লেখে বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ' থেকে মনোযোগী। কীর্তনের সঙ্গী—মৃদঙ্গ খঞ্জনী ও রাগাশ্রিত বাংলা গানের সঙ্গী বেহালার ব্যবহার এবং 'বাগানবাড়ি'র গানের সঙ্গত-বাজনা তানপুরা, তবলা, সেতারের প্রদর্শনী (পৃঃ ২৭৭) সেখানে দেখা যায়। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রয়েছে 'যাবনী-মিশাল' কালোয়াতী গানের অপরিহার্য সঙ্গী তবলা তানপুরার সঙ্গত। 'রাজসিংহে'র মোগলাই গানে বাজে সারঙ্গ ও বীণ। 'আনন্দমঠে' বৈষ্ণবী-শান্তি বাজায় সারঙ্গ ও খঞ্জনী।

বিলিতি বাজনার চাহিদাও যে এদেশী অভিজাত মহলে ধীরে ধীরে জাগছে, তার নজির 'চন্দ্রশেখরে' দলনীর বাহানায়—'ইংরেজেরা যে বাজনা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন (পৃঃ ৪০৩)। সম্ভবত বাজনাটি অর্গ্যান অথবা পিয়ানো। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে'র 'সঙ্গীত' প্রবন্ধের (১২৭৯, জ্যৈষ্ঠ) একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—'আমাদের বাদ্যের মধ্যে কোন যন্ত্রের সুরই ইউরোপীয় যন্ত্রের শব্দের সমকক্ষ নহে। এ জন্য এ দেশীয় হার্মোনিয়ম্ প্রস্তুত করা আবশ্যক।'

এই অভিমত সম্ভবত জগদীশনাথ রায়ের। তবে বঙ্কিম নিজেও 'হার্মোনিয়মে' সিদ্ধহস্ত ছিলেন।[৮৪] নিজের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরকে হার্মোনিয়মে সুর তুলে তিনি গান শেখাতেন। গানের সুর তাললয় বজায় রাখার জন্যে এই যন্ত্রানুষঙ্গের প্রয়োজনীয়তা নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই তাঁর জানা ছিল। হার্মোনিয়মে সুর বাঁধার হাঙ্গামা নেই বলে যন্ত্রটি তাঁর প্রিয় ছিল।

বঙ্কিম তাঁর সাহিত্যে যুগ প্রচলিত যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখই করেছেন। আর এইভাবেই সাজিয়েছেন 'বাদ্যযন্ত্রের প্রদর্শনশালা'।

'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিম সম্পূর্ণ প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত ঐতিহ্যের অভিমুখী। এখানে তিনি জানাতে চান এদেশী ধ্রুপদী সুরযন্ত্রের শব্দসামর্থ্য। অতি প্রাচীন গীতানুষঙ্গী যন্ত্র হিসেবে বীণার উল্লেখ ছিল 'আনন্দমঠে' নারদের গানে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে বীণা শুধু একক সুরযন্ত্র। বীণার সুরই এখানে দেবী চৌধুরাণীর বিশেষ অন্তরভাষা।

সুসামঞ্জস্যে অনুশীলিত, সর্বৈশ্বর্যময়ী জ্ঞানের প্রতীক দেবী চৌধুরাণী 'মূর্তিমতী সরস্বতী'। বীণা তাঁর চিত্তরঞ্জিনী। ব্রাহ্মগীতিকায় বলা আছে— 'বাণীবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ মোক্ষমার্গং নিধচ্ছতি'।[৮৫] বীণাবাদন ও উপাসনার সহায়। বঙ্কিম তাঁর পূর্ণ মানবী দেবীরাণীকে গীতপারঙ্গমার পরিবর্তে বীণাযন্ত্রনিপুণা করেছেন।

কামশাস্ত্রে কলাবতী নায়িকাদের গীতবাদ্যসিদ্ধি প্রসঙ্গে বাদ্যশিক্ষা বিষয়ে 'তত' ও 'সুষির' জাতীয় বীণা ও বেণু যন্ত্রের[৮৬] কথা বলা আছে। 'তত' তন্ত্রীযুক্ত বাজনা, 'সুষির' যা ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয়। দেবী চৌধুরাণীর বীণাশিক্ষার গুরু নিশি 'সুষির' বাদ্যেও পটু। রঙ্গরাজকে সঙ্কেত বার্তা পাঠাবার প্রয়োজনে দেখা যায়—'নিশি বাঁশিতে ফুঁ দিয়া মল্লারের তান মারিল।' (পৃঃ ৮৫১)।

রাজবাড়ির আশ্রয়ে থাকাকালে নিশির এই গান বাজনার শিক্ষা। ভবানী পাঠকের ডাকাতে আস্তানায় নিশিকে দিয়েই বঙ্কিম তাই দেবীর নাড়া বেঁধেছেন।

'দেবী চৌধুরাণী'র ২য় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে—বীণাবাদিনী দেবী চৌধুরাণীর ছবি এঁকেছেন বঙ্কিম।

> ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণাবাদনে নিযুক্তা।…ঝম্ ঝম্ ছন্ ছন্ ঝনন্ ঝনন্ ছনন্ ছনন্ দম্ দম্ দ্রিম দ্রিম বলিয়া বীণে কত কি বাজিতেছিল…। বীণা কখন কাঁদে, কখন রাগিয়া উঠে, কখন নাচে, কখন আদর করে কখন

গর্জিয়া উঠে—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ সিন্ধু কত মিঠে রাগিণী বাজিল—কেদার, হাম্বার, বেহাগ, কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল। কানাড়া, সাহানা, বাগীশ্বরী—কত জাঁকাল রাগিণী বাজিল—নাদ, কুসুমের মালার মত নদী কল্লোল-স্রোতে ভাসিয়া গেল। তারপর দুই একটা পরদা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া সে বিদ্যাবতী ঝন্ ঝন্ করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কানের পিপুল পাত দুলিয়া উঠিল—মাথায় সাপের মত চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল—বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল।

রানীর বীণা বাদনের এই ছবি এঁকে বঙ্কিম পাঠককে নিয়ে গেছেন তারযন্ত্র-শিল্পীর সুর সৃষ্টির জগতে। ঝম্ ঝম্ ছন্ ছন্ ঝনন্ ঝনন্ ছনন্ ছনন্ দম দম দ্রিম দ্রিম ধন্যাত্মক শব্দের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়েছেন বিশেষ তারযন্ত্রের বাজের ধরন। অনুপুঙ্খ বর্ণনায় ফুটিয়েছেন সৃষ্টির আবেগে আবিষ্ট অথবা উত্তেজিত সুরনিমগ্ন শিল্পীর আনন্দ। রাগরাগিণীর বৈচিত্র্যে বুঝিয়েছেন দেবীর অন্তরের চলন রহস্য।

ছবি আর সুরের নিবিড় আশ্লেষে উপন্যাসকে চলচ্চিত্রধর্মী করে তোলা বঙ্কিমের এক অনুপম কলাকৌশল। মূর্ত বিষয়কে (concrete) অনুপুঙ্খ বর্ণনায় দৃশ্যায়িত করেন, আর বিমূর্ত (abstract) ভাব বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে অলঙ্কৃত বিশেষণে।

'নাদ কুসুমমালার মতো নদীকল্লোল স্রোতে ভাসিয়া গেল'—দক্ষশিল্পী দেবী রাণীর প্রতিটি স্বরাঘাতজনিত সুরধ্বনি ফুলের মতো শিল্প-সুষমায় সার্থক হয়ে ফুটে উঠছে। 'বীণা কখন কাঁদে কখন রাগিয়া উঠে'—ইত্যাদি সুরানুভূতির সাহায্যে বঙ্কিম স্পষ্ট করেছেন রাগরাগিণী ব্যঞ্জিত করুণ রুদ্র শৃঙ্গার, বীর ও হাস্যরস। সেই সঙ্গে শ্রুতিগ্রাহ্য তারযন্ত্রের সুরের আলাপ, মীড়, মোচড় ও ঝালার সূক্ষ্ম কারুকাজ।

অপরূপ দৃশ্যশ্রাব্য পদ্ধতিতে (Audio-visual) আঁকা বঙ্কিমের এই বীণা-বাদিনী দেবী চৌধুরাণীর ছবি। অতি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে এই বীণাবাদনের বিশদ বিবরণের প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিম এই অধ্যায়ে স্পষ্ট করেননি। পরবর্তী দৃশ্য পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই পরিস্ফুট হবে এই বাদন-দৃশ্যটির সংযোজনের অর্থ। ফিল্মে 'মন্তাজে'র[৮৭] সার্থক প্রবর্তক যদি হন আইজেনস্টাইন, তবে বাংলা কথা-চিত্রে এই শৈলীর প্রবক্তা অবশ্যই বঙ্কিম।

চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তাঁর বিষয় চলচ্চিত্র গ্রন্থে লিখেছেন—'লেখকের

হাতে যেমন কথা চলচ্চিত্র রচয়িতার হাতে তেমনি ছবি (image) ও শব্দ (ধ্বনি)।' (পৃঃ ১১)[৮৮] মানুষের অন্তরের ভাব কথার আশ্রয় না নিয়ে কী ভাবে ছবিতে প্রকাশ করা যায় চলচ্চিত্রকার তারও ভাষা খোঁজেন ক্যামেরার মাধ্যমে। তিনি বলেন, 'তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার সঙ্গে গভীর অনুভূতির সংমিশ্রণের ফলে চলচ্চিত্রকার মানুষের মনের দরজাটি ক্যামেরার সামনে খুলে দিতে পারেন।' চরিত্রের ক্লোজ-আপ-এ তার আকৃতি, অঙ্গভঙ্গী বেশভূষা ও মুখের ভাবব্যঞ্জনা খুঁটিয়ে প্রকাশ করে এবং যথাযথ আবহসুর সৃষ্টি করে চলচ্চিত্রকার অন্তরভাষা প্রকাশের এই দুরূহ কাজটি সমাধা করেন। অর্থাৎ 'ইমেজ' ও 'ধ্বনি' দিয়েই তৈরী হয় সেই ভাষা। কুশলী ছবি রচয়িতা বঙ্কিমের গড়া 'ইমেজ' ও 'ধ্বনি'র সমবায়েই প্রকাশিত দেবী চৌধুরাণীর গভীর গোপন মনের ভাষা।

দশ বছরের যুগান্তরে দেবীচৌধুরাণীতে রূপান্তরিত প্রফুল্লকে বঙ্কিম দ্বিতীয় খন্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রথম উপস্থাপিত করেছেন পূর্ণ দেবীরাণীর বেশে। ভবানী পাঠকের শিক্ষায় ও নির্দেশে তিনি এখন রূপে গুণে ধনে মানে ষড়ৈশ্বর্যময়ী। কিন্তু বঙ্কিম দেখাবেন, তাঁর প্রেম-বুভুক্ষু 'প্রফুল্ল' সত্তা এত অনুশীলনেও এতদিনেও মরেনি। নদীবক্ষে বজরায় বসে নিশি ও সাগরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মেতে এই মুহূর্তে তিনি প্রতীক্ষা করছেন তাঁর স্বামী ব্রজেশ্বরেরই জন্যে। দীর্ঘ দশ বছর পরে আজ অনতিবিলম্বেই তিনি স্বামীর মুখোমুখি হবেন। অধীর উত্তেজনায় ভরা তাঁর অন্তরের চলনরহস্য ক্লোজ-আপ শটে ও নানা রাগরাগিণী বিস্তারে বঙ্কিম ফুটিয়ে তুলেছেন। বীণাবাদন যেন এই নারীর এক ছল। স্নায়ু টান-টান উত্তেজনা লুকিয়ে রাখার অথবা মুক্তি দেবার। রাগবৈচিত্র্যে বিলসিত তাঁর অন্তরের উত্তরঙ্গ ভাবনা। যন্ত্র সুরেই মগ্ন প্রফুল্ল উজাড় করেছেন তাঁর স্বামী-পরিত্যক্ত জীবনের দুঃখ, ক্রোধ, পুনর্মিলনের আশার আনন্দ, অভি-মানের তর্জন আবার প্রতিশোধ নেবার রঙ্গরহস্যের কৌতুক। বীণাবাদনরতা দেবীরাণী আসলে উৎকণ্ঠিতা নায়িকা। তাঁর উৎসুক দৃষ্টি প্রতীক্ষা করছে নদীবাঁকের মুখে একটি বজরা বিন্দুর। সেই বিন্দু দৃষ্টিভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় আঘাতে বেজে উঠেছে নটরাগিণী। যেন চূড়ান্ত আবেগে ফুঁসে উঠেছে তাঁর উত্তেজিত হৃদয়।

আবার এই রাগিণীই সংকেত-ধ্বনি। জরুরী এই সংকেত-সুরের আহ্বানে হাজির হয়েছিল আজ্ঞাবহ রঙ্গরাজ। সেইসঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছিল উৎকণ্ঠা জাগানো আবহ। পাঠকও আগ্রহী আসন্ন নাটকীয় পরিস্থিতির প্রতীক্ষায়।

সত্যজিৎ রায়ের মতো যোগ্য পরিচালক নিশ্চয়ই মানেন যে, বঙ্কিম-উপন্যাসের

চলচ্চিত্রায়নে দৃশ্যসজ্জা ও সঙ্গীত রচনার সমস্যা আর ঝক্কি বঙ্কিম স্বয়ং মিটিয়েছেন। নাটকে ও সিনেমায় সঙ্গীতের যতরকম ব্যবহার দেখা যায় বঙ্কিমের শিল্পাঙ্গিকে যেন তার সফল প্রয়োগ। সঙ্গীতের যোগ্য নির্বাচনে তিনি সবসময় ফুটিয়ে তোলেন প্রার্থিত আবহ অথবা রস। ঘনিয়ে তোলেন কখনো নাটকীয়তা কখনো শুধুই গীতলতা।

বীণার রাগতরঙ্গের অভিঘাতে বঙ্কিম জানিয়েছিলেন, তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী'র অন্তরের অন্তঃপুরে প্রেম-কাঙালিনী প্রফুল্লর চিরবসত, স্বামীর জন্যে এখনও তাঁর চিত্ত চঞ্চল। ভবানী পাঠকের নির্দিষ্ট যোগাভ্যাস ও অনুশীলনতত্ত্বের উপদেশে 'দেবী চৌধুরাণী'র জমকালো খোলশ তৈরী হয়েছে মাত্র। তাই সাজ খসিয়ে যোগিনী বেশ ধারণ করতে দেবীরাণীর বিন্দুমাত্র দেরিও হয়নি, অনায়াসেই সম্ভব হয়েছে সেই দেবী-সাজখসা প্রফুল্লর ব্রজেশ্বরের ঘরগেরস্থালির জগতে ফিরে যাওয়া। এই খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদেই দেখা যায় তৃতীয় পরিচ্ছেদের রত্নমণ্ডিতা বিদ্যাবতী রমণী একটি চটের মতো গড়া ও একগাছা কড় পরিধান করে ভবানী পাঠককে আকুল স্বরে অনুনয় জানাচ্ছেন 'আমাকে অব্যাহতি দিন, আমার এ রাণীগিরিতে আর চিত্ত নাই।'

সহস্র ঐশ্বর্য ও পদমর্যাদার মধ্যেও রমণীর প্রেমহীন জীবনের অন্তলীন নিঃসঙ্গতার, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, বঞ্চনা-বেদনায় বিক্ষুব্ধ মনের চঞ্চলতার খবরটুকু দেওয়া বঙ্কিমের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনেই দেবী চৌধুরাণী বীণাবাদিনী।

এখানে বাণী-নির্ভর কোনো সঙ্গীতে দেবী চৌধুরাণীর আত্মসম্বৃত অভি-জনতার হানি হত, তাঁর চরিত্রের ভার লঘু হয়ে যেত। অথবা বঙ্কিম তাঁর বঙ্গদর্শন-এর 'যাত্রা' প্রবন্ধভুক্ত (১২৮০, কার্তিক) একটি অভিমতকেই বুঝি অবশেষে সত্যমূল্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন—

> মনের অনেক প্রকার যন্ত্রণা বাক্যে প্রকাশ হয় না। তাহা কেবল সুরে প্রকাশ হয়। দুঃখ যত গভীর ততই বাক্যের অতীত। ব্যথিত অন্তঃকরণ মধ্যে কিরূপ তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়, বাক্যে তাহা দেখিতে পায় না ; দেখিতে পাইলেও তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, বাক্য অন্ধ, বাক্য অসম্পূর্ণ।

তাই যন্ত্রসুরেই দেবীর অন্তরভাষা স্বতঃপ্রকাশ, বাঙ্ময়।

ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশে বীণা ও সেতার ছিল বিশেষ প্রচলিত তারযন্ত্র। লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র, মৌলা বখ্স্, হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীণকার হিসেবে প্রসিদ্ধি ছিল। শৌরীন্দ্রমোহন ও তাঁর গুরু ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী লক্ষ্মীপ্রসাদের

কাছে বীণার তালিম নেন।

জানা যায়, ১৮৭৪-এ কলকাতায় নর্মাল বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে মৌলা বখ্স্-এর বীণাবাদন বিচারপতি জন বার্ডফিয়ার সাহেবকে বিশেষ অভিভূত করেছিল। উৎসাহিত মৌলা বখ্স্ ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে আবেদন জানিয়ে লেখেন—

আমাদের সঙ্গীতের এক্ষণকার অবস্থা অতি শোচনীয়, কিন্তু শাস্ত্র পূর্বমতো আছে। আপনারা মনোযোগ করিলেই আমাদের সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়।[৮৯]

বঙ্কিম অনুভব করেছিলেন, বিদেশী রাজপুরুষদের থেকেও স্বদেশবাসীদেরই নিজস্ব সঙ্গীতঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া বেশি জরুরী। 'দেবী চৌধুরাণী'তে তাই তিনি বিশেষভাবে এই দেশের প্রাচীন সুরযন্ত্র সম্পর্কে মনোযোগী।

সঙ্গীত-গবেষক দিলীপ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সঙ্গীতের আসরে' গ্রন্থে (পৃঃ ৪৪) জানিয়েছেন, বঙ্কিম সেতারের বাদনপদ্ধতি তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী'র বীণায় প্রয়োগ করেছেন। কারণ, বঙ্কিম লিখেছেন, দেবী যন্ত্রের 'পরদা উঠাইয়া নামাইয়া' বাজাচ্ছিলেন। কিন্তু বীণা অচল ঠাটের বাজনা। তার পরদা ওঠানো নামানো যায় না। সম্ভবত ভুলবশত বঙ্কিম বীণার সঙ্গে সেতারের বাজ মিশিয়ে ফেলেছেন। তাঁর আমলে বীণা ও সেতারের সমানই প্রাধান্য। প্রকৃতপক্ষে বীণার থেকেও সেতারের জনপ্রিয়তা তখন বেশি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আত্মকথনও জানায়, 'সে সময়ে সেতারের খুব রেওয়াজ ছিল। শৌখিন যুবকেরা প্রায়ই তখন ঐ যন্ত্রই শিক্ষা করিত।'[৯০]

বঙ্কিম নিজেও দেবেন্দ্র ও গোবিন্দলালের সেতার প্রীতির উদাহরণ দিয়েছেন। সাজ্জাদ হুসেন, কাশেম আলি, যদুনাথ ভট্ট ও তাঁর পিতা মধুযন্ত্রীর সেতারী হিসেবে সেকালে খ্যাতি ছিল। শৌরীন্দ্রমোহন এবং ক্ষেত্রমোহনও ভাল সেতার বাজাতেন।

কিন্তু বঙ্কিম বীণা ও সেতারের বাজ বৈশিষ্ট্য না বুঝে অসতর্কতায় বীণার পরদা সচল করেছেন, এই অভিযোগ বোধহয় ঠিক নয়। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আধুনিক বাজনা সেতারকেই 'বীণা' সংজ্ঞা দিয়েছেন। ১৮৭৫-এ প্রকাশিত 'যন্ত্রকোষ' গ্রন্থে শৌরীন্দ্রমোহনের লেখায় পেয়েছেন যুক্তি।

'শাস্ত্রকারেরা কচ্ছপী বীণাকেই বাগদেবী সরস্বতীর হাতের যন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।...পারশীকেরা ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে (তাহা) লইয়া গিয়া

'সেতার' নাম প্রদান করেন।' দেবী চৌধুরাণীর 'সরস্বতী' বিশেষণের সঙ্গে 'বীণা' শব্দের যোগসাধন করে আসলে বঙ্কিম তাঁর আমলের জনপ্রিয় সুরযন্ত্র পারশী সেতারেরই ভারতীয় উৎসে ফিরে গেছেন।

সেকালের সঙ্গীত আন্দোলন সাংস্কৃতিক নবজাগরণের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য বঙ্কিম ছিলেন তার অন্যতম শরিক।

বীণা বা মুরলীধরা দেবী ও নিশি শুধুই বঙ্কিমের স্বপ্নসম্ভবা। যেন নেমে এসেছেন তাঁরা 'কাদম্বরী'র হেমকূটের ধূপদীলোক থেকে। সে যুগে এঁরা নন আদৌ সহজ দৃষ্টান্ত। অথচ বঙ্কিম 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকেই নানা ছলে কলাবতী ভারতীয় নারীর ঐতিহ্যগত ছবির প্রক্ষেপ ঘটিয়েছেন।

কুলবতী নারীর গীতোচ্ছ্বাস সে যুগে ছিল 'পাপ'। সমাজের কাছে তা ছিল ভ্রষ্টা নারীর লক্ষণ। 'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিম জানিয়েছেন সেকথা। শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোক বঞ্চিত অন্তঃপুরের গতানুগতিকতায় বদ্ধ বন্দিনী বামাদের জীবন ও ছবি 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা'য় তিনি এঁকেছিলেন। বড় ক্ষোভেই বলে-ছিলেন—'মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পারিপাট্য কি বুঝিবে?' (বিষবৃক্ষ)

তিনি জানতেন পর্দানশিনাদের এই মূঢ়তার দায় কার। তাই তো 'সাম্য' প্রবন্ধে সে যুগের পক্ষে তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য—

> এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী। পুরুষকে বিদ্যাশিক্ষা অবশ্য করিতে হয় কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিত থাকে। কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য গণিত বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না।
>
> (ব. র ২য়., পৃঃ ৪০০)

'সঙ্গীত' প্রবন্ধে তথাকথিত শিক্ষিত বঙ্গসমাজের প্রতি কঠোরভাষী হয়ে লিখলেন বঙ্কিম—

> বাঙালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীতশিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীত নিপুণা হইলে, গৃহ মধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের মদ্যাসক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অপনীত হইতে পারে। এতদ্দেশে নির্মল আনন্দের অভাবই অনেকের মদ্যাসক্তির কারণ। সঙ্গীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকের বারস্ত্রীবশ্যতা জন্মে। (ব. র. ২য়., পৃঃ ২৮৭)

'সঙ্গীত' প্রবন্ধ লেখেন বঙ্কিম ১৮৭২ সালে। এই বছরেই জন্ম নেন স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ ঘোষালের কন্যা সরলা ঘোষাল।[৯১] ইনিই একদিন বঙ্কিমের মুক্তবিহঙ্গিনী দেবী চৌধুরাণীর স্বপ্ন সফল করেছিলেন। হয়েছিলেন বঙ্কিমের

হৃদয়নন্দিনী। ঠাকুরবাড়ির দৌহিত্রী সরলাদেবী দাক্ষিণাত্যে গিয়ে সংস্কৃতানুশীলন করেছেন, বীণাবাদন শিখেছেন। আর সঙ্গীতে তো ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধা।

১৮৮২-তে যখন বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' প্রকাশ পায় ঠিক সেই মুহূর্তে সরলা দেবীর মতো পূর্ণ বিকশিত নারীর উদাহরণ বঙ্কিমের সামনে নেই। তবে স্বর্ণকুমারীর মতো সেতারবাদিনী ও সংস্কৃতিসম্পন্না ঠাকুরবাড়ির কন্যা ও বধূদের নানা দৃষ্টান্ত অবশ্যই রয়েছে। মাঘোৎসবের প্রাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিঃশব্দ উপস্থিতিই জানায়, মহিলাদের সঙ্গীতচর্চার সেই বিরল দৃষ্টান্ত তাঁর মনে আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভরসা জাগাচ্ছে।

তবে মনে রাখতে হবে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বধূ ও কন্যারা নারী জাগরণের পুরোধা হলেও উনিশ শতকের অ-ব্রাহ্ম মহিলা সমাজের প্রতিভূ ছিলেন না মোটেই। বৃহৎ হিন্দু সমাজের অসূর্যম্পশ্যা কুলরমণীরা তখন 'রাসসুন্দরী'র[১২] আত্মকথার মধ্যেই লুকিয়ে ছিলেন।

এই প্রেক্ষিতে করুণাময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়[১৩] এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন মেদিনীপুর চন্দ্রকোণার প্রখ্যাত ধ্রুপদীয়া রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী। বর্ধমানের মহারাজা মহাতপচাঁদের দরবারে ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আশ্রয়ে বহুদিন কাটিয়েছেন রমাপতি। সঙ্গীতজ্ঞ স্বামীর সুযোগ্যা সহধর্মিণী করুণাময়ী গান গাইতেন, পদ বাঁধতেন, সেতার ও পাখোয়াজ বাজাতেন, স্বামীর গানে পাখোয়াজ সঙ্গত করতেন। বিদ্যানুরাগ ও অসামান্য মেধা-স্মৃতির জন্যে তাঁর গুরুতুল্য শাস্ত্রজ্ঞ মাতুলের কাছ থেকে পান 'সরস্বতী' উপাধি। অথচ আদর্শ গৃহিণী তিনি। যেন 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ'—ছিলেন একাধারে। ১৮৯০-এ জীবনাবসান প্রাপ্ত এই বিদগ্ধা নারীর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সেকালে ভদ্র সংরক্ষণশীল বঙ্গহিন্দু সমাজে ছিল না।

'দেবী চৌধুরাণী' বা 'শান্তি'কে কেন্দ্র করে কালিদাসের কালের অথবা বৈদিক যুগের নারীর যে স্বপ্ন দেখতেন বঙ্কিম, আলোকিত নারী করুণাময়ী বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতীর জীবনে তিনি কি খুঁজে পেয়েছিলেন সে স্বপ্ন সফলের আশ্বাস?

'সর্বজনমনোমুগ্ধকারী সেই জয়গীতি'—

সীতারাম।

বঙ্কিমের সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম' (১৮৮৭)। এখানে বাণীনির্ভর সঙ্গীত অথবা যন্ত্রবদ্ধ সুর রচনায় বঙ্কিম আর নিমগ্ন নন। শুধু কাহিনীর উপসংহার মুখে শোনা যায় গম্ভীর স্তবমন্ত্র ও জয়োচ্চারী নামগান। যেন আর কোনো গীতলতায় তরল হয়ে যাবে এ উপন্যাসের তত্ত্বঘন আবহ।

সীতারামের 'বিপর্যস্ত' চিত্তকে স্বস্থ করার জন্যে, সমস্ত হীনতা, ভয়, বিভ্রান্তি থেকে ত্রাণ করবার জন্যে একমাত্র ভক্তি-আকুল প্রার্থনাই নির্দিষ্ট করেছেন বঙ্কিম। তাই দেখা যায়, দ্বন্দ্বদীর্ণ জীবনক্লান্ত সীতারাম যখন চারিদিকে ঘনায়-মান সঙ্কটে বিপন্ন তখন শ্রী ও জয়ন্তীর 'গগনবিহারী গগনবিদারী কলবিহঙ্গ-নিন্দী কণ্ঠে' ধ্বনিত ঈশ্বর বন্দনায় তিনি বিপদ ভুলেছেন, নবজীবনের আশ্বাস ও আনন্দ পেয়েছেন। তাঁর চিত্ত মালিন্যমুক্তিতে হয়েছে 'বিশুদ্ধ'। তিনি ফিরে পেয়েছেন আত্মশক্তি ও সংগ্রামের উদ্দীপনা।

জীবনের অন্তিমে ভাগ্যবিধাতার কৃপায় আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবার জন্যে এবং প্রকৃত 'চিত্তবিশ্রামে'র একমাত্র আনন্দধামটি খুঁজে নিতে পারার জন্যে সীতারাম অবশেষে 'অনাথের নাথ' 'অগতির গতি' 'পুণ্যময়ের আশ্রয়' ঈশ্বরের কাছে প্রণত। জয়ন্তী ও শ্রীর 'সপ্তসুরসংবাদিনী অতুলিত কণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি' 'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ… নমোস্তুতে সর্বত এব সর্ব'—আসলে সীতারামেরই ভক্তিবিহ্বল অন্তরের প্রার্থনা ও প্রণাম মন্ত্র।

এই তৃতীয় খণ্ডের ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদে, ভয়ঙ্কর রণমুহূর্তে আবার শোনা যায় শ্রী ও জয়ন্তীর কণ্ঠে দ্বৈতগান

জয় শিবশঙ্কর ! ত্রিপুর নিধন কর !
রণে ভয়ঙ্কর জয় জয় রে !
চক্র গদাধর ! কৃষ্ণ পীতাম্বর !
জয় জয় হরিহর জয় জয় রে !

রণোৎসাহ ও জয়আশা সঞ্চারী এই হরিহর স্তোত্র যেন রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের ভৈরবমন্ত্র গানের মতো আবহ ঘনিয়ে তোলে।

সীতারামের মনে এই গানই জাগায় আত্মোৎসর্জনের প্রলয়ঙ্কর আকাঙ্ক্ষা। রণোন্মাদনায় ধাবিত তাঁর দেহে এই উদ্দীপক মন্ত্রসুরই সঞ্চারিত করে দুর্বার গতিবেগ।

'সীতারামে' বঙ্কিমের প্রতীতি—দেশের জন্যেই রণযজ্ঞে আত্মাহুতি, প্রবৃত্তিতাড়িত, আত্মসুখান্বেষী মানুষের পক্ষে একমাত্র শুভঙ্কর ও শান্তিময় পরিণতি। 'শিবশঙ্কর'—যিনি জীবের ত্রিতাপ দুঃখ হরণ করে চিত্তে শমতা আনেন ও মঙ্গলসাধন করেন এবং 'কৃষ্ণ পীতাম্বর'—যিনি বাসনা হরণ করে বৃহত্তর ও ত্যাগোজ্জ্বল প্রেমে জীবকে নিয়ত আকর্ষণ করেন সেই 'হর' ও 'হরি'রূপী ঈশ্বরের স্মরণ মননের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম এ গানে ত্যাগ মঙ্গল প্রশান্ত জীবনেরই জয়ধ্বনি করেছেন। তাছাড়া, 'বিষ্ণুপুরাণ'-মতে (৭১৩) হরিহর পূজা করলে সর্বকামনা সিদ্ধ হয়—('সর্বকামমবাপ্নুয়াৎ')। 'সীতারামে'র এবং সেইসঙ্গে বঙ্কিমের সমগ্র উপন্যাসমালার সমাপ্তি সঙ্গীত তাই সর্বাভীষ্ট সাধক সর্বজনমনোমুগ্ধকারী সেই জয়গীতি—

'জয় শিবশঙ্কর জয় জয় হরিহর জয় জয় রে'!

সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারামে' পৌঁছে, ঈশ্বরের জয়ধ্বনি করেই বঙ্কিম তাঁর 'এ জীবন' নাটকের পালা সাঙ্গ করলেন। কত প্রশ্ন কত সংশয় কত বিরোধে জটিল দীর্ঘ সময়পথ বেয়ে জীবন সন্ধানের শেষে বঙ্কিম নিজেই বুঝি সীতারামের বেশে শ্রী ও জয়ন্তীর সামিল হয়ে অ-দৃষ্ট ভাগ্যবিধাতা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে হলেন নতজানু। তাঁদেরই সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইলেন আত্মোৎসারিত গান—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ—
স্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম।
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করতে করতে, পুরুষকার ও অ-দৃষ্টের দ্বন্দ্বে দীর্ণ, ক্লান্ত হতে হতে জীবনমরণের সীমানায় পৌঁছিয়ে কারণবাদী মানুষই তো হয় অ-দৃষ্টবাদী। সংসার-দগ্ধ বিপন্ন ভাগ্যহত মানুষই যে শেষ পর্যন্ত সমস্ত অহং সমস্ত যুক্তি-শৃঙ্খলাব বিজ্ঞান নস্যাৎ করে ঈশ্বরকে না গড়ে পারে না। অনন্যোপায় হয়ে 'তর্কেঽপ্রতিষ্ঠঃ' সেই পুরাণ পুরুষকে আঁকড়ে না ধরলে যে তার শান্তি নেই, বাঁচার পথও নেই। এই বিশ্বাসেই বুঝি অবশেষে স্থিত হয়েছেন বঙ্কিম। তাই জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে একমাত্র হরিহর স্মরণ ও মনন ছাড়া আর কোনো সংসার সঙ্গীতই তাঁর মধুর ও সুখকর লাগেনি।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'একা'য় বিষন্ন বঙ্কিমের স্বীকৃতি—

যৌবনে…সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত, ভাল লাগিত—এখন লাগে না। চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না।'—তবে 'উহা যেমন মনুষ্য কণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনি সংসারের এক সঙ্গীত আছে। সংসার রসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? …সেই পূর্বশ্রুত সংসার সঙ্গীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীত ধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার সঙ্গীত।

'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র আনন্দ ও প্রফুল্লতা 'সীতারামে' সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। এখানে ফিরে এসেছে জীবন বিষাদ। তাই অন্য কোনো সুর বা গীতিমুখরতা শোনা গেল না আর। ঈশ্বর স্তুতির ধ্রুবপদই এখন কেবল 'পরং চ ধাম'।

'কমলাকান্তে'র কাছে 'একা' মানেই দুঃখ, সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্নতায় বিষণ্ণতা। সীতারামের অনন্বয়ের বিষাদ দূর হয়েছে জয়ন্তী ও শ্রীর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বৃহৎ কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হওয়ায়। তাঁর সংকীর্ণ পত্নীমোহ মহত্তর দেশপ্রেমে উদ্‌বর্তিত। 'দেশরূপী ঈশ্বরের হিত সাধনেই সীতারাম, শ্রী ও জয়ন্তীর 'প্রীতি বৃত্তির অনুশীলন স্ফুরণ ও চরিতার্থতা'।[২৪] এই ঈশ্বরের প্রেমের জন্যেই সমস্ত একক বিচ্ছিন্ন মানুষকে সংঘবদ্ধ হবার ডাক দিয়েছেন বঙ্কিম 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারামে'। 'সীতারামে' আর একক বা নিভৃতির গান শুনতে বা শোনাতে চান না বঙ্কিম। শ্রী ও জয়ন্তীর যুগ্মকণ্ঠের পরিচালনায় গান এখানে অবশেষে গণ-গর্জিত কলরোল। এক মহাসঙ্গীত। ব্যষ্টিরূপী বারিবিন্দুর সঙ্গে সমষ্টি-রূপী অনন্ত জলরাশির মিলনের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

'কি নিধি মিলিল।'

বঙ্কিমের গানের ভুবন প্রদক্ষিণ করে অবশেষে মরমী পাঠকের অর্জন—বঙ্কিম তাঁর আজীবন সাহিত্যচর্যার মধ্যে দিয়ে জানাতে চান, অমিতবিত্ত গানের রয়েছে যে অশেষ সঙ্গতি।

গান সকলভুবনোপজীবী। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষের অন্তরনিধি। গীতে মোহিত হয় না কে! গান কার না কণ্ঠহার! শিক্ষাপটুত্বহীন দীন গ্রাম্য-জন অথবা সম্ভ্রান্ত কলাবত, কলাবতী; সামান্যা ভিখারিণী কিংবা রাজবনিতা; কুলবধূ অথবা দরবার নটী; প্রেমিক কিংবা লম্পট; কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী অথবা সংসারক্লিষ্ট বিপন্ন নরনারী সকলেরই সে প্রিয়, প্রার্থিত, অভিনন্দিত।

প্রাণসখীর মতো সে যে কণ্ঠলগ্না সুখী সহজ মানবের আনন্দিত ও মিলিত জীবন-লীলায়, দুঃখীর বিষাদ ভারাতুর নিঃসঙ্গ আত্মনিভৃতিতে, উন্মাদিনীর নির্জ্ঞানের কোন্ অবতলের উদ্ভাসে, ভোগাতুর বিলাসীর প্রমোদবিহারে, সাধকের সমাহিত আত্মোপাসনায়, ত্যাগব্রতী দেশ-সন্তানের কর্মোদ্দীপনায় কিংবা দেশ ও জীবন-যোদ্ধার আত্মোৎসর্জন আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দিত সমরাঙ্গনে। সর্বত্র অবাধ সঞ্চারিণী স্বচ্ছন্দবিহারিণী এই গান।

বঙ্কিম দেখিয়েছেন, কখনো গান গাওয়া হয় অন্যের অনুরোধে, কখনো বা উদ্দীপিত হয়ে, প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে, আত্মোন্মোচনের কারণে। গান নিজের অথবা অপরের চিত্তরঞ্জিনী। আবার গান এক অপরূপ সাঁকো। শ্রেণী অভিমান ঘুচিয়ে দুই বি-সমকে এক করে সুরের চাঁদোয়াতলে। দিগগজ, বিমলা গিরিজায়া মৃণালিনীর কোনো ভেদ থাকে না সেখানে।

শুধু কথার অভিঘাতে যে হৃদয়দ্বার খোলে না, যে অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করা যায় না গান দিয়েই তা খোলা যায় ছোঁয়া যায় অনায়াসে।

গানই হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার ভাষা। প্রণয়ীর এবং ব্যথার ব্যথীর।

গান দিয়ে ফাঁক ভরানো যায় অস্বস্তিকর সময়ের, নিঃসঙ্গতার। জীবনের পথ চলার পাথেয় এই গান। সুখ-দুঃখের, দিন-রাতের সদা-সঙ্গী সে। সুখীজনের সুখ বাড়ায়, দুঃখীর দুঃখ উপশম করে।

গান প্রেমিকের প্রেমের পোষণ, সাধকের আত্মার অশন।

চতুর কামাতুরের ছলচাতুরীর মায়া-পাশ ; ঈশ্বর-অনুগতের আত্মনিবেদনের তদ্গত উচ্ছ্বাস।

বঙ্কিমের কাছে গান চতুর্বর্গের সাধন। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষলাভের অনন্য উপায়। 'রজনী'র পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ও শেষ পর্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাসের অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্ব-ব্রতী পাত্রপাত্রীরাই উদাহরণ যে গানের আছে অন্তর-পাবনী ও আত্মোদ্বোধন সামর্থ্য।

বৈষ্ণবী ভিখারিণী, বাঈজী, ওস্তাদ কলাবৎ ও দীনদরিদ্রা দরিয়ার দৃষ্টান্তে জানা যায় গানের আছে অর্থকরী দিক। গান জীবিকানির্বাহেরও উপায়।

গান কামোত্তেজনা বাড়ায়। দেবেন্দ্র-হীরার ও গোবিন্দলাল-রোহিণীর যুথ জীবন তার প্রমাণ।

কিন্তু আনন্দই গানের শেষ কথা। নিজের ও পরের আনন্দ বিধানই গানের একমাত্র লক্ষ্য। তাই গানই অন্যতম মোক্ষসাধন।

গান, গানের প্রসঙ্গ, গানের পরিস্থিতির বিচিত্র সাহিত্যবদ্ধ উদাহরণে আসলে বঙ্কিম ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন বাংলার অতীত, বর্তমান ও অনাগত কালের সমগ্র গানের একটি স্পষ্ট চেহারা। এঁকেছেন তাঁর সমকালের গানের জগতের পূর্ণাঙ্গ ছবি। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন তাঁর নিজের গীত অভিরুচির ধরন, তাঁর নিজের পক্ষপাত ও গান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মনন। 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'সীতারাম' পর্যন্ত প্রসারিত বঙ্কিমের গানের জগৎ পরিভ্রমণ শেষেই তা জানা যায়।

উনিশ শতকের বাংলাদেশ 'মার্গ' ও 'দেশী' দুই রীতির গানেরই প্রবল ও বিচিত্র-শাখায়িত বহতা ধারায় আলোড়িত। নবাব, বাদশাহ, রাজা-রাজড়ার দরবারে, ধনী অভিজাত বিদগ্ধ মহলে সগৌরবে প্রসার লাভ করেছে হিন্দুস্থানী মার্গসঙ্গীত ধ্রুপদ, খিয়াল, টপ্পা, ঠুংরি।

গ্রামীণ ও নাগরিক সাধারণ লোক জীবনে স্বতঃস্ফূর্তিতে বয়ে চলেছে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, শ্যামাসঙ্গীত, প্রভাতী, ঝুমুর, কবিগান, যাত্রা, ঢপ, পাঁচালী প্রভৃতি বিপুল বৈচিত্র্যেভরা লোকগীতি বা বাংলা গান।

উনিশ শতকের এই গীত-উতরোল যুগেই স্বভাব-গীতানুরাগী, সুর-সংবেদী বঙ্কিমের বসবাস। সুরের অমোঘ আকর্ষণেই তিনি সমকালীন মার্গ-দেশী সমস্ত গানেই উৎসুক। কিন্তু তিনি যে গীতবোদ্ধা, আছে তাঁর নিজস্ব পরিশীলিত গীতরুচি। তাই বিশেষ বিশেষ গানেই তাঁর পক্ষপাত দেখা যায়।

'মার্গ' বা হিন্দুস্থানী কালোয়াতী গান সম্পূর্ণ তাল লয়ে আরোহ-অবরোহ পদ্ধতিতে রাগরাগিণীর শুদ্ধ বিস্তারে এবং সাধনা-সাপেক্ষ অথচ মধুক্ষরা স্বর-চাতুর্যে নিবেদিত হলে তবেই তা বঙ্কিমকে স্পর্শ করত। তিনি ভালবাসতেন মধুর অথচ জলদমন্দ্র কণ্ঠের গম্ভীর ভাববাহী সম্পূর্ণাঙ্গ ধ্রুপদ গান। তাঁর রুচি ছিল না শুধু কণ্ঠকেরামতিভরা দীর্ঘ তানসর্বস্ব খেয়াল গানে। কমলা-কান্তের' "ভৃঙ্গরাগে" সে গান 'সনদী ঘ্যানঘেনে'। সুনীতি ও রুচিবিগর্হিত জীবনের অনুষঙ্গী বলেও খেয়াল-টপ্পা সম্পর্কে বঙ্কিমের বীতরাগ ছিল। তবুও কৃতী শিল্পীর সুকণ্ঠে এ সব গানের উচ্চাঙ্গ শিল্পায়ন তাঁর কাছে প্রশংসিত। মনিয়াবাঈ ও দেবেন্দ্রর গানে রেখেছেন প্রমাণ।

বঙ্কিম জানতেন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্রিয়াঙ্গ ও তত্ত্বাঙ্গ জ্ঞান বৈদগ্ধ্যের অন্তর্ভুক্ত : সু-সংস্কৃতিসম্পন্ন পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞান আবশ্যিক। তবুও মমতা ছিল তাঁর সহজ লোকগানের সরল স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ শিল্পে ও তার প্রাণ ভরানো সুরে।

তিনি বুঝতেন, সহজ সরল ভাষায়, ভাব দরদ ও আকুতি উজাড়করা লোক-গানেরও আছে এক অব্যর্থ আকর্ষণ ও আবেদন। শহুরে, শিক্ষিত কৃত্রিম মানুষের সংবেদী মনও যা এড়াতে পারে না কিছুতেই। এর প্রমাণ তাঁর গীতবাদ্য অনুশীলন করা কলকাতাবাসী বাবু নিশাকর। তিনি জেলে নৌকা থেকে ভেসে আসা 'শ্যামা-বিষয়' শোনেন মনোযোগী হয়ে। এ গানই তাঁকে গভীর ভাবনায় আনমনা করে।

অনেক গভীর তত্ত্বকথা কত অনায়াসে লোকভাষায় ব্যক্ত করা যায় লোক-গানে তার সামর্থ্য বঙ্কিম খুঁজে পেয়েছিলেন। বাণী বা কথাই 'দেশী' গানের সম্পদ। সেই সম্পদকেই বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের সংকেতধর্মী ও নাটকীয় গানে বিনিয়োগ করেছেন। পাগলিনীর জটিল অন্তর্জগতের উন্মোচনে কত সহজেই না ব্যবহার করেছেন পারিপাট্যহীন লোকগীতিধর্মী বাংলা গান।

বঙ্কিম ভালবাসতেন বনেদী পুরাতনী কীর্তন। ধ্রুপদী গানের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি পেশ করেছেন ধ্রুপদভঙ্গিম উচ্চাঙ্গ কীর্তন যা একান্তই বাংলার নিজস্ব সম্পদ, যা নয় কেবল বিদগ্ধ মুখমণ্ডলে বদ্ধ, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সর্বত্র সকল সময় যা সমান উপভোগ্য।

পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষ প্রিয় তাঁর জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস। সমকালের 'বাংলা' গানের মধ্যে পছন্দসই তাঁর কবিগানের 'বিরহ' ও সখী-সংবাদ, 'আগমনী ও গোষ্ঠ'।

ভালোবাসেন শ্যামা-বিষয়, রামপ্রসাদী। দাশুরায়ের গান, গোবিন্দ অধিকারী ও বদন অধিকারীর পালার কৃষ্ণ-বিষয়ও তাঁর ভালো লাগে।

গোপাল উড়ের বা রূপচাঁদ পক্ষীর রঙ্গ কৌতুকের গানে আমোদ পান মাত্র। বরং স্পৃষ্ট হন তিনি বাউল-ভাটিয়ালীর তত্ত্বধর্মী রূপক শৈলীর গানে ও তার মন উদাসী সুরে।

উনিশ শতকের বিচিত্র সঙ্গীত চাঞ্চল্যের যুগে একমাত্র জয়দেবের পদ বঙ্কিম সরাসরি তাঁর উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। আর ব্যবহৃত তাঁর বিশেষ প্রিয় স্তব ও স্তোত্র গান। বিদ্যাপতি তাঁর একান্ত প্রিয় হলেও তার অনুকরণে নিজেই গড়েছেন গীতিপদ। কীর্তন বাউল ভাটিয়ালি ঝুমুর গানের আদলেই খাঁটি বাংলা গান বেঁধেছেন তিনি।

এ বিষয়ে শেকস্‌পীয়রের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। নিজেরই প্রয়োজন মতো, ছড়ানো ছিটোনো, যুগ প্রচলিত গানের কিছু পংক্তি বেছে, একটু ভেঙে, বদলে মাঝে মাঝে গান গড়া শেকস্‌পীয়রের এই টেক্‌নিক কখনো কখনো বঙ্কিমেও লক্ষণীয়। তবে বঙ্কিমের সাবধানতা অনেক বেশি। তাঁর ইচ্ছামত, প্রতিটি গানই কাহিনীর বিষয়, ভাব, চরিত্র-সংলগ্ন, এবং অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী। কারণ তাঁর প্রয়োজন নেই সাজবদলের ফাঁক ভরাবার, ভালো গাইয়েকে কাজে লাগাবার অথবা দর্শকের ক্লান্তি অপনোদনের, তার চিত্ত-বিনোদনের।

'খিয়াল' 'টপ্পা' 'ঠুংরি' সেকালে ছুঁৎমার্গী সাংগীতিক মহলে অভ্যর্থনা পায়নি বটে, বঙ্কিমও এ-গানে বিতৃষ্ণার কথা 'রজনী'তে জানিয়েছেন। তাহলেও দেখা যায় এসব গানের রোম্যান্টিকধর্মিতা ও লিরিক্যাল গুণ সেকালের অন্যান্য বৈঠকী বাংলা গানের মতো বঙ্কিমের গানেও প্রভাব ফেলেছিল। টপ্পাঙ্গ গানের সুর খেয়ালাঙ্গ গানের তাল সেকালের বাংলা গানে বহুল ব্যবহৃত।

টপ্পাঙ্গের সুর ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, লুম, বেহাগ সেকালের বাংলা গানের গীতিকার ও সুরকারের প্রিয় ছিল। ঝিঁঝিটের ছিল নানা বৈচিত্র্য। যেমন— ঝিঁঝিট খাম্বাজ। উদাহরণ শ্রীধর কথকের গান—'মরমে মরম যাতনা ভালোবাসার অযতনে'।

ঝিঁঝিট লুম। উদাহরণ— দীনবন্ধু মিত্রের 'সোহাগে মৃণাল ভুজে বাঁধিল রাধাশ্যামে।'

'ঝিঁঝিট আদ্ধা'—বঙ্কিমের 'এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইব'।

সেকালে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত কাওয়ালি—আড়া ঠেকা, আদ্ধা তাল। এ তাল টপ্পাঙ্গ ও খেয়ালাঙ্গ গানের তাল, এবং ধ্রুপদের সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

বঙ্কিম তাঁর 'আনন্দমঠে'র বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' কাওয়ালি তালে, মল্লার সুরে বেঁধেছেন। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে গানটির পাদটীকায় সুর তাল লয় নির্দেশে লেখা আছে—'মল্লার' কাওয়ালী তাল যথা —

০	১	×	১ ইত্যাদি
বন্দে	মা	তরং	....

শান্তির "দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি"র সুর বাগেশ্রী··· তাল আড়া ঠেকা।

রামমোহন রায়ের সর্বাধিক গান গাওয়া হত 'আড়া ঠেকায়'। আড়া, কাওয়ালী সেকালের নাটকের গানের বহু ব্যবহৃত সুর তাল।

মধুসূদন দত্তের নাটক 'রত্নাবলী'র (১৮৫৭) গান 'শুন রতিপতি করি গো মিনতি'র সুর 'ভৈরবী' 'আড়া তাল'।

'কৃষ্ণকুমারী'র (১৮৬৮) 'যাইতেছে যামিনী বিকশিত নলিনী'র সুর 'ভৈরবী-কাওয়ালী'।

হরচন্দ্র ঘোষের 'রজত গিরি নন্দিনী' নাটকের (১৮৭৪) গান—'এতদিনে কিরাতিনী মনোরমা হইল। কন্দর্পের ফাঁস লয়ে বনমাঝে রইল ' ইত্যাদির সুর 'বাগেশ্রী' 'আড়া ঠেকা'।

বঙ্কিম ছিলেন স্বভাব-সুরসংবেদী। সুরেলা কণ্ঠ অথবা যন্ত্রসঙ্গীতের অনিবার্য আকর্ষণ এড়ানোর সাধ্য তাঁর ছিল না। তাই তাঁর সময়ের নানা গানের নানা সুরে হয়েছেন আকৃষ্ট, প্রভাবিত।

কিন্তু সমকালীন এই সব গানের অভিঘাতেই খুলে গেছে তাঁর গীতভাবুক মনের গভীর গোপন ভাবনার রুদ্ধদুয়ার। তাঁর সমকালের গানই তাঁকে বাধ্য করেছে অতীতের সাংগীতিক ঐতিহ্যে উজিয়ে যেতে এবং ভাবীকালের স্বপ্নগাথা রচনা করতে।

সমকালীন সাংগীতিক ক্রিয়াকলাপে বঙ্কিম তৃপ্ত ছিলেন না। তিনি লক্ষ্য করেছেন 'মার্গ', 'দেশী'—'হিন্দুস্থানী' ও 'বাঙ্লা' এই দুই ধারায় বিভক্ত এ-দেশের সমগ্র গান 'ভদ্রেতর' এই দুই বিপরীত মেরুবর্গের মধ্যে রুচি ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। বিদগ্ধ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতের রয়েছে 'দেশী' 'বাঙ্লা' গানের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা—আর অশিক্ষিত সাধারণ জনমণ্ডলীর রয়েছে মার্গ-সম্পর্কে মূঢ়তা-জনিত বিস্মিত সম্ভ্রম অথবা উপহাসজড়িত বিরক্তি।

অথচ দুই গানেই রয়েছে সীমায়তি। হিন্দুস্থানী কালোয়াতী গান শুধুই সুরসর্বস্ব-বাণীরিক্ত। আত্মোন্মোচনের সুযোগ নেই সেখানে।

আর দেশী গান, তাঁর কালের 'বাঙ্লা'—ছিল ভাবে ভাষায় সুরে নিতান্ত

দীন পারিপাট্যহীন। সে গানে ছিল না ভাবের গভীর ব্যঞ্জনা, ভাষার প্রসাধন, শব্দার্থময়তা ও সুরের বৈচিত্র্য।

তাছাড়া উনিশ শতকে 'মার্গ' অথবা 'দেশী'র বিশুদ্ধ ভাব রূপ ও অনুষঙ্গ গিয়েছিল হারিয়ে। ক্রমেই গান হয়ে পড়েছিল ব্যক্তির অথবা জনসমষ্টির প্রমোদ-উপকরণ। মানবিক প্রণয়-আকূতি অথবা মানবমানবীর প্রণয়লীলাই ছিল গানের উপজীব্য। ক্রমশ রুচির স্থূলতা গ্রাস করেছিল এই সূক্ষ্ম শিল্পকে।

তখন বিদগ্ধ সম্ভ্রান্ত সমাজ তৃপ্ত ছিলেন তাঁদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর অথবা জলসাঘরের নাচগানের কালচার নিয়ে। অশিক্ষিত মূঢ় জনতা মাতোয়ারা কবি গান, কবির লড়াই কিংবা যাত্রা পালা পাঁচালীর জমজমাট পরিবেশ নিয়ে। শহুরে বাবুরা এদেশে নয়া আমদানী, থিয়েটার ও তার গান নিয়েও হুজুগে মেতেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম অনুভব করছিলেন যে সবই যেন 'জোয়ারের জলের গান'। সে সব নয় চিরকালের চিরসুখের চিরআনন্দের গান, নয় 'সর্বজন-মনোমুগ্ধকারী সেই জয়গীতি'। সে সব গান শুধু ব্যক্তি বিশেষের, গোষ্ঠী বিশেষের, কাল বিশেষের, স্থান বিশেষের, ক্ষণিক সুখ ও ক্ষণিক আনন্দের গান। সে গান সর্ব হৃদয় ও কাল জয় করতে পারে না। তাই বঙ্কিম তাঁর কালের উচ্চকিত গীত-কলরোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'একা' খুঁজে ফিরেছেন সর্বজন-মনবিহারী কালজয়ী 'ধ্রুবপদ গান'। তাঁর চিত্ত এমনই গানের জন্যে পিপাসিত যা নিভৃত শ্রোতার অথবা গণমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করেই মিলিয়ে যাবে না। শ্রবণমঙ্গল ভুবনমঙ্গল আর তাই চির আনন্দের গীতিরূপে সে গান সর্বজনমনে চিরকাল বিহার করবে। অর্থাৎ সে গান একই সঙ্গে পাবে স্থায়িত্ব ও মূল্য।

সঙ্গীতের অশুচি অবক্ষয়ে বঙ্কিমের চিত্ত ছিল পীড়িত। তাই তিনি তাঁর সমকালের 'মার্গ' ও 'দেশী' গানের ভ্রষ্ট অবক্ষয়িত কলঙ্করূপ সাহিত্যবদ্ধ করে তারই পাশাপাশি ভারতবর্ষের প্রাচীন সাংগীতিক ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দিয়েছেন কীর্তন ও স্তবগানের উদাহরণ। জানিয়েছেন সে গান 'সাঙ্গোপাঙ্গে' অর্থাৎ সুর তাল লয়ে 'বিভূষিত' ও 'বিস্তৃত' করেই গাওয়া হত। সে গান একাধারে 'বিমুক্তিদদং'—মুক্তিপদ এবং 'লোকানুরঞ্জকং'—লোকের চিত্তরঞ্জক।

'এসো এসো বঁধু এসো'র মতো কীর্তনের উদাহরণ দিয়ে বঙ্কিম জানিয়ে-ছিলেন—সে গানের উদ্দিষ্ট পররূপী বৃহৎরূপী পরমেশ্বর। প্রাচীন প্রণয়গীতি ভক্তিরসের গভীর শান্তভাবে সমাহিত। অর্থবহ সুললিত ভাষায় সম্পন্ন সেই গান একই সঙ্গে প্রেম ও ভজনগীতি। একাধারে চিত্তরঞ্জিনী ও হিতকারী। এ

গানের ভাব ও সুর সংঘাতে সত্তার গভীরে এক বৃহৎ চৈতন্যের অনুভব জাগিয়ে দেয়। তুচ্ছ ক্ষুদ্র সংসারবন্ধ মনকে উত্তীর্ণ করে দিব্য চিদ্‌ভূমিতে, আত্মাকে ব্যাপ্ত করে মহাভাব লোকের ঊর্ধ্বশায়ী ক্ষেত্রে। সেই অনুভূতিলোকে ত্রিতাপ দুঃখ ঝরে যায়। গলে যায় আত্মপর ভেদ, স্বার্থ গন্ধ মুছে যায়, জ্বলে ওঠে সুরে সুরে সুখোদ্দীপ্ত বাণীর মননে পরমানন্দ। জীবনের মূল লক্ষ্যানুগামী দিব্য শান্ত ছন্দটি ধরা দেয় সে গানের তালে লয়ে, মাত্রায় সপ্তস্বরের সুনিপুণ কলাকরণে অনুকূল রাগ রসের মাধুরী ক্ষারণে, ইষ্টনিষ্ঠার ধ্যান-তন্ময়তায়, পরমেশ্বরে আত্মনিবেদনের একান্ত আকূতির নৈবেদ্যে।

এই গীতসুধার জন্যেই বঙ্কিমের চিত্ত পিপাসিত। ভাবীকালের জন্যেও তিনি এই গানেরই দীক্ষা চান। 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারামে' শোনান এই ঈশ্বর-কীর্তন।

বঙ্কিম জানতেন, তৎকালীন 'বাঙলা' গানের কলঙ্ক ঘুচিয়ে ভাবভাষার পরিমার্জনায় ফিরিয়ে আনা যায় তার অতীতের অতুল অমল রূপ। সুরৈশ্বর্যের অভাব উনিশ শতকে ছিল না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভাণ্ডার আর বাংলা 'মা-র প্রসাদ' দুই-ই ছিল আয়ত্তাধীন। প্রয়োজন ছিল শুধু এই দুই রাগ রঙে ও বাণীর অলঙ্কারে মনের কথা সাজিয়ে পরম রমণীয় 'বাঙ্‌লা'-গানের রতন-হারটি গাঁথা।

দেশ-রূপী ঈশ্বরীর মহিমাকীর্তন ও স্তব-গাথা রচনা করে 'বন্দেমাতরম্‌' গানে বঙ্কিম 'বাঙ্‌লা' গানের এক 'নবীন তরী' ভাসিয়ে দিলেন। কামাতুরতায় আবিল প্রণয়-গানের ঘূর্ণাবর্ত থেকে ছাড়া পেয়ে এই 'বাঙ্‌লা' দেশপ্রেমের মহা সঙ্গীত প্রবাহ হয়ে অনন্তকালে ধাবিত হল। এ গান রইল না আর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের নিভৃতির বা সীমাবদ্ধের গান। সুর তাল লয় সংযুক্ত এই গান হল 'মার্গ'। এক ধ্রুব লক্ষ্যের দিশারী। আবার 'দেশী'—সমস্ত লোকচিত্ত-রঞ্জক। হল প্রাণ-পাবনী এবং অন্তর্মোহিনী।

'আনন্দমঠে' এই গান সংযোজিত করার পর আর নতুন কোনো গান রচনায় বঙ্কিমের মন ছিল না। তাই শেষের দুই উপন্যাসে তিনি গীতমৌন। দেবনাম স্তোত্রই এখানে ধ্রুপদ সঙ্গীত।

বঙ্কিম চেয়েছিলেন অবশেষে ঈশ্বর বন্দনা-রূপ ধ্রুপদেরই পুনর্জাগরণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মনোভাবের প্রতিফলন বিবেকানন্দের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। তিনিও মনে করতেন—

সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা এবং যাঁরা তা বোঝেন তাঁদের নিকট উহা

সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা।[৯৫]

তাঁরও প্রিয় ধ্রুপদ এবং কীর্তন। কিন্তু কখনো কখনো কীর্তন তাঁর কাছে 'মেয়েলি গান'। তিনি বলেছেন—

> যে সব গীতবাদ্য মানুষের কোমল ভাবসমূহ উদ্দীপিত করে সে সকল কিছুদিনের জন্য এখন বন্ধ রাখিতে হইবে। আমাদের দেশের যথার্থ গান কীর্তনে আছে, কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় ধ্রুপদ গানই একমাত্র উপযোগী।[৯৬]

'বীরত্বব্যঞ্জক' 'সতেজ' সঙ্গীত ধ্রুপদের পুনরুজ্জীবনই তাঁর কাম্য।

'কোমল ভাবসমূহে'র উদ্দীপক টপ্পা, খিয়াল, ঠুমরি, গজল, যাত্রা থিয়েটারের গানে বন্দ হয়ে থাকার যুগে বঙ্কিমও পরিশেষে হতে চাইছিলেন স্বেচ্ছায় গীতমৌন। তিনি চাইছিলেন, গান উঠে আসুক কবিওয়ালাদের হাটের ধুলো থেকে, বারাঙ্গনাসেবীর বৈঠক-বাগানবাড়ি থেকে, স্থূলরুচি অশিক্ষিত গণমণ্ডলীর চটুল আমোদের আখড়া থেকে, লঘু সস্তা জনবিনোদনের লোকমঞ্চ থেকে। গীতিসত্তার মহিমায়ন হোক ঊর্ধ্বমুখী প্রাণলোকে। দেশরূপী অথবা ভাগ্য-বিধাতারূপী ঈশ্বরের জয়গীতিই হোক ধ্রুবপদ। যেহেতু অনড় শাস্ত্রবিধিগত রাগতাল মানের বেড়ায় ঘেরা ধ্রুপদ হতে পারে না সর্বজনগণমনপ্রিয়, তাই কেবল ভক্ত কবি হৃদয়ের অনুভূতি আর আবেগের সংঘর্ষে জ্বলে-ওঠা সুরের আগুনে প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যাওয়া 'সর্বজনমনোমুগ্ধকর সেই জয়গীতি', সন্তান-দলের আত্ম-উদ্বোধনী গানের মতো, শ্রী ও জয়ন্তীর আকুল প্রার্থনার মতো ছড়িয়ে পড়ুক 'সবখানে সবখানে সবখানে'।

বঙ্কিমের জীবনসাধনা 'একা-মারার সাধনা'। 'একা মেরে সাঁই ফেরে সব ঠাঁই'—ফকির লালন সাঁই-এর এই আকাঙ্ক্ষারই লালন বঙ্কিমের মনে। বঙ্কিমের গান একা-বিনাশের গান।

৩

'সর্বসৌন্দর্যের রসগ্রাহী'—বঙ্কিম

'শিল্পসন্ধানী বঙ্কিমচন্দ্র' ও 'বঙ্কিমের গানের জগৎ' পর্যালোচনার শেষে অবশ্যই নির্ধারণ করা যায়, শিল্প ও সঙ্গীত প্রসঙ্গের গুরুত্ব বঙ্কিম-উপন্যাসে অপরিসীম। বঙ্কিমের সৃষ্টি যেহেতু জীবননাট্যের বিশেষ শিল্পিত দর্পণ তাই সেখানে জীবন-সংলগ্ন শিল্প ও সঙ্গীতের অনিবার্য প্রতিফলন। এ বিষয়ে সম্ভবতঃ নাট্যশাস্ত্রাচার্য ভরত মুনির বাক্যই হতে পারে তাঁর নিজস্ব উচ্চারণ।

'ন তজ্‌জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন্‌যন্ন দৃশ্যতে ॥
সর্বশাস্ত্রাণি শিল্পানি কর্মাণি বিবিধানি চ।
অস্মিন্নাট্যে সমেতানি তস্মাদেতন্ময়া কৃতম্‌ ॥

(নাট্যশাস্ত্র—১।১।১১৬-১১৭)

(এমন কোনো জ্ঞান, শিল্প, কলা, বিদ্যা, যোগ বা কর্ম নেই যা এই নাট্যে দৃষ্ট হয় না। তাই এই নাট্য আমি সৃষ্টি করেছি যাতে সকল শিল্প সকল কর্মের বিবিধ মিলন হয়েছে।)

বঙ্কিমের জ্ঞানে পরিপূর্ণ মানুষের জীবন শারীরসামর্থ্য, জ্ঞান, কর্ম এবং সৌন্দর্যশ্রী-জাত আনন্দের এক সমাহার শিল্প।

তাঁর অভিমত, পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্য-কারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী, বৃত্তির সুসমঞ্জস সামগ্রিক অনুশীলন জীবনের কর্তব্য। 'নহিলে মনুষ্যের ধর্মহানি হইবে।' (ব. র. ২য়, পৃ. ৬৬৭)

এই পূর্ণ অনুশীলিত মানুষের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর সমসাময়িক সমাজের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই বঙ্কিমের আক্ষেপোক্তি—'সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল আস্ত মানুষ পাইব কোথা ?' (ব. র. ২য়, পৃ. ৬১৩)

বঙ্কিমের সাধনা সমগ্রতার সাধনা। বিবিধের মিলনের মধ্য দিয়ে এক পূর্ণ জীবনের এবং শিল্পের সাধনা।

বঙ্কিমের শিল্পায়িত পূর্ণ মানুষ যেমন শারীরপটু, জ্ঞানী, কর্মী তেমনি 'সৌন্দর্যদত্ত প্রাণ' ও 'সর্ব সৌন্দর্যের রসগ্রাহী' (ব. র. ২য় পৃ. ৬১৩)। তাঁর 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমার সেই আদর্শায়িত 'আস্ত মানুষের' প্রথম পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

এই উপন্যাসেই বঙ্কিম উদাহরণবিন্যাসে প্রথম স্পষ্ট করেছেন—'সৌন্দর্য', 'সৌন্দর্যদত্তপ্রাণ' এবং 'সর্বসৌন্দর্যের রসগ্রাহী' কথার অর্থ কি। বঙ্কিমের নান্দনিক দৃষ্টির গতিভঙ্গীর স্বরূপ খুঁজতে গেলে 'কপালকুণ্ডলা' প্রথম হতে পারে সঠিক যাত্রাভূমি।

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন—

যা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে তাই সৌন্দর্য। সৌন্দর্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য বুঝিতে হইবে।··· সৌন্দর্যের অনেক প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে।

(ব. র. ২য়. পৃ. ১৮২-৮৩)

বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য বলতে কি বোঝেন বঙ্কিম তার উদাহরণও তিনি ভবভূতির সৌন্দর্যপ্রীতির আলোচনা প্রসঙ্গে বিন্যস্ত করেছেন :

বাহ্য প্রকৃতির শোভার প্রতি অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ।·· মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যান হইতে সুন্দর সুন্দর কুসুমগুলি তুলিয়া সভা-মণ্ডপ রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু আকীর্ণ করিয়া এই নাটক-খানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্ল কুসুম, সুশীতল বারি—যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্বত, মৃদু নিনাদিনী নির্ঝরিণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদী—যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরল স্বভাব কুরঙ্গ সেইখানে কবি দাঁড়াইয়া একবার তাঁহার সৌন্দর্য দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্সপীয়র ও কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। (ব র. ২য়, পৃ. ১৮৫)

আমরা জানি এই গুণ বঙ্কিমেও লক্ষণীয়। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও সৌন্দর্যে বিকশিত সম্পূর্ণ নিসর্গ শোভার চিত্রপটে তিনিও আঁকেন এই প্রকৃতিরই সন্তান মানুষের রূপ মন ও জীবনের সুন্দর ছবি। বহিঃপ্রকৃতি ও মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য-সমন্বয়ে তাঁর সম্পূর্ণ সৌন্দর্যের জগৎ।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধেই তিনি বলেছিলেন—'মনুষ্যের কার্যের মূলে তাহা-দিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণন দ্বারাও সৌন্দর্যের সৃজন হয়।'

সুতরাং 'সৌন্দর্যে'র দুই মূলাধার বঙ্কিমের কাছে স্বীকৃত। নিসর্গ সৌন্দর্য ও মানুষের চিত্তবৃত্তির সৌন্দর্য।

আবার দুই সৌন্দর্যই পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। বহিঃসৌন্দর্য মানুষের অন্তর প্রকৃতিতে অভিঘাত সৃষ্টি করে। অন্তর প্রকৃতির বিচিত্র আলোছায়ায় নিসর্গ প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে দ্রষ্টার সামনে ধরা দেয়। 'মানস বিকাশ' প্রবন্ধে (ব. র. ২য়, পৃ. ৮৮৭) এই সত্যটি ব্যক্ত করে বঙ্কিম লেখেন—"বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থা বিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর

বোধহয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে।"

তবে, একটি কথা বঙ্কিমের কাছে স্পষ্ট—এই বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত নিসর্গ প্রকৃতি আপন নিয়ম শৃঙ্খলার পারম্পর্যে নিয়তই সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে চলেছে। 'তুমি গ্রাহ্য কর না কর, তাই বলিয়া তো জড় প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য তো লুকাইয়া রয় না।' (চন্দ্রশেখর—ব. র. ১ম, পৃ. ৪৩৬)

সৌন্দর্য স্বতোস্ভাসিত। সৌন্দর্য যে সুবেদী মনে অনুরণন জাগায় সেই "সৌন্দর্যদত্তপ্রাণ"। সৌন্দর্য মাত্রেই আকৃষ্ট হওয়া তার স্বভাব; 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদ 'সমুদ্রতটে'র দৃশ্যে বিশ্বচরাচরের অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতীক 'অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডলে'র পটে নবকুমারকে দাঁড় করিয়ে অখণ্ড সৌন্দর্যের রূপ রস স্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন বঙ্কিম। দেখিয়েছেন তার অনুভূতির বিভিন্ন স্বরূপ।

তিনি এখানে দেখান—'বালুকাস্তূপ শ্রেণী', বালুকাবিহীন নিবিড় বন', 'অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল' ও 'তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা', 'অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণ', 'জলধি হৃদয়ে শ্বেতপক্ষ বিস্তারকারী অর্ণবপোত'—এই বিচ্ছিন্ন রূপখণ্ডের সমবায়েই 'কাননকুন্তলা সাগরবসনা ধরণী'র সুবিস্তীর্ণ অনুপম শোভা।

স্বভাব-সৌন্দর্যপ্রেমী নবকুমার। গম্ভীর জলকল্লোলে আকৃষ্ট হয়ে সমুদ্রের সম্মুখবর্তী হবার পর তাঁর চিত্তের প্রথম আন্দোলন—'অনন্ত বিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল।'

কিন্তু ক্রমশ ঘনায়মান প্রদোষ তিমিরে অনন্যমনে অনেকক্ষণ জলধিশোভায় আবিষ্ট হয়ে তাঁর মনে জাগে অনির্দেশ্য কোন্ পূর্বসুখের স্মৃতি—'তাঁহার মনে কোন্ ভূতপূর্ব সুখের উদয় হইতেছিল কে বলিবে?' এই নিসর্গ-সৌন্দর্যের প্রেক্ষাপটেই বঙ্কিম এঁকেছেন প্রকৃতিদুহিতা কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্যচ্ছবি। সে ছবিও তার বিভিন্ন অঙ্গ-সংস্থানের সৌন্দর্য বর্ণনার পরম্পরায় সাজানো। পরিপূর্ণ রূপেরই ছবি।

'সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া, অপূর্ব রমণী মূর্তি"। আলো-আঁধারে ঘেরা গম্ভীর নির্জন সমুদ্রতটে আবির্ভূতা ঘনকৃষ্ণ চিকুরজালে অস্পষ্ট মুখমণ্ডল, অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদিবর্ণ সেই রমণীমূর্তি নবকুমারের মনে জাগায় বিস্ময় বিমুগ্ধতা। স্থানকাল আবহধ্বনি সাপেক্ষ সেই অনুভব—'সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।'

বঙ্কিম বোঝাতে চান বিশেষ পরিস্থিতি পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ রূপ বিশেষ সৌন্দর্য স্ফুরণ করে। সায়ংকালীন সমুদ্রবেলার নিসর্গপটের সমগ্রতা থেকে মোহিনী কপালকুণ্ডলার দেহরূপ সৌন্দর্যকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার কোনো উপায় তাই বঙ্কিম রাখেননি।

নিসর্গচরাচর ও পুরুষ-প্রকৃতি মিলে গড়া সেই বিশ্বপটের সৌন্দর্য সম্পূর্ণতা পেয়েছে রমণীর করুণামাখা কণ্ঠধ্বনির সম্মিলনে। এই ধ্বনিই সেই নির্জন নিস্তব্ধ ভীষণ সৌন্দর্যের ও একাকীত্বের দুঃসহ জগৎটিকে কোমল স্নিগ্ধ আশাময় আনন্দময় ও রহস্যময় করে তুলেছে। এই ধ্বনিই সেই নিসর্গপটে বিধৃত সৌন্দর্যলক্ষ্মীর প্রাণলাবণ্য। তাই নিসর্গচরাচরের প্রেক্ষাপটে আঁকা রমণীর রূপ ও ধ্বনি নবকুমারের 'সর্বসৌন্দর্যের রসগ্রাহী' মনে জাগায় গভীর সংবেদনা। বঙ্কিম তা ব্যক্ত করেন কাব্য ভাষায় :

> 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'? এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষ-কম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল, বৃক্ষপত্র মর্মরিত হইতে লাগিল। সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগর-বসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল। (ব. র. ১ম, পৃ. ১৪৪)

রূপ ও ধ্বনি বঙ্কিমের কাছে একে অন্যের পরিপূরক। অন্যোন্য-সংসক্ত। এই দুইয়ের সৌন্দর্য নিয়েই জগৎ চরাচরের সামগ্রিক সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ। এই সামগ্রিকের সম্পূর্ণ আস্বাদনেই সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ সম্ভোগ।

নিসর্গ সৌন্দর্যকে যখনই বঙ্কিমের উদ্দীপনার আলম্বন হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজন তখনই তিনি বহিঃরূপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নৈসর্গিক ধ্বনিপুঞ্জেরও বিচিত্র স্বর শুনিয়েছেন। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রোহিণী গোবিন্দলালের প্রথম দৃশ্যের নিসর্গপট স্মরণযোগ্য :

> কুহূঃ, কুহূঃ, কুহূঃ। রোহিণী চাহিয়া দেখিল সুনীল, নির্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুরে বাঁধা। দেখিল—নব প্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধ পরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুনে শব্দিত। অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা।...আর, সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া—গোবিন্দলাল নিজে। তাঁহার অতি নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজি নির্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিত

বৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিত লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে। কি সুর মিলিল। এ ও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা।

(ব.র. ১ম, পৃ. ৫৪৮)

বঙ্কিমের উপলব্ধি, গন্ধে বর্ণে আকারে স্পর্শে বিকশিত বিভিন্ন রূপ ও বিচিত্র ধ্বনিপুঞ্জের বিবিধ মিলনের মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে সুসামঞ্জস্যের সুরে বাঁধা জগৎ ও জীব প্রকৃতির অখণ্ড ঐকতানের সৌন্দর্য। কোনো খণ্ড-রূপ কোনো একক ধ্বনি সেই সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। নিজস্ব দীপ্তি বা মাধুর্য বিকীর্ণ করেও সেই ঐকতানের সৌন্দর্য প্রোজ্জ্বল ও দ্যোতনাময় করে তোলায় এই খণ্ডরূপ বা এককের সার্থকতা। অখণ্ডতার সুরে বাঁধা 'সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন সৌন্দর্য' রূপ যার মনে 'বহুতন্ত্রী বীণার' মতো সাড়া জাগিয়ে তোলে বঙ্কিমের কাছে সেই 'সর্বসৌন্দর্যের রসগ্রাহী'।

'সর্বসৌন্দর্যের রসগ্রাহী' মনে রমণীয় রূপ ও মধুর ধ্বনির প্রতিক্রিয়া কি ?

বঙ্কিমের অভিজ্ঞতা—রমণীয় রূপ দেখে 'মনে কোন্ ভূতপূর্ব সুখের উদয়' হয়। (কপালকুণ্ডলা)

মধুর ধ্বনি শুনে—'বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতি' জাগে। (একা)

এক্ষেত্রে কালিদাসের সংবেদনাই বঙ্কিমের অভিজ্ঞতা।

'রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি।'[২৮]

(অভিজ্ঞান শকুন্তলম, পঞ্চমাঙ্ক)

(রমণীয় দৃশ্য দেখে মধুর শব্দ শুনে মানুষের মন ব্যাকুল হয়। মনে হয়, চিত্তে অজান্তেই উদিত হয় কোন্ জন্মান্তরের প্রিয় স্মৃতি, যার মূল মনের অতি গভীরে নিবদ্ধ।)

সৌন্দর্যের প্রধান ও প্রথম ক্রিয়া হল মনকে আকৃষ্ট করে মুগ্ধ করা। 'সৌন্দর্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়' ? (চন্দ্রশেখর—ব. র. ১ম. পৃ. ৪০১)

'সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান' (ধর্মতত্ত্ব, ব. র. ২য়, পৃ ৬৬৯)।

কিন্তু মানসিক অবস্থা ভেদে সৌন্দর্যও মোহজনিত অনুরাগ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়।

'বিষবৃক্ষে' গৃহত্যাগিনী সূর্যমুখীর সন্ধানে ব্যর্থ, নিরাশ ভগ্ন হৃদয়, বিষাদকাতর নগেন্দ্রর বর্ণনা—

> সে রাত্রে নগেন্দ্রর চক্ষে একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল না। জ্যোৎস্না অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। দৃষ্ট পদার্থমাত্রই চক্ষুশূলে বলিয়া বোধ হইল। (ব. র. ১ম, পৃ. ৩২৩)

'আনন্দমঠে'—

> জ্যোৎস্নাময়ী শান্তিশালিনী পৃথিবীর প্রান্তর কানন নগ নদীময় শোভা দেখিয়া' ভবানন্দের 'চিত্তে বিশেষ স্ফূর্তি হইল।' অথচ সেই সৌন্দর্য 'শোককাতর' মহেন্দ্রর মনে কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি করল না।
>
> (ব. র. ১ম, পৃ. ৭২৫)

স্থান কাল পাত্র ভেদে নিসর্গসৌন্দর্যের ভিন্ন ক্রিয়া বঙ্কিমের উপন্যাসে বার বার লক্ষণীয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কুহুতানের তীব্র সুরে উন্মথিত পরিপূর্ণ উদ্যানশোভা নিষ্ফলযৌবনা বিধবা রোহিণীর মনে জাগায় জীবন-সম্ভোগে বঞ্চিত হবার তীব্র বেদনা। তার মনে হয়—

> যেন এ জীবন বৃথা গেল—সুখের মাত্রা যেন পূরিল না—যেন এ সংসারের অনন্ত সৌন্দর্য কিছুই ভোগ করা হইল না। (ব. র. ১ম, পৃ. ৫৪৮)

'ইন্দিরা'য় প্রশস্ত-হৃদয় গঙ্গার ও সেই নদীতীরের স্নিগ্ধ শোভা, শান্ত লোকজীবনের সৌন্দর্য ও সেই সুরে বাঁধা 'মল বাজানর গান' ইন্দিরার দুঃখ মুহূর্তের জন্য ভুলিয়ে দেয়, মন প্রাণ শীতল করে। (ব. র. ১ম, পৃ. ৩৪৮)

'আনন্দমঠে' ফুল্ল-জ্যোৎস্না পুলকিত-যামিনীর প্রফুল্লতা দেশানুরাগী ভবানন্দের অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে যায়। মাতৃভূমির রূপ ও গুণকীর্তনে তিনি হন গীতোচ্ছ্বসিত।

এই সব উদাহরণমালায় বঙ্কিম বোঝান, স্থান কাল পাত্র-সাপেক্ষে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা বদলে যায়। সৌন্দর্য বিচারের, উপভোগের আসল চোখ-কান-মন। মন যদি সুরে বাঁধা না থাকে তবে রূপও নন্দিত সৌন্দর্যে বিকশিত হয় না। ধ্বনিও মাধুর্য ছড়ায় না।

তাই সৌন্দর্যের সঠিক বিচার, সৌন্দর্যের যথার্থ স্বরূপের রস আস্বাদনের জন্যেই মনের অনুশীলন বঙ্কিমের কাছে বিশেষ জরুরী। এই অনুশীলনেই চোখ কান খুলে যাবে, মন পাবে রুচির আলো।

'দিগ্‌গজ' বা 'মূঢ়া পৌরস্ত্রীদের যেমন অভাব ছিল সেই অনুশীলনের তেমনি সঠিক অনুশীলিত ছিল না ব্যাভিচারী গোবিন্দলালেরও মন।

তাই যদিও বঙ্কিম 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' প্রবন্ধে লিখেছেন—'প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্যে সুখী নহে।' 'সকলেই অহরহ সৌন্দর্য তৃষায় পীড়িত' তবুও তাঁর উপলব্ধি—'সৌন্দর্যে আন্তরিক অনুরাগ' সকলের নেই। 'সৌন্দর্য বিচারশক্তি, সৌন্দর্য-রসাস্বাদন সুখ, বুঝি বিধাতা' সবার 'কপালে লিখেন নাই'।

এই কারণে, বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্বে' মানুষের মনের সৌন্দর্যগ্রাহিণী বৃত্তি বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন 'উপদিষ্ট' হল।

'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধের 'চিত্তরঞ্জিনী' অধ্যায়ে গুরু-শিষ্য সংবাদে যুক্ত হল চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ।

'গুরু—জাগতিক সৌন্দর্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌন্দর্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্যময়। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া সৌন্দর্যগ্রাহিণী বৃত্তি অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্যের আভাস পাইতে থাকিবে। সৌন্দর্যগ্রাহিণী বৃত্তি-গুলির এই এক স্বভাব যে, তদ্দ্বারা প্রীতি, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্যকারিণী বৃত্তিসকল স্ফুরিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

শিষ্য—কেবল নৈসর্গিক সৌন্দর্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের সমুচিত স্ফূর্তি হইবে?

গুরু—এ বিষয়ে মনুষ্যই মনুষ্যের উত্তম সহায়। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্যাসকল, মনুষ্যের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌন্দর্যের অনুভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে স্ফুরিত হয়।'

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য এবং কাব্যকে বঙ্কিম এককথায় বলেছেন 'সূক্ষ্মশিল্প'। 'বহিঃসৌন্দর্যের অনুভব শক্তি'-ই এইসব শিল্পবিদ্যার উদ্দীপনা। তাই বঙ্কিম মনে করেন, সূক্ষ্মশিল্পের চর্চায় প্রকৃতপক্ষে 'বহিঃ-সৌন্দর্যের অনুভব শক্তি বিশেষরূপে স্ফুরিত হয়।'

নিসর্গ প্রকৃতিতে আকীর্ণ বিচিত্র বর্ণ, আকার, গতি, রব এবং অর্থযুক্ত বাক্যই মনুষ্য রচিত শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টির উপকরণ। সুতরাং এইসব উপকরণ আহরণের জন্যই শিল্পীকে বার বার বহিঃসৌন্দর্যের রূপের জগৎ পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করতে হয়।

'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' প্রবন্ধে বঙ্কিম নৈসর্গিক উপকরণের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন :

'মানুষের সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্যসৃজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায় ভেদে সেই বিদ্যা পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতকগুলির কেবল বর্ণমাত্র আছে—আর কিছু নাই ; যথা, আকাশ। আর কতকগুলির বর্ণ ভিন্ন আকারও আছে। যথা, পুষ্প।

কতকগুলির বর্ণ ও আকার ভিন্ন গতিও আছে ; যথা উরগ।

কতকগুলির বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে ; যথা, কোকিল।

মনুষ্যের বর্ণ, গতি ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে।

অতএব সৌন্দর্য সৃজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী—বর্ণ, আকার, গতি, রব ও অর্থপ্রযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্য জননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে। যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতি সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য তাহার নাম ভাস্কর্য।

যে সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা তাহার নাম নৃত্য।

রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত। বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য। কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্র এই ছয়টি সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যা। সৌন্দর্য প্রসূতি এই ছয়টি বিদ্যায় মনুষ্যজীবন ভূষিত ও সুখময় করে।'

বহিঃসৌন্দর্যে মুগ্ধ মানুষ অন্তরের উদ্দীপনায় সেই সৌন্দর্যানুভব শক্তিকে নানা বর্ণে, আকারে, ভঙ্গিতে, স্বরে, বাক্যে নিয়ত রূপায়িত করে চলেছে। দেহ-সজ্জা গৃহ এবং গৃহোপকরণ সজ্জায় সে মূর্ত করছে, বর্ণে আকারে স্ফুরিত রূপ-সৌন্দর্যকে, নৃত্যে, সঙ্গীতে ও বাক্যে বিকশিত করছে অন্তরের ভাব-সৌন্দর্যকে।

কিন্তু কৌতূহলী মনের প্রশ্ন বঙ্কিম কি মনে করেন বহিঃসৌন্দর্যের যথাযথ অনুকরণেই মনুষ্য-শিল্প সুন্দর! এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাক্—ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের বাণী—

ওঁ শিল্পানি শংসতি দেবশিল্পানি।
এতেষাং বৈ শিল্পানাম্ অনুকৃতীহ

শিল্পম্ অধিগম্যতে। শিল্পং হাস্মিন্নাধিগম্যতে।
য এবং বেদ যদেব শিল্পানী।

(মানুষের শিল্প দেবশিল্পেরই প্রশস্তি। এই শিল্প দেবশিল্পের অনুকরণ বুঝতে হবে। যিনি এইভাবেই শিল্পকে দেখেন তিনিই শিল্প বোঝেন।)

দেবশিল্প অর্থ হল বিধাতাসৃষ্ট বিশ্ব চরাচরের নিসর্গ শিল্প ও মানবজীবন শিল্প। সেই শিল্পে মুগ্ধ মানুষ তাঁরই অনুকরণে নিজের শিল্প গড়ছে।

কিন্তু এই অনুকরণ কি রূপের প্রতিরূপ? বঙ্কিমের কাছে দেবশিল্পের সামঞ্জস্যতত্ত্ব ও অখন্ডতত্ত্বই অনুকরণীয়। তাঁর কাছে 'সৃষ্টিচাতুর্য'ই শিল্প।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে কাব্যশিল্প প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনার মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্র-নৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? ··যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাব-সঙ্গত গুণবিশিষ্ট সৃষ্টিতে সেই আমোদমাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়। (ব. র. ২য়, পৃঃ ১৮২)

সমগ্র শিল্পের সম্পর্কে বঙ্কিমের এই মনোভাব। তাঁর মতে 'সৌন্দর্য এবং স্বভাবানুকারিতা' এই দুয়ের যথাযথ সমন্বয়ে 'সৃষ্টি চাতুর্য'—

'কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্যবিশিষ্ট না হইলে কোনো প্রশংসা নাই।' এই সৌন্দর্য আসলে তাঁর কাছে রূপ ও ভাবের, বাস্তব ও আদর্শের সত্য এবং মঙ্গলের যোগ্য সামঞ্জস্যে গড়া সুষমা।

বঙ্কিম বোঝেন, সপ্তবর্ণের সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাযথ বিন্যাসে ও রেখার ছন্দে সুন্দর চিত্র রূপ নেয়, কিন্তু সে চিত্র প্রাণময় হয় গভীর ভাবব্যঞ্জনায়। নগেন্দ্রর শয্যাগৃহের চিত্রাবলীর বর্ণনায় ও শেক্সপীয়র গেলেরির সমালোচনায় তিনি রেখেছেন তার প্রমাণ।

নিখুঁত দেহাকৃতির প্রতিমূর্তি বিদেশী রীতির ভাস্কর্য বঙ্কিমের কাছে প্রাণহীন পুতুলমাত্র। অথচ প্রাচ্যের অতিশয়িত দেবমূর্তি তাঁর কাছে জাগ্রত প্রতিমা। চালচিত্রআঁটা, লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশসহ দুর্গামূর্তির মহিষ-মর্দিনী সিংহবাহিনী রূপ যে বঙ্কিমের একান্ত প্রিয় তার কারণ এই দশভুজা বিগ্রহ তাঁর কাছে এক অখন্ড ভাবনার ও জীবনের সামঞ্জস্যতত্ত্বের প্রতীক। এই দুর্গার শিরোভাগে সুরসাধক বীণাবাদী শিবের পটচিত্র। পদতলে সামঞ্জস্যের

বিশ্বস্বরূপ অ-সুন্দর অ সুর মহিষ। দুর্গারূপ, ঋদ্ধি জ্ঞান বল সিদ্ধির সমন্বয়-সাধনে সম্পূর্ণ। বঙ্কিমের কাছে এই সাকার বিগ্রহ সার্থক শিল্প-প্রতিমা। খণ্ড খণ্ড রূপ ও ভাবপুঞ্জের সামঞ্জস্যে গড়া শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিচাতুর্য। সত্য শিব সুন্দরের এই পূর্ণ বিগ্রহ, এই সামঞ্জস্যতত্ত্ব জীবনেরই আরাধ্য অনুশীলনযোগ্য ধর্ম। দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্রে তাই জীবনলীলারই ছবি। 'দেবী-চৌধরাণী'তে সামঞ্জস্যতত্ত্বের সাধিকা দেবীরাণীর সিংহাসনের পশ্চাৎপটে তাই বঙ্কিম এঁকেছেন চালচিত্রপট।

স্থাপত্য-বিচারের ক্ষেত্রেও বঙ্কিম সামগ্রিক রূপবন্ধের এই সুষমা উপভোগ করেন।

> এক একখানি প্রস্তর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। ···অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে হইলে তাহার অনন্ত বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে। (উত্তরচরিত, ব র. ২য়, পৃ. ১৮১-৮২)

বঙ্কিমের কাছে 'জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত' 'অনির্বচনীয় মাধুর্যের শ্রেষ্ঠ আধার। এই সঙ্গীত সপ্তস্বরেরই সুষম সমন্বয়। কিন্তু সপ্তস্বর—অর্থাৎ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ-এর উৎস যথাক্রমে ময়ূর, বৃষ, অজ, সারস, কোকিল, অশ্ব ও হস্তীর কণ্ঠস্বর। এইসব স্বর বিচ্ছিন্নভাবে কোনো মাধুর্য সৃষ্টি করে না। বরং তা হয় 'রব' মাত্র। সপ্তস্বরের বিচিত্র বিন্যাসে তাল লয় মাত্রার সু-সম ছন্দেই রাগ-প্রতিমার সৌন্দর্যের সৃষ্টি।

বঙ্কিমের কাছে শুধু স্বর তাল লয় সমন্বিত সুরও নয়—বাণী, ভাব এবং শুদ্ধ সুরের সমন্বয়ই সঙ্গীত। সঙ্গীতের এই সৌন্দর্যও বেড়ে যায় যথাযথ বাদ্যযন্ত্রানুষঙ্গে।

কাব্যের মধ্যেও তিনি দেখতে চান শুধু শব্দালঙ্কার নয়—সমগ্র জীবনেরই সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক প্রতিফলন। সে জীবন ধর্মাধর্ম, কৃত্যাকৃত্য, নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি, সুমতি-কুমতির সাদাকালোর দ্বন্দ্বে ছন্দোময়। সে জীবন সুখে, দুঃখে, হর্ষে-বিষাদে, আশা-নিরাশায়, পূর্ণে-অপূর্ণের বাদী-বিবাদী কোমল ও কড়ি সুরের সৌন্দর্যে ঝংকৃত। তাঁর সৃষ্টিতে সাদার পাশে কালো রাখেন বঙ্কিম দুই রঙই উজ্জ্বলতা পাবে বলে। সাদা কালো তাই তাঁর কাছে অবিচ্ছিন্ন। কুন্দকে প্রস্ফুটিত করবেন বলেই হীরার চমক আনেন।

তাঁর চরিত্রের সবাই নন নিপাট ভালো অথবা নিরেট কালো।

সন্ন্যাসী সন্তান ভবানন্দ ইন্দ্রিয়পীড়িত হন বলেই তাঁর রক্তমাংসের অবয়ব প্রাণ পায়।

দেবী চৌধুরাণীর অন্তরালে ঘর-বরের জন্যে কাঙালিনী প্রফুল্লর চিরবসত, তাই তিনি পূর্ণ মানবী।

ঔরঙ্গজেবের পোড়া পাহাড়ের মতো হৃদয়েও প্রেম বুভুক্ষা জাগে, সেই জন্যেই তো এ চরিত্র আর এক চিরকালীন আলমগীর।

নিঃসঙ্গ, হতভাগ্য, অথচ অসামান্য সঙ্গীতকুশল পাপিষ্ঠ দেবেন্দ্রও দোষে-গুণে হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় সৃষ্টি। সম্পূর্ণ ঘৃণ্য নয় সে।

দেবশিল্পের এই রংবেরং-এর ধূপছায়া; সোজাবাঁকার খাঁজখোঁজ; এরই সুচারু বর্ণিকাভঙ্গ, সুছাঁদ নিয়তই মানব-জীবনে বিপুল বিচিত্র রূপ সৃষ্টি করছে, ভাব জাগিয়ে তুলছে। সেই জীবনকে নিজের মনের সরোবরে ছায়া ফেলে আঁকছেন প্রতিভাবান মানুষ শিল্পী। বঙ্কিম এবং চিরজীবী কবি কালিদাস, শেক্সপীয়র তো এইভাবেই ছবি আঁকেন।

পূর্ণ জীবন ছবি আঁকার জন্যে বঙ্কিম নিজে যে চরিত্র, প্রতিকৃতি আঁকেন বা গড়েন, সেই প্রতিকৃতি সাজান যে প্রেক্ষাপটে বা চালচিত্রে সে সমস্তই সঙ্গতির সুরে বেঁধেই সুন্দর করেন।

তাঁর রূপবতী নায়িকারা যে সত্যি তিলোত্তমা তা নয়। কেউ ক্ষীণাঙ্গী, কেউ কিঞ্চিৎ স্থূল, কেউ খর্বাকৃতি, কেউ দীর্ঘাঙ্গী, কেউ গৌরী, কেউ বা শ্যামা, অথবা কৃষ্ণাঙ্গী। কিন্তু গঠনের সামঞ্জস্যে অথবা লাবণ্যে বা ব্যক্তিত্বের প্রভায় সকলেই সুন্দরী। যেমন—

'তিলোত্তমার সুন্দর দেহে ক্ষীণতা ব্যতীত স্থূলতা ছিল না। অথচ তন্বীর শরীর মধ্যে সকল স্থানই সুগোল আর সুললিত।'

'মতিবিবির শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপদহৃদয়াদি সর্বাঙ্গ সুগোল, সম্পূর্ণীভূত।'

'মৃণালিনী'র গিরিজায়া—'খর্বাকৃতি এবং কৃষ্ণাঙ্গী।...কিন্তু ভিখারিনী কুরূপা নহে। তাহার অঙ্গ পরিষ্কার, সুমার্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট; মুখখানি প্রফুল্ল, চক্ষুদুটি বড়, চঞ্চল, হাস্যময়,...ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র,...কুন্দকলিকাসন্নিভ দুই শ্রেণী দন্ত।'

সে মূর্তি—'যেন কৃষ্ণ প্রস্তরে কোনো শিল্পকার পুত্তল খোদিত করিয়াছিল।'

কুন্দ—'নির্দোষ সুন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধহয়, এমন সুন্দরী কখনও

দেখি নাই। বোধহয় কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়।'

সেই 'পৃথিবী ছাড়া কিছু' তার লাবণ্য ও স্বভাববৈশিষ্ট্য—'সর্বাঙ্গীণ-শান্তভাব ব্যক্তি'।

বঙ্কিম জানতেন—

'রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—নহিলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান দেখে না কেন?' (রজনী ব. র ১ম, পৃ. ৪৯৫)

সুন্দরী নারীর রূপ রচনায় অনেক ক্ষেত্রে বঙ্কিম বৌদ্ধদর্শনকে মান্যতা দিয়ে 'মহিমা'পন্থী—মধ্যপথ অবলম্বী।

মনোরমা—'নিতান্ত খর্বাকৃতি নহে।'

মতিবিবি—গৌরাঙ্গীও নয় কৃষ্ণাঙ্গীও নয়—'শ্যামা'।

তিলোত্তমা—ক্ষীণা নয় 'তন্বী'।

দেবী চৌধুরাণী—'এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে—অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে।'

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ বচনামৃত 'দীঘ নিকায়' গ্রন্থে অভিরূপা নারীর বর্ণনা স্মরণ করা যায়।

"অভিরূপা, ঐ দর্শনীয়া, মনোহরা, পরমবর্ণ-সৌন্দর্যশালিনী, নাতিদীর্ঘা, নাতিহ্রস্বা, নাতিকৃশা, নাতিস্থূলা, নাতিকৃষ্ণা, নাতিশুভ্রা, মনুষ্যাতীতঘণ্টিবর্ণ-সম্পন্না, অপ্রাপ্ত দিব্যবর্ণা।"

'মনুষ্যাতীতঘণ্টিবর্ণসম্পন্না' বঙ্কিমের ভাষায় বোধহয় 'পৃথিবী ছাড়া কিছু'।

পুরুষের রূপ বর্ণনায় কিন্তু 'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ' ইত্যাদি কালিদাসীয় বিশেষণে বঙ্কিমের রুচি। —চন্দ্রশেখরের রূপ—

'এই দীর্ঘ শালতরু নিন্দিত সুভুজবিশিষ্ট সুন্দর গঠন, সুকুমারে বলময় এই দেহ যে রূপের শিখর। এ ললাট প্রশস্ত ··চিন্তারেখাবিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা ইন্দ্রের রণভূমি মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন!

····নয়ন···দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্রজ্যোতিঃ, স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎ রঙ্গপ্রিয়, সর্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু।' (ব. র, ১ম. পৃ ৪৪৬)

এই প্রতিকৃতি বহিঃসৌন্দর্য ও অন্তঃসৌন্দর্যে সম্পূর্ণ।

— কি নিসর্গচিত্র কি প্রতিকৃতি দুয়ের ক্ষেত্রেই বঙ্কিম দৃশ্যরূপ রচনার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভাবরূপ ফুটিয়ে তোলার পক্ষপাতী।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে[৪] সেই মানুষকেই যথার্থ শিল্পকুশল বলা হয়েছে যিনি একাধারে 'বহির্বেদী' এবং 'অন্তর্বেদী'।

তাই রমণীর পূর্ণ সৌন্দর্য রচনায় বঙ্কিম রূপশ্রীর সঙ্গে সঙ্গে নারীর অন্তর সৌন্দর্যের বিবরণ দেন। সারল্য, ধৈর্য, সেবাপরায়ণতা, পরহিতাকাঙ্ক্ষা, করুণা, প্রীতি, দয়া, ক্ষমা—এইসব গুণাবলীই নারীর সৌন্দর্য। তাই রূপপ্রভা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গেই চরিত্রের এই চারিত্র্য-দীপ্তিও তিনি বর্ণনা করেন।

বঙ্কিম যেখানে ধ্বনি প্রসঙ্গ আনেন সেখানে গম্ভীরনাদের পাশে শোনান মধুর রমণীয় স্বরধ্বনি। 'কপালকুণ্ডলা'য় ভয়ঙ্কর সাগরগর্জনের প্রেক্ষিতে শুনি করুণাময়ী নারীর কোমল কণ্ঠস্বর।

'আনন্দমঠে'—সুবিস্তীর্ণ নিসর্গপটে বঙ্কিম শোনান নৈসর্গিক ধ্বনির অপূর্ব ঐকতান।

কল্যাণী ও মহেন্দ্রর মনে ও জীবনে যখন সম্ভোগময় সংসার ত্যাগ করে যাবার ডাক এসেছে ঠিক সেই সময় বঙ্কিম আঁকেন রূপ রস গন্ধে বর্ণে স্পর্শে বিধুর মধুর, শব্দে বিভোল প্রাণময় প্রকৃতি-জীবনের ছবি।

'মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। 'ভৃঙ্গরাজ' কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতেছিল। …তালপত্র মৃদু পবনে মর্মর শব্দ করিতেছিল।'

যেন স্বপ্নবৎ, 'জলবিম্ব'বৎ এ জীবনের বিপরীতে এই প্রকৃতির অনন্ত মহাসঙ্গীত। দ্বিধাগ্রস্ত মহেন্দ্রকে গৃহ-সংসারের ক্ষুদ্র সীমার মায়া-ঘের থেকে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির অসীম কর্ম-সংসারের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আকর্ষণের জন্যেই বিশ্বদেবতা এই সম্মেলক গীতি রচনা করেছেন। একা মহেন্দ্র 'বহু'তে সম্মিলিত হল। দৃশ্যটির এই ব্যঞ্জনা। বঙ্কিম এইভাবেই রূপ হতে ভাবে অবিরাম যাওয়া আসা করেন। ধ্বনিই রূপের অন্তরভাষা। তাই রূপ আর ধ্বনির যুগল বন্দীতে গড়েন তাঁর শিল্প। তাঁর সমস্ত বর্ণনাচ্ছবি 'উজ্জ্বলে মধুরে মিশে'।

যখন তাঁর মানবী শিল্পী দেবীরাণী সুরযন্ত্রে ধ্বনি তোলেন সে ধ্বনিও বিচিত্র ভাবের সম্মেলনে সুন্দর হয়। শিল্পী, শিল্পীর স্থান কাল আবহ ও শিল্পসৃষ্টি পরস্পরের সমন্বয় সঙ্গতিতে হয়ে ওঠে আর এক চিত্রশিল্প। শিল্পকে বলা হয়—'শিল্পং কৌশলং শীল্ সমাধৌ'। একাগ্রতা সমুদ্ভাবিত কৌশলোৎপন্ন বস্তু।[৫] সেই একাগ্রতায় নিবিষ্ট সুরশিল্প বঙ্কিম শুনিয়েছিলেন

দেবীরাণীর বীণাবাদনে। নিজে নিমগ্ন হয়ে এঁকেছিলেন জলাসনা সরস্বতীর মতো তাঁর পূর্ণ রূপচ্ছবি।

ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণাবাদনে নিযুক্তা। চন্দ্রের আলোয় জ্যোৎস্নার মতো বর্ণ মিশিয়াছে, তাহার সঙ্গে সেই মৃদু মধুর বীণার ধ্বনিও মিশিতেছে—যেমন জলে জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছে, এ বন্য কুসুম-সুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তর সকলে সেই বীণার শব্দ তেমনি খেলিতেছিল। ....বীণে কত কি বাজিতেছিল।

বঙ্কিমের কাছে এই হল 'সর্বাঙ্গসম্পন্ন' অনন্তসৌন্দর্যের ছবি, সার্থক শিল্প।

ভাগবতের রাসলীলার দৃশ্যের রূপকের আড়ালে বঙ্কিম এই অখণ্ড অনন্তের সৌন্দর্যচ্ছবি অনুভব করেছিলেন। (দ্রঃ ধর্মতত্ত্ব—ব. র. ২য়, পৃ. ৬৬৯)।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ শিল্পসৌন্দর্যসৃষ্টির এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেছিলেন—

বাহিরে বিশ্বজগৎ রূপে রসে শব্দে স্পর্শে গন্ধে ছায়াতপে আলো আঁধারে পাঁচফুলের মালঞ্চের মতো প্রকাশ পাইতেছে, অন্তরে পদ্মসরোবর, সুখ-দুঃখ আনন্দ অবসাদ ভাবভক্তির সুরে লয়ে লহরীতে ভরপুর রহিয়াছে। চিত্রকর এতদুভয়ের মধ্যে যাতায়াত করিয়া পুষ্প চয়ন করিতেছেন ও মননসূত্রে দিয়া অপূর্ব হার গাঁথিতেছেন এবং সেই হারে সাজাইয়া পুষ্পকরথ নির্মাণ করিতেছেন। কিন্তু কাহাকে বহন করিবার জন্য, কোন্ দেবতাকে মালা পরাইয়া এই রথে অধিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া দিবার জন্য। আমি বলি আত্মদেবতাকে। চিত্রকরের নিজের আত্মাকে।[৮]

বঙ্কিমের চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি অনুশীলনের উপদেশ—এই সামঞ্জস্যে বিধৃত সমগ্র সৌন্দর্যের স্বরূপটি চেনার জন্য, শিল্পের আত্মা আবিষ্কার করার জন্য। এবং শিল্পভোক্তার আত্মার সঙ্গে সেই আত্মার মঙ্গল মিলনের জন্য। যে ছবি জীবনের সামঞ্জস্যের সুরে বাঁধা নয় অথবা যে মূর্তি কেবলই দেহরূপের নগ্ন প্রতিরূপ বঙ্কিমের রুচিতে তা সুন্দর নয়।

শিল্প বা সঙ্গীতের ক্রিয়াঙ্গ ও তত্ত্বাঙ্গ সম্পর্কে জানতে গেলে বিষয়ের চর্চা, মনন প্রয়োজন। জানতে হয় বর্ণ ও স্বরন্যাসের কৌশল, শব্দ প্রয়োগশৈলী ও সেইসঙ্গে ভাবসৌন্দর্য প্রকাশের ভঙ্গি। এই দুই বিদ্যাই শিক্ষাসাপেক্ষ। তাই এই সূক্ষ্মশিল্প বিদ্যার ক্ষেত্রেও আছে অধিকারী অনধিকারী ভেদ। রুচিভেদে

দেশকালভেদে শিল্পসঙ্গীতের ভাবরূপ শৈলী বদলে যায়। চিরকাল বয়ে গেছে এ দেশে মার্গ ও লোকশিল্পের সমান্তরাল প্রবহমান ধারা। নিভৃতির ও জন-মনোরঞ্জনের গান। মুছে গেছে, ঝরে গেছে তৎসাময়িক ও ক্ষণিক সুখের ক্ষণিক আনন্দের শিল্প। স্থায়ী হয়েছে কেবল সেই শিল্প সেই সঙ্গীত যা চিরায়ত 'সর্বাঙ্গসম্পন্ন সুন্দর' ও 'সর্বজনগণমনোহারী'। এ সবই বঙ্কিম জানিয়েছেন— তাঁর সাহিত্য-দৃষ্টান্তে।

কিন্তু শুধু জীবন যে-রকম এর উদাহরণে তাঁর তুষ্টি নেই। জীবন যা হলে ভাল হয় তারও আদর্শ রচনার মধ্যে দিয়েই তাঁর জীবন-শিল্পায়ন সম্পূর্ণ। অপূর্ণ ও পূর্ণ, সাধ ও সিদ্ধির 'রূপালি সোনালি' তারে বাজিয়েছেন বঙ্কিম তাঁর জীবনরাগিণী। তাঁর শেষ জীবনের ত্রয়ী উপন্যাস—আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম তাঁর শিল্পসাধনার পক্ষে জরুরী।

তাঁর কাছে শিল্প-সৌন্দর্য উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ নয়। তা হল অনন্ত সুন্দর ও 'সর্বাঙ্গসম্পন্ন' ঈশ্বরের উপাসনা। কাব্য, ছবি, মূর্তি গান সবই তাঁর কাছে বৃহৎ-এর জন্যে বৃহৎ ভাবেরই প্রকাশ এবং ক্ষুদ্র আত্মকে সংস্কার করার উপায়। সংস্কার অর্থই তো দোষ অপনোদন ও গুণ আধান। বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্বে' সেই পরিমার্জনার অনুশীলনে সংস্কৃতিবান হবারই উপদেশ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বাণীই বঙ্কিমের মান্য। 'আত্ম সংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমানো আত্মানং সংস্কুরুতে'।[৭]

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ষষ্ঠ পঞ্চিকা, পঞ্চম অধ্যায় প্রথম মন্ত্র)

—নিশ্চয়ই, শিল্পসমূহ আত্মসংস্কৃতির কারণ। যজমান বা শিল্পানুষ্ঠাতা নানাপ্রকার শিল্পের দ্বারা নিজ আত্মাকে পরিপূর্ণ ছন্দোময় ও সংস্কৃত করে।

বঙ্কিম তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে' বলেন—

'তদ্দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যে প্রেমিক হয়। (ব. র. ২য়, পৃ. ৬৭০)

অবশ্য কাব্যই বঙ্কিমের কাছে শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মশিল্পের মর্যাদা পেয়েছে।—'কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়।' (ঐ)

কারণ তিনি জানেন, এই শিল্পই তো সকল জ্ঞান সকল বিদ্যার ভারবহনে সক্ষম। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, রূপশিল্প ও সঙ্গীতবিদ্যার ক্রিয়াঙ্গে বঙ্কিম স্বয়ংসিদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু এই সূক্ষ্ম শিল্পের প্রতি তাঁর সহজাত অনুরাগ আসক্তি ও মননজনিত আনন্দকে অভিব্যক্ত না করেও তাঁর উপায় ছিল না। তাই তিনি এক অভিনব কৌশলে তাঁর এই শিল্প-প্রাণতা মূর্ত করেছিলেন।

কাব্য অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিই হয়েছিল সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ শিল্পচর্চার নিজস্ব কলাক্ষেত্র। কাব্যশিল্পের মধ্যে দিয়েই আত্ম ও পরকে সম্পূর্ণ ছন্দোময় এবং সংস্কৃত করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনসাধনা।

বঙ্কিম তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে' দেবশিল্প ও মানবশিল্পের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ, তার উদ্দেশ্য ও পরিণামের ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, 'ঈশ্বর যেমন সৎ-স্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ, তেমন আনন্দস্বরূপ।' এই সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরকে জানার জন্যেই, তাঁর মতে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন জরুরী। শুধু জ্ঞান বা ধ্যানে 'সচ্চিদানন্দময় জগৎ' বা 'জগন্ময় সচ্চিদানন্দময়'কে জানা যায় না।

এই সচ্চিদানন্দময় জগৎ বলতে বঙ্কিম কি বোঝাতে চান? —সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বর কি? রূপ ভাব রস—বস্তুজ্ঞান মনন ও আনন্দ নিয়ে গড়া সমগ্র জগতের এবং অখণ্ডতার অনুভব। শুধু জ্ঞান বা মননের চর্চা একপেশে সাধনা। আনন্দের যোগ হলে তবেই জীবন ও চিন্তা সম্পূর্ণতা পায়। সু-সংস্কৃত মনুষ্য-ধর্ম অর্জনের জন্য আনন্দের চর্চা তাই বঙ্কিম মতে অপরিহার্য। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—

'চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের উপায় না থাকিলে সংস্কৃত-ধর্ম কখন স্থায়ী হইবে না।' (ব. র. ২য়, পৃ ৬৬৮)

তাঁর মতে বেদে শুধু জ্ঞানের এবং উপনিষদে ধ্যান অর্থাৎ মননের অনুশীলন। একমাত্র পুরাণেই জ্ঞান ধ্যান ও আনন্দের সার্থক স্ফুরণ। অবতার কল্পনার সূচনা করে এই পুরাণ সর্বশিল্পের সম্যক বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। কাব্যে রূপায়িত হয়েছে অবতারের মানবকল্প জীবনলীলা। চিত্রে ভাস্কর্যে মূর্ত হয়েছে জ্ঞানময় ও ধ্যানময় ঈশ্বরের সাকাররূপ। সাকার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে উঠেছে দেবালয়। মন্দির স্থাপত্য। সেই বিগ্রহের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে নৃত্যগীতবাদ্যসমন্বিত সঙ্গীতে।

তাই বঙ্কিম বলেন—'সাকার পূজা কাব্য ও সূক্ষ্ম শিল্পের অত্যন্ত পুষ্টিকারক।'

এই কারণেই পুরাণ বঙ্কিমের কাছে নিন্দিত নয়, বরং বিশেষভাবেই অভিনন্দিত।

বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ কাব্য তন্ন তন্ন করে পড়েছেন বঙ্কিম। গ্রহণ করেছেন তার শিল্পোপদেশ।

বিষ্ণুপুরাণের পরিশিষ্ট অংশ 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' গ্রন্থে রয়েছে শিল্পশাস্ত্রের কথা। দেবপূজা উপলক্ষে সমস্ত শিল্পের সর্বাঙ্গসম্পন্ন অনুশীলনের কথা গুরু-শিষ্য সংবাদের মাধ্যমে সেখানে বিন্যস্ত। ভাবসাধনা ও রূপসাধনার সার্থক

সমন্বয়ে শিল্পযজ্ঞ সম্পন্ন করার উপদেশটি রয়েছে 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ' তৃতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে। স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্র নৃত্য বাদ্য গীত যে অবিচ্ছিন্ন শিল্প—এই পুরাণেই পাওয়া যায় তার স্পষ্ট নির্দেশ।

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ এই শিল্পোপদেশেরই মনোহর কাব্যপ্রয়োগ। তাই বঙ্কিম চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি অনুশীলনের সার্থক দৃষ্টান্ত ভাগবতপুরাণ কাব্যের রাসলীলা দৃশ্য থেকেই আহরণ করেছেন। সে দৃশ্য সর্বসামঞ্জস্যের রস নিষ্পত্তিতে আনন্দময়। ভাগবত থেকেই বঙ্কিম ঈশ্বরের সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন। সেই ঈশ্বর 'অনন্ত-সৌন্দর্যবিশিষ্ট। তিনি মহৎ শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন এবং নির্বিকার।' (ব. র. ২য়., পৃ. ৬৬৯)

তাঁকে জানার উপায় ?

'যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে ?'

ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলাই চূড়ান্ত সৌন্দর্যকে পাওয়ার 'সম্পূর্ণ অনুশীলন' পদ্ধতি।

বঙ্কিমের মতে 'ইহা ···অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসনা।' 'সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান···অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই···জীবন সার্থকতার উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড় প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য তাহাতে বর্তমান। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুমবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবনস্থলী, জড়প্রকৃতি মধ্যে অনন্ত-সুন্দরের সশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী বংশী। এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইল ; আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল। জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য'। (ব. র. ২য়, পৃ. ৬৬৯)

তন্ময়তার তত্ত্বটি বঙ্কিম ব্যাখ্যা করেননি, উপলব্ধি করেছেন। আমরা জানি, পরিপূর্ণ সৌন্দর্যময় দৃশ্যপট ও আবহসুরে আকৃষ্ট, মুগ্ধ, উদ্দীপিত গোপীরা ভাবতন্ময় হয়ে বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত সেই অনন্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এইভাবেই মিলন সংঘটিত হল। তারা চূড়ান্ত বহিঃসৌন্দর্য-রূপশ্রী ও অন্তঃসৌন্দর্য প্রেমের আধার। পরস্পর মণ্ডলাবদ্ধ হয়ে প্রেমোচ্ছ্বাসে. নৃত্যগীতের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের অনন্ত আনন্দ শিল্পায়িত করতে লাগল। তাদের প্রেম, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা নয়। অ-সাধারণ

অর্থাৎ বিশেষ-ব্যক্তিকও নয়। তা সমগ্রযুক্ত, তা হল বৃহৎ জগন্ময় অনন্তের অনুভবজনিত হৃদয়োচ্ছ্বাস। ক্ষুদ্র এই অনন্তেরই অংশ এই অনুভবের পুলকে তা তন্ময়। পরস্পরাবদ্ধ মণ্ডল রচনা করে তারা খণ্ড সৌন্দর্যে গাঁথা পূর্ণ অখণ্ড সৌন্দর্যেরই মাল্য-প্রতীক গড়ে তুলেছে। সেই ছন্দোময় সুরময় অখণ্ডমণ্ডলাকার মাল্যরূপ দিয়েই বরণ করেছে সচ্চিদানন্দময় অনন্ত সৌন্দর্যকেই। এই ভাবেই তারা দেবশিল্পের প্রশংসা করেছে, অনুকরণ করেছে, সেই সঙ্গে আত্ম-সংস্কার সম্পন্ন করেছে,।

এই রাসলীলা দেবভোগ্য। তা ইন্দ্রিয়-সংস্রবশূন্য, আত্মসংভোগে দুষ্ট নয়, তা সমগ্রের সঙ্গে প্রীতিযুক্ত, তাই সম্পূর্ণ বিকারমুক্ত, পবিত্র, শ্রেষ্ঠচিত্তবৃত্তি-পরানুরক্তিভাবে উন্নত। এই মণ্ডল-শিল্প বিচিত্র খণ্ডকে ভারসাম্যে বেঁধেছে, প্রমিতি রক্ষা করেছে, তাললয়ে ছন্দোময় হয়েছে, মাত্রা সামঞ্জস্যে হয়েছে সুরময়। এই শিল্পেই দেবশিল্পের প্রতিভাস। তা সার্থক রসনিষ্পন্ন, পরমানন্দময়, 'রসানাং সমূহঃ'—তাই 'রাস'।

পূর্ণ সৌন্দর্য আনন্দ দেয় বলেই আকর্ষণ করে। সৌন্দর্যের সার্থকতা ভোক্তারই রসাস্বাদনের মধ্যে দিয়ে শিল্প ও শিল্পভোগীর আত্মার মিলনে। আনন্দ ও সৌন্দর্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। তাই সে কাব্য প্রতীকে রাধাকৃষ্ণের ভাবসম্মিলন। রূপশিল্পে রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন। ভাগবতকারের কাব্য-শিল্পের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ শিল্প-সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নির্ণয়, বিচার ও উপভোগ করার এই নন্দনতাত্ত্বিক উপদেশ বঙ্কিম গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর কাছে 'ইন্দ্রিয়ের সংস্রবশূন্য' 'রূপকধর্মী' 'বহিঃসৌন্দর্য' ও 'অন্তঃ-সৌন্দর্যে' পূর্ণ শিল্পই প্রশংসা পায়। তাঁর উপলব্ধি—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণচর্যাই মানুষের ধর্ম। সামঞ্জস্যই সুর। তা জীবনকে এবং শিল্পকে ভারসাম্যে ছন্দে লয়ে সু-সঙ্গত মাত্রায় ধরে রাখে। একা-খণ্ড, সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই অসম্পূর্ণ ও নিরানন্দ। সংহতিই আনন্দ, ঐক্যই চরম সুখ। সমস্ত জ্ঞান-বিদ্যা, কর্ম-সামর্থ্য ও আনন্দকে বৃহৎ চৈতন্য এবং মহৎ ভাবের সামঞ্জস্য-সূত্রে বেঁধে জীবন ও শিল্প রচনা করলে তা দেবশিল্পের প্রসাদ পায়। সে জীবন ও শিল্প হয় 'উপাসনার সহায়'। আরাধনা, আত্ম-ক্ষুদ্রতার গণ্ডী ভেঙে বৃহৎ-এর সঙ্গে বৃহৎ আদর্শে পরম অনুরাগে যুক্ত হওয়াই উপাসনা। সেই যোগেই পরম আনন্দ লাভ। ব্রহ্মস্বাদসহোদর রসের সাক্ষাৎ। তাই সেই আনন্দেই চিরস্থায়ী সুখ, সৌন্দর্যের চরম অনুভূতিবোধ।

বঙ্কিমের অনুভূত আদর্শ সুখ সৌন্দর্য ও আনন্দের তত্ত্ববাহী শেষত্রয়ী

উপন্যাস আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম-এ এই ভাবেই সার্থক জীবন-শিল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে। সেখানে জীবনের নন্দিত সুরকে সমগ্রতার সূত্রেই সেধেছেন বঙ্কিম।

'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ' তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁর শিষ্য বজ্রকে বলেছেন—

> মূর্তি গড়তে চাও? ছবি আঁকতে জান? ছবি আঁকতে চাও? নাচের ছন্দশাস্ত্র বোঝ? নাচ শিখতে চাও? তাল জান? তাল শিখতে চাও? গান জান তো?[৮]

সুরই যে সর্বশাস্ত্র সার।

সুরই অনন্তসৌন্দর্যবিশিষ্ট সর্বাঙ্গসম্পন্ন দেবতা। সামঞ্জস্য, তাই পরমানন্দ। বঙ্কিম একথা জানতেন। তাই তাঁর কাছেও সুরই রূপসৃষ্টির গোড়ার কথা।

'গানাৎ পরতরং ন হি'।

নির্দেশিকা

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত ১০৬
অখতর পিয়া ১৫৬
অগস্টাম উইলওয়ার্ড ৭৯
অগ্নি দেবতা ১৪
অঘোর চক্রবর্তী ৬৯
অজয় বিশ্বাস ১০১
অতর্কিত সময় আক্কাৎ ২১
অধঃপতন সঙ্গীত ৭৯, ১৩০, ১৪০
অনন্ত দাস ৮৯
অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ৯, ১১, ২৫, ৩১
অনুকরণ ৫১
অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২, ১৪, ২০, ২৩, ২৪, ২৫, ১৫৬, ২৩১
আইজেনস্টাইন ১৯৩
আকবর ৪৩, ৪৪, ৪৮
আকবরের চিতোর অবরোধ ২০
আনন্দ কুমারস্বামী ২৩
আনন্দমঠ ১৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৪২, ৪৬-৪৯, ৬৩, ৯৭, ১৭৪-১৭৮, ১৮২, ১৮৩, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯২, ২০১, ২০৬, ২০৮, ২২০, ২৩২
আপন কথা ১৪
আমার মন ১২২
আমীর খসরু ৬৮, ১৫৩
আর্য জাতির সূক্ষ্মশিল্প ৪, ৯, ১৮, ৩৬, ৩৭, ১৬০, ২২৫
আলমগীর ২৪
আলালের ঘরের দুলাল ২৪
আলাউদ্দীন খলজী ৬৮, ১৫৩
আলিবক্স ৬৮
আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ৪২, ৪৩, ৪৭, ৫০
আলেপনা ৩, ১৪, ১০৮
আহম্মদ খাঁ ৬৮
ই টমাস ৫০
ই বি হ্যাভেল ২৩, ২৪
ইণ্ডাষ্ট্রিয়ল স্কুল ৩, ৩২
ইন্দিরা ২৪, ৮০, ১১৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬-১৩৮, ১৪০, ১৪১, ২২৩
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১১৭, ১১৮, ১৩৪
ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ ১০৫
উইলিয়ম জোন্‌স ৭৯, ৮৮
উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিন ৪২
উজ্জ্বলনীলমণি ১২৩
উত্তর চরিত ২১৯, ২২৫
একটি গীত ৩২, ১০৩
একা ৫৯, ৬১, ১২৪
এচিং ৩
এন্‌সাইন জেম্‌স ৪২
এবলিং ২৩
এম. কোর্ট ৫০
এমারেল্ড থিয়েটার ১০৮
এমারেল্ড বাওয়ার ৭০
এশিয়াটিক সোসাইটি ৪, ২১-২২, ৩৬
এসো এসো বঁধু এসো ১০৩, ১২৪, ২০৭

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২২৫, ২৩২
ওয়াজিদ আলিশাহ ৫৭, ৬৮, ৯৯, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭
ওয়ারেণ হেস্টিংস ২২, ৩১
কপালকুণ্ডলা ২, ৭, ৬৭, ১৩৭, ২১৮
কবি গান ৮৭, ১১৩, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১৪৪
কবীর ১৭২
কমলাকান্তের দপ্তর ২৭, ১০৩, ১২৪, ১৪০
কহন্ ঠুম্রি ১৫৬, ১৫৮
কাদম্বরী ২, ৩৫
কাফী খাঁ ১৭৩
কামশাস্ত্র ১৯২
কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ১৬৬
কালিদাস ৩৫, ৯৩, ১৩৪, ১৫৯, ২২২
কালীকিঙ্কর পালিত ৩৮
কালীদিঘির পাড়ে ইন্দিরা ২৪
কালী মীর্জা ১২২, ১৬৫
কাশেম আলি . ১৯৬
কায়স্থ কমলাকান্ত ৬৫
কিশোরীচাঁদ মিত্র ৩
কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় ৬৯
কীর্তন ৮১, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৯৬, ৯৭
কীর্তনীয়া বলরাম দাস ১০৩
কুমারসম্ভব ১২, ১৩
কৃষ্ণকান্তের উইল ১৭, ৪০, ৭৩, ১৭৪
কৃষ্ণচরিত্র ১১০, ১৫৯
কৃষ্ণদাস ব্যাস ৭৭
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৭, ৭৮
কেশবচন্দ্র মিত্র ৭৩
ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ৬৯
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ৭০, ৭৭, ৭৮
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১০১, ১১৫
খিয়াল ৬৯, ৭৮, ১০৪, ১৩৯, ১৫২
খেতরির উৎসব ১০২, ১০৪, ১২৫
খুশ্‌হাল খাঁ ১৭০
গওহরজান ১৫৬
গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৭২
গজল ১৯১, ২০৯
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১০৮
গিরীন্দ্রনাথ দত্ত ২৫
গীতগোবিন্দ ১২৬, ১২৯, ১৮৩, ১৮৯, ১৯০
গীতগোবিন্দের স্বরলিপি ১৯০
গীতবিতান পত্রিকা ৬৯
গীতরত্ন ৭৭
গীতসূত্রসার ৭৮
গীতাঙ্কুর ৭৭
গীতিকাব্য ৫৯, ৬২, ৮৭, ৮৯, ৯০
গুরুদক্ষো ১১৯
গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১০৮
গোকুলানন্দ ১০২, ১২৫
গোপাল উড়ে ১১৬, ১১৯, ১২৮, ২০৫
গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ৭০, ১৬৬
গোবিন্দ অধিকারী ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১২০
গোবিন্দ দাস ১০১, ১৮৩
গৌরী ধর্মপাল ৩৫
চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন ৭৪
চন্দ্রশেখর ১৫, ৪০, ১৪২, ১৫১, ১৫৮, ১৭৩, ১৭৪, ১৯১

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১২১
চণ্ডীদাস ৮৬, ৮৯, ১০১, ১০০, ১১০, ১১৪, ১৫২, ২০৪
চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ১০০
চার্লস উইলকিন্স ২২
চ্যাটার্টন ১০০
ছেলে ভুলানো ছড়া ১০৭, ১০৮
জগদীশনাথ রায় ৭৯, ১১৯, ১৯২
জগন্মোহিনী ১১৪
জন বার্ডফিয়ার ১৯৬
জনসনের আর্ট অ্যালবাম ২২
জন্মভূমি ১৫০
জয়দেব ৯, ৫১, ১০১, ১১০, ১১১, ১১৭, ১২৩, ১২৬, ১৩৩, ১৫২, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ২০৪, ২০৫
জ্ঞানদাস ৭৯, ৮২, ৮৬, ১০১, ২০৪
জে অ্যাবট ১৯৭
জেনারেল ভেনটুর ৪৯
জেমস্ আউটরাম ৩১
জেমস্ ফার্গুসন ৩০, ৪৩-৪৭, ৪৯, ৫১
জোহরা বাঈ ১৫৬
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬
টপ্পা ৬৯, ৭৮, ১০৪, ১১১, ১১৬, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৯, ১৩৯, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৭, ১৬০, ১৬১, ১৬৫, ২০৯
টি. গ্রান্ট ৪২
টোবি ফক ২২
টোড়ি রাগিণী ২১, ২২, ২৩
ঠুমরি ৬৯, ১০৪, ১৩৯, ১৫২-১৫৪, ১৫৬-১৫৮, ১৬০, ২০৫, ২০৯
ঠাকুরুণ বিষয় ১১৭, ১১৯, ১৫০
ড্যানিয়েল ৩
ডোরিক রীতি ৩৮
তন্ত্রসার ১৬১
তানসেন ৬৮, ৮৬, ১০১, ১৬২
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ১৩
তুকারাম ৯৭
তুলসীদাস ১০৩, ১৭২
দাদূ দয়াল ১৭২
দাশরথি রায় ৮০, ১১৬, ১২১, ১৩৯, ১৪৩, ১৮৪, ২০৫
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৫৬
দিল হুয়া প্যায়গাম ১২২
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ১১৯, ১৬৫, ১৯৬
দিলীপকুমার রায় ১০২
দিব্যেন্দুসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ১০৮, ১৯২
দীঘ নিকায় ২২৯
দীনবন্ধু মিত্র ২০৫
দুর্গাচরণ লাহা ৩৮
দেবী চৌধুরাণী ২৭, ৪২, ৫৯, ১৭৪, ১৯১, ১৯২, ১৯৬, ২০১, ২০২
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭২
ধর্মতত্ত্ব ১২২, ১৭৭, ১৭৮, ২২৪, ২০২, ২০৩
ধর্মপাল দেব ৬৮
নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭৪
নন্দলাল বসু ১৪, ২৩, ২৪, ২৫
নবকৃষ্ণ দেব ১১১
নবীনচন্দ্র সেন ১০৪, ১৮৩
নরোত্তম দাস ১০১, ১০২, ১০৪

নারদীয় শিক্ষা ১৭৭
নায়ক গোপাল ১৬২
নিওবি ১৫, ১৮
নিকী বাঈজী ১৫৬
নিতাই দাস ১১৭, ১১৮
নিধুবাবু ১১৩, ১১৬, ১১৯, ১২০, ১২২, ১৮৪
নীলাম্বর দেব ৪৯, ৫০
পঞ্চানন তর্করত্ন ১৫০
পট ১২, ২৫-২৭, ৩৪
পদ্মাবতী ১৭২
পার্শিয়ান চিত্র ১১
পোর্ট্রেট ১২
প্রতিভা দেবী ১৮২
প্রবাসী ২৪, ২৮, ১০৬
প্রভাতী ৯২
প্রসন্দ মিশ্র ১২৩
প্রাচীন বাংলা গান সংরক্ষণমালা ৯৯
পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ১০০
পি টি কাউট্লে ৪২
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৩, ৯২, ১৬৪, ১৮২
ফণীন্দ্রনাথ বসু ৩২
বঙ্কিম জীবনী ৭২, ৭৩
বঙ্কিমবাবুর সমুদ্রযাত্রা ১৫০
বঙ্গদর্শন ৪, ৯, ২১, ২৫, ৫৯, ৬৮, ৭৭, ৭৮, ১১২, ১১৩, ১১৭, ১১৯, ১৩০, ১৫২, ১৫৭, ১৭১, ১৮৬, ১৮৯, ১৯১
বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয় ৭৭
বঙ্গৈকতান ৭৭
বদন অধিকারী ৮০, ১১৭, ১৩৯
বন্দেমাতরম ২৭, ১৭৫, ১৭৯-১৮৭,
বলদেব সিং ১২২
ব্লকম্যান ৫০, ৭৯
বসন্তক ২৫
বসন্তরঞ্জন রায় ১০০
বসন্তের কোকিল ১২৪
বড়ু চণ্ডীদাস ১০০
ব্রহ্মানন্দ স্বামী ১৬২
বাজবাহাদুর ১৭৩
বাণভট্ট ৩৫
বান্ধব ১১৭
বাবু ১১৭
বালক ২৫
বাসৎ খাঁ ৬৮
বাংলা শব্দ ও ছন্দ ৮৭
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ছ১৯
ব্রাহ্মগীতিকা ১৯২
বিক্রমোর্বশী ১৫৯
বিদ্যাপতি ৯, ৮৬-৮৯, ৯৯-১০১, ১০৪, ১০৯, ১১০,
বিদ্যাপতি ও জয়দেব ১১০, ১১৭, ১২৯
বিদ্যাসুন্দর ১১২, ১১৩, ১১৬, ১১৯, ১৫২
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৬, ৩৩
বিমানবিহারী মজুমদার ১০০
বিবিধার্থ সংগ্রহ ২৫
বিলাস খাঁ ১৭০
বিশ্রাম খাঁ ১৭০
বিষবৃক্ষ ৯, ১৩, ২৪, ২৫, ৩২, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪২, ৭৪, ৮১, ১০২

বিষ্ণুপুরাণ ১৬০, ২০০, ২০৩
বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ ২৩০, ২০৩-২০৬
বীরচাঁদ সূত্রধর ২৭
বৃহদ্দেশী ৬৭
বেঙ্গল একাডেমী অব্ মিউজিক ৭৭
বেঙ্গল থিয়েটার ১০৮
বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট ২৩
বেণ্টিঙ্ক ৩১
বেল ১৭
বেলগাছিয়া নাট্যশালা ৭৮
বেলগাছিয়া ভিলা ৩৯
বৈজু বাওরা ১৬২
ভক্তিরত্নাকর ১০২, ১২৫
ভগিনী নিবেদিতা ২৮
ভবভূতি ২১৮
ভরত ২১৮
ভাগবত ১২৩, ১২৫, ১৩১, ১৮৩, ২০৩, ২০৪
ভাটপাড়া ৭১, ১৪৯, ১৫০
ভানুসিংহের পদাবলী ১০০
ভারতচন্দ্র ১১৮
ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র ৭৮, ৭৯,
ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা ৪
ভারতমাতা ২৮
ভারতী ২৫
ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়াম ২১
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ৭৪
মঙ্গু বাঈ ১৮৯
মতঙ্গ ৬৭, ৮৬
মধুকাণ ১১৩
মধুসূদন দত্ত ২৪, ৭০, ৭৮, ১৩৪, ২০৬
মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২২
মধু যন্ত্রী ১৯৬
মনিয়র উইলিয়ম ৩০
মনোহর মিশ্র ১২৩
মরকত কুঞ্জ ৩৮, ৭৭
মল বাজানর গান ১৩৩, ১৩৪, ১৪২
মহাভারত ১২, ৩৫, ১৫০
মহেশ সূত্রধর ২৭
মহেশচন্দ্র খাজাঞ্চী ১৬৬
মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১২২
মাধব মুখোপাধ্যায় ১৬৬
মানস বিকাশ ১১০, ২১১
মানসিং তোমর ৬৮, ১০১
মালকাজান ১৫৬
মালবিকাগ্নিমিত্র ৯৩, ১৫৯
মালিক মুহম্মদ জায়সী ১৭২
মিলড্রেড আর্চার ২২
মীরাবাঈ ১৭২
মুক্তধারা ১৯৯
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ১৩৬, ৩৩৮
মুহম্মদ শাহ ১৫৩
মুল সঙ্গীতাদর্শ ৭৭
মৃণালিনী ৮, ২২, ৭৫, ৮১, ৮২, ১০২, ১০৩, ১০৮, ১৭৪, ১৮৭, ২২৭
মেয়েলি ছড়ার গান ১৩৬
মোরাদালি খাঁ ৬৮, ৬৯
মৌলা বখ্স্ ১৯৫, ১৯৬
ম্যাক্সমুলার ৩০
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৭০, ৭৭-৭৮, ১২৩

যদু ভট্ট ৭০, ৭২-৭৬, ৮১, ১০১, ১০২, ১৫৬
যদুভট্টের গানের খাতা ১০১
যদুনাথ রায় ৬৯
যন্ত্রকোষ ১৯৬
যজ্ঞেশ্বরী ১৪৪
যাত্রা ৭৯, ১১১, ১১৯, ১৫৯
যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭১, ১১৭
যাদুমণি ৭৮
যুগরাজ সুরদাস ১৬২
রঘুনাথ রায় ১৬৬
রঘুনাথ সিংহ ৬৯
রঘুবংশ ১২
রজতগিরিনন্দিনী ২০৬
রজনী ১৩, ১৫. ৩৪, ১২২, ১৬০, ১৬২, ১৭৪, ১৭৫
রবীন্দ্রনাথ ২, ৫৯, ৬২, ৬৬, ৭০, ১৯০
রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০, ৭৭, ১৯৮
রমেশচন্দ্র মিত্র ৭৩
রহিম খাঁ ৭০
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪৫, ৪৬
রাজনারায়ণ বসু ১১৮
রাজেন্দ্রলাল মল্লিক ৩৮, ৪৩
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৩, ৪৫, ৪৬, ৫০
রাধামোহন সরকার ১১৯
রাধারাণী ১৫
রাম বসু ১১৭, ১১৮, ১৪৪
রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫৮
রামগোপাল ঘোষ ৩
রামচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১৮৭
রামচরিতমানস ১৭২
রামদাস সেন ৭৮, ৮০, ১৫৩, ১৭৭, ১৮৫, ১৮৯
রামনিধি গুপ্ত ১১৩
রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৬
রামপ্রসাদ সেন ১১৮
রামমোহন রায় ৭০, ১২২, ১৫৫, ২০৬
রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ৭০, ৭২, ১৯০
রামায়ণ ৩৫
রাসসুন্দরী ১৯৮
রিচার্ড ওয়েস্টম্যাকট ৩১
রিচার্ড জনসন ২২
রোহিণীকান্ত নাগ ৩২
লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র ১৯৫
ললিতচন্দ্র মিত্র ১৮২
লালন-গীতিকা ১০৭
লালন ফকির ১০৫, ১০৬, ১০৭, ২০৯
লালমোহন শর্মা ৪
শকুন্তলা মিরন্দা ও দেসদিমোনা ১৫
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭২, ৭৩, ৭৪
শর্মিষ্ঠা ৭৮
শশীপাল ২৭
শালবন বিহার ৪৮
শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান ১১৮
শিল্পরত্ন ৬, ৩৩
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ১০০
শ্রীজান বাঈ ১৫৬
শ্রীধর কথক ২০৫
শ্রীধর স্বামী ১৫৯
শ্রীমতি ১২১

শেক্‌স্‌পীয়র ১৩৪, ১৪৪, ১৪৫, ১৭৩, ২০৫, ২২৬
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৭০, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ১২৩, ১৯৫, ১৯৬
শ্যামাচরণ শ্রীমাণী ৯, ১০, ১২, ১৩
সঙ্গীত ২১. ৫৯, ৬৬, ৭১, ৭৮, ৭৯, ১১৭, ১২০, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮, ১৭৪, ১৮৯, ১৯১, ১৯৭
সঙ্গীত তরঙ্গ ৭৭
সঙ্গীত-দর্পণ ১৮৫
সঙ্গীত দামোদর ৯৭
সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম ৭৭
সঙ্গীতের আসরে ১৯৬
সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৫, ১৬৬
সত্যজিৎ রায় ১৯৩, ১৯৪
সদারঙ্গ ১৫৩
সনদ পিয়া ১৫৪
সনদী খিয়াল ১৪০, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৭
সরসীকুমার সরস্বতী ৪৬, ৪৮
সাম্য ১৯৭
সীতারাম ৩৩, ৪২, ৫০, ৮১, ১৭৪, ১৯১, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৮
সূক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরী ৯, ১২
সেক্‌স্‌পীয়র গেলেরি ১৩,১৪,১৬, ৩৪
সোসিল সার্প ১০৮
সোমনাথ ১৮২
হদ্দু খাঁ ১৯০
হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১০০, ১০৬, ১২০
হরিদাস স্বামী ১৬
হস্সু খাঁ ১৯০
হারামণি ১০৬, ১০৬, ১০৮
হাসিয়া ১৭
হিউ-য়েন-সাঙ্‌ ১৮
হিন্দু মেলা ১৩
হীরা মালিনী ৭৮, ১১৯, ১২৮
হেনরি হোভার লক ৯, ১১
হেস্টি ২৮
A popular Literature for Bengal ১১৬
Ancient Geography of India ৪২
Antiquities of Orissa ৪৩, ৪৫
Architecture of Bengal ৪৬
Bengali Literature ১০০, ১০২, ১০৫, ১১৮
Calcutta Review ১০০
Hindusthani Airs Arranged for the Piano Forte ৭৮
History of Indian and Eastern Art and Architecture ৩০, ৪৬, ৫১
India Office Library ২২
Ivory Painting ২০
Mirror Work ২০

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভুল	সংশোধন
৪৫	৮	প্রসঙ্গতর	প্রসঙ্গতঃ
৫৩	৫	রমনী	রমণী
৭৩	২৮	রমেশচন্দ্র দত্ত	রমেশচন্দ্র মিত্র
৭৭	১৭	সঙ্গীতক	সাঙ্গীতিক
১০২	২৫	রাগিনী	রাগিণী
১২৮	৩	ধাঁচ	ধাঁচে
১৪১	১৪	শৈবলীনী	শৈবলিনী
১৫০	৩	বন্ধ্যাষ্টমেধিবেদ্যাব্দে	মেহধিবেদ্যাব্দে
১৫৭	২৯	সনদ খীয়াল	সনদী খিয়াল
১৬১	২০	প্রমাণাভবাৎ	····ভাবাৎ
১৮০	৩০	আহত	আহিত
১৮৪	২৮	সে	যে

বিঃ দ্রঃ ১৮৭ পৃষ্ঠায় ১১শ পংক্তির উদ্ধৃতি-র (গান যাহাই হউক········ করেন) নির্দেশিকা-ক্রম হবে ৮২। এরপর থেকে ১৯২ পৃষ্ঠার ৮৬ নং পর্যন্ত পর পর ক্রম সংখ্যা বদলে যাবে। মন্তাজের নির্দেশিকা ক্রম নেই।